প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৫৮

প্রকাশক
বি. রায়
দেশকাল
৪ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

অলংকরণ ও মুদ্রণে
কোলাজ
২ জওহরলাল নেহরু রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৩

নয়নের নীড়

॥ ভূমিকা ॥

স্বাধীনতার পরবর্তী ধাপে ভারতবর্ষে এসেছে বিশাল সামাজিক পরিবর্তন এবং অর্থনৈতিক পুনর্বিন্যাস জমিদারী প্রথা বিলোপ, শিল্পোন্নয়ন এনেছে নতুন ক্ষমতার কাঠামো। সমাজের সঙ্গে পরিবারের সম্পর্কের বাঁধন আল্গা হয়ে গেছে। পরিবারের ভেতরেও পারস্পরিক নির্ভরতার সেই দৃঢ় বন্ধন অনেকাংশেই ছিন্ন হয়েছে। আদিম বন্য জীবন থেকে বর্তমানের সভ্য ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনেব মাঝখানের ইতিহাস কৌম সমাজের এবং গোষ্ঠী জীবনের। গোষ্ঠী জীবন থেকেই পরিবাব প্রথার সূত্রপাত। যৌথ পরিবারের পত্তন গোষ্ঠীরই ধাঁচে। এবং এই পরিবার পরিচালিত হত এক নির্দিষ্ট রাজনীতির ভিত্তিতে। পারিবারিক রাজনীতির ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে আধুনিক যুগের গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার কোন উপস্থিতি ছিল না। বৃহৎ পরিবারে ছিলেন এক সর্বময় কর্তা—যিনি অবশ্যই পুরুষ। পারিবারিক বৈষয়িক দিক তিনিই নিয়ন্ত্রণ করতেন। অর্থনৈতিক ক্ষমতা তাঁর হাতেই কেন্দ্রীভূত ছিল। এই বারমহল ছাড়িয়ে যে অন্দরমহল ছিল সেখানে ছিল নারীর কর্তৃত্ব। যে কোন নারীর অবশ্য নয়—ক্ষমতা ছিল সেই নারীর যিনি ক্ষমতাবান পুরুষটির সঙ্গে কোন আত্মীয়তার (মা, স্ত্রী) সূত্রে যুক্ত। অনেকটা চাঁদের ধার করা আলোর মত। এই ক্ষমতার টানা পোড়েন যৌথ পরিবারে যে ছিল না তা নয়। ছিল তবে তাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হত। কারণ পারিবারিক স্বার্থে কোন রকম ভিন্নমতকে উৎসাহ দেওয়া হত না। কিন্তু অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেও এক ধরনের সাম্য বজায় ছিল। খাওয়া দাওয়া, লেখা পড়া, পোশাক পরিচ্ছদ, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিবারের সদস্যদের উপার্জন কোন নির্ধারক ভূমিকা নিত না। এক জনের রোজগার কম হলেও আর একজনের রোজগার দিয়ে ফাঁক পূরণ হত। তারই মধ্যে অবশ্যই স্বার্থের একটা খেলা বা ক্ষমতা প্রকাশের চোরাস্রোত ছিলই। যাই হোক দোষে গুণে যৌথ পরিবার প্রথায় পারিবারিক স্বার্থ সুরক্ষিতই ছিল।

জমিদারী প্রথা বিলোপ, মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশ বিভাগের পরে ভারতীয় পুরানো জীবন যাপনে প্রচণ্ড ওলট পালট হল। কোন রকমে বেঁচে থাকার সংগ্রামই বড় হয়ে উঠল। কালের অমোঘ নিয়মে সেকালের যৌথ পরিবারকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল এখনকার প্রয়োজন মাফিক একক পরিবারকে। এই ভাঙ্গাচোরা খুব সহজে হয়নি। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে মানুষকে অনেক কিছু মানিয়ে নিতে হয়েছে। যেমন মেয়েদের লেখা পড়া শেখা এবং চাকরি করা। কিন্তু বাইরের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে মানসিক পরিবর্তন হয়নি। রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার এক অদ্ভুত সহাবস্থানে আজ আমাদের পরিবার প্রথা দীর্ন বিদীর্ণ। আমরা আধুনিক শিক্ষিতা উপাজর্নক্ষম নারীর কাছে আশা করি কিশোরীর বশ্যতা এবং মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা। তাই দেখা যায় শাশুড়ি বৌ এর সম্পর্ক পরিপূরক

না হয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার। দুই পক্ষই ক্ষমতা ধরে রাখতে এবং কেড়ে নিতে বদ্ধ পরিকর। যার ফলে আজ ঘরে ঘরে গার্হস্থ্য জীবন বিপর্যস্ত।

"নয়নের নীড়"-এ লেখক অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য এই অশান্তিতে চিন্তিত ও বিচলিত। তাই একজন সহৃদয় বিবেকবান মানুষের মত তিনি এই অশান্তির কারণ অন্বেষণে এবং বিশ্লেষণে ব্রতী হয়েছেন। কেন অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার নতুন বৌকে ঘিরে গড়ে ওঠে হতাশা এবং স্বপ্ন ভঙ্গের বেদনা? সে বাড়ির মেয়ে কেন হয়ে যেতে পারে না? মাতা কন্যার মধুর সম্পর্ক না হয়ে কেন শাশুড়ি বৌ এর এক তিক্ত হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক হয়? এক কালের নিপীড়িতা কোন পদ্ধতিতে ভবিষ্যতের নিপীড়ক হয়ে অত্যাচারের ধারাটিকে প্রবহমান রাখে? একটি নারীর জীবনে শ্বশুরবাড়ি নতুন জীবনের হাতছানির বদলে কেন নিয়ে আসে নিন্দিত হওয়ার বিভীষিকা। অনেকগুলি দ্বৈত জীবনের অভিজ্ঞতার আলোয় লেখক সমস্যার উৎস খোঁজার চেষ্টা করেছেন।

জটিল পারিবারিক জীবনে সমস্যার উৎস চিহ্নিত করা খুবেই কঠিন। সংসারের অশান্তির জন্য কে দায়ী? যে মেয়েটি এক চেনা পরিবেশ থেকে এক অচেনা পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সে কি আশা করতে পারে না একটু সহমর্মিতা? নিরন্তর দোষের তর্জনী কি তাকে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে? কৃষ্ণা-তাপস, প্রদীপ-সীমা, শচীন-বিমল-বিমলা, প্রিয়তোষ-রমলা-বরুণ-আলো সুনীতি-অজিত-তিতি, ভূপতি-সরলা-অঞ্জন-দীপা কাল্পনিক চরিত্র নয়। এরা এবং এদের সমস্যা আজ ঘরে ঘরে। কোথাও উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছেলে তার জীবনের আখের গোছাতে গিয়ে নির্মমভাবে মা-বাবাকে একাকীত্বের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। শাশুড়ি বিহীন সংসারেও বাইরে থেকে কলকাঠি নেড়ে নিজের স্বামীর সপক্ষে নিপুণভাবে ঘুঁটি সাজান চলছে। নববধূ তার বাপের বাড়ির গরিমায় শ্বশুর বাড়ির সবকিছুই খাটো করে দেখছে। ঘরে ঘরে মায়েরা তাঁদের সাবালক পুত্রের চাহিদা এবং পছন্দ উপেক্ষা করে নিজ ধারণানুযায়ী পাত্রীকে বৌ করে আনার চেষ্টায় বিফল হয়ে প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে উঠছেন।

এই অশান্ত পারিবারিক বিচ্ছিন্নতাকে লেখক নয়নতারার শান্ত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝার চেষ্টা করেছেন। সময়ের কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়া যায় না। আজ শিক্ষা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য মেয়েদের মধ্যে যে সচেতনতা এবং অধিকারবোধ জাগ্রত হয়েছে তাকে চেপে রাখার চেষ্টা সঠিক পদ্ধতি নয়। ত্যাগ ধৈর্য, তিতিক্ষা, মানিয়ে নেওয়া, বোঝা পড়ার ক্ষমতাকে অনেকদিন ধরেই মেয়েদেরই চরিত্রের আদর্শ হিসেবে দেখা হয়েছে। মানবিক গুণ হিসেবে দেখলে হয়ত সংসারের চেহারা অন্যরকম হত। ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যেও যদি আর একটু গণতান্ত্রিক বিন্যাস আনা যেত তাহলে ভারতের মত দরিদ্র দেশে নারী পুরুষ উভয়েরই সুবিধে হত। আমাদের নেই যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধাবাস অথবা ক্রেশ। পরিবারে যদি পিতামাতার সঙ্গে ছেলে বৌ এর সহাবস্থান হয় তাহলে পরিবারের মধ্যেই পারস্পরিক সহায়তার সুন্দর পরিকাঠামো গড়ে উঠতে পারে। তার জন্যে যে উদারতা, সহিষ্ণুতা ও বিচ-

ক্ষণতা দরকার তা কিন্তু কেবল এক তরফা হলে সংঘাত অনিবার্য। এবং আজ যে পারিবারিক হিংসার বিভৎস চেহারা দেখছি তা এই সংঘাতেরই অনিবার্য পরিণতি।

এরই মধ্যে আশার কথা যে কিছু মানুষ নিরপেক্ষভাবে এই সমস্যাটির আলোচনায় এগিয়ে এসেছেন। একমাত্র মেয়েদেরই পারিবারিক ভাঙার জন্যে দোষী না করে লেখক চেষ্টা করেছেন সমস্যার গভীরে যাবার। তাই অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ না করেও এই গ্রন্থটির জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই।

নয়নের নীড়

পরিবার বৃত্তে বাউন্ডারে :

অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা। কথাটা সারা জীবন ধরে বহুবার শুনেছি। ব্যবহারও কম করিনি। এরকমই বোধ হয় নিয়ম। ছোট বেলায় যখন বলার সুযোগ কম থাকে তখন শোনাটাই, বার বার মাথার মধ্যে তাল-পাতায় অ-আ-ক-খ-এর দাগা বুলোনোর মতো, স্থির নিশ্চয় বসে যায়। আর বড়োবেলার বিস্তীর্ণ পরিসরে সেই রেকর্ড-খানা. রেকর্ডগুলোই, যন্ত্রণা সমস্যার পিনের আঁচড়ে বার বার বেজে ওঠে। একবারও ভেবে দেখার সময় জোটে না কেন জীবনের ডেভিলরা একমাত্র অলস মাথাগুলো খুঁজে খুঁজে ওয়ার্কশপ বানাতে বসে যায়! হিসেব মতো কর্মের ত্রস্তব্যস্ত ঘরঘর তো সদাব্যস্ত বহু অনুশীলিত মস্তিষ্কের হাটেই ভাল জমে ওঠার কথা। অলস মাথাগুলো তো অকর্মের শ্যাওলাপড়া অনুর্বর ক্ষেত্র বলে পরিগণিত হওয়া উচিত। উদ্ভিদ গজানোর জন্যে প্রশস্ত হতে পারে, জীবনের কাজে লাগার মতো কোনও ফসল কি সেই অলস মাথায় পাতা ছাড়তে পারে ?

এখন একটা আস্ত অলস মাথার মালিক হয়ে জীবনের প্রান্ত সীমায় যা করার তাই করছি। বাজে কথার ঝুড়ি ঝুড়ি সংগ্রহকে মাঝে মাঝেই উপুড় করে বিছিয়ে বসি। আর তখনই বুঝতে পারি যে একটা ক্রিয়াশীল মাথা নিয়ে জন্মাতে পারিনি। বুঝি, কারণ ঈশ্বরের পছন্দসই কোন কারখানা সেই মাথায় স্থান পেল না কখনই। আবার এটাও বুঝি—নিজের বোধের কাছেই বুঝি, অপরের মূল্যায়ন অবশ্যই অন্যতর হতে পারে, হয়ে থাকবেও বা —বুঝি যে শয়তানও তেমন করে আমার মাথাটাকে নির্বাচন করে নি। তাই মাঝে মাঝেই বেশ মুষড়ে পড়ি, বিষন্ন বোধে বিবশ হয়ে যাই। এই আমার মাথাটার মধ্যে ঈশ্বর কোনও ভক্তির বিশ্বাসের কৃষিক্ষেত্র রচনা করলেন না, আবার শয়তানও আমার অলস মস্তিষ্কটাকে নিজের শিল্পোদ্যোগে কাজে লাগাল না—হয়তো বা উপযুক্ত বলে মনেই করে নি।

আর এই জন্যেই বোধহয়—এই ঈশ্বর-ত্যক্ত-শয়তান-বর্জিত অবস্থার জন্যেই

বোধহয়—আমার মাথাটার মধ্যে যা খুশি তাই ঢুকে পড়ার সুযোগ পেয়ে গেল অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই। প্রকৃতিতে ফাঁকা জায়গা বলে কিছু থাকতে পারেনা শুনেছি। শোনা কথায় কান দিতে নেই। কান দিতে নেই, কিন্তু কান শুদ্ধ মাথাটাই তো প্রকৃতি তার নিজের দখলে করে নিলেন। শূন্যতা পরিহার করতেই বোধহয় সেই ছোটবেলাতেই তিনি নিজেই ঢুকে পড়লেন। বলা যায় অধিগ্রহণ করে নিলেন। ঈশ্বরের অস্পৃশ্য এবং শয়তানের অচ্ছুৎ এই মাথাটার মধ্যে তাই ঈশানের পুঞ্জমেঘ, দক্ষিণের দুরন্ত হাওয়া, শস্যক্ষেত্রের সবুজ আন্দোলন, আকাশের সুগভীর নীল, জলের নিয়ত প্রবাহের ধ্বনি—সকলেই সুযোগ বুঝে ঢুকে পড়েছিল। তার পরে, একটু বড়বেলায়, দীর্ঘ অকাজের ভুরি ভুরি সংগ্রহের সময়ে, সেই মাথাটার পরতে পরতে মানুষের ছবিগুলো ছাপ রেখে রেখে ভরাট করে চলেছিল। তখন তা টের পাই নি। এখন অলস মাথাটা নিয়ে যখন নিজেই বিব্রত বোধ করি তখন ঝুড়ি উপুড় করে দেখতে পাই মানুষেরই দুঃখবেদনায় আনন্দ উল্লাসে দ্বন্দ্বসমস্যায় আর আশা-আকাঙ্ক্ষার শুষ্ক-শীর্ণ- ফসিলে তা পূর্ণ। বুঝিনা এরা প্রোডাকট না বাই-প্রোডাকট।

পড়াশুনোয় মতি ছিল না। গ্রামবাংলার বাল্যে তাই প্রকৃতিতেই ছিল আমার গতি। মনের খাদ্য শরীরের পুষ্টি আর দিনের তৃপ্তি তাই ঘরের বাইরে প্রতিনিয়ত হাতছানি দিত। এই বাইরের প্রকৃতিই একসময়ে মানুষের প্রকৃতির কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। কেমন একরকম করে যেন এই দুই প্রকৃতির মধ্যে একটা মিল খুঁজে পেতাম। সেই মনের আকাশ, আকাশে পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ, কাল বৈশাখীর ঝড়, ঝরো ঝরো অশ্রুর বৃষ্টি, সেই ক্ষান্তবর্ষণ দুঃখের টপটপানি জলের ফোঁটা যা আমি সবুজপাতার শিষের বদলে চোখের পাতার তল বেয়ে কপোলে গড়াতে দেখেছি। দেখেছি মনের নীলে শরতের হাল্কা মেঘের পালক পালক স্থির ভেসে থাকা, স্থির ভেসে ভেসে যাওয়া। মনের কিশলয় কম্পনে অনুভব করেছি স্নাতসবুজের আদিগন্ত পবিত্রতা। দিদিমা ঠাকুমাদের কাছে বসে শীতের অরুণোদয় শিশির বিন্দুর মুক্তোঝরা হৃদয়ের স্পর্শ উপলব্ধি করেছি। আবার নয়নতারাদের গভীর কালো চোখের তারায় উজ্জ্বল দিনের আলো আর অনুজ্জ্বল রাতের গভীর কালোকে চেনা অচেনার অনুভবে প্রত্যক্ষ করেছি। তার পর জীবনে নিদাঘের তপ্ত তাপ বালুঝড়ের দিগভ্রান্তকারী তাণ্ডব আর মৃত্যুশীতল দুর্দৈবের আঘাতে ক্লিষ্ট প্রাণের অবশ-বিবশ অবস্থাও তো কম দেখি নি!

এই দেখতে গিয়েই আমার আর কিছু করা হয়ে উঠলো না। আর করা হল না বলেই মাথাটা অলস থেকে গেল। সেই যে একদিন আমার বাল্যকালে নিজে কৈশোরের সীমানায় দাঁড়িয়ে নয়নতারা আমাকে বলেছিল, "তুই ভীষণ বোকা রে তপু, এখনও তোর বোঝার বয়স হয়নি। আমাদের, মেয়েদের একটু আগেভাগেই বুঝে নিতে হয়। তুই বড় হলে বুঝবি।" নয়নতারা হয়তো ঠিকই বলেছিল। কিন্তু আমার আর বড় হওয়াটাই হল না। সারাজীবনই বোকা থেকে গেলাম, ছোট থেকে গেলাম। যে বয়সটা হলে সবকিছু বোঝা যায় বলে নয়নতারা মনে করেছিল সেই বয়সটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে গেল। এখন এই শেষ বয়সে এসেও সেই বয়সের হদিস পেলাম না।

এদিকে দীর্ঘ একটি জীবন যাপন করতে করতে কেমন করে যেন জেনে গেলাম যে যারা সব পাশাপাশি থাকল তাদের বহুজনই মনের কাছাকাছি থেকে গেল না। অথচ কবে কোন এক অনব্যক্ত অতীতের নয়নতারা আর একবারের জন্যেও আমার জীবনরেখার কোনও বিন্দুতে না-এসেও কেমন জীবনবৃত্তের কেন্দ্রস্থলে থেকেই গেল। থেকে গেল আরও অনেকেই, বিস্মৃত স্মৃতিতে অথবা স্বরণের আলোছায়ায় কখনও হাজিরায় কখনও অনুপস্থিতিতে। অলস মাথায় স্মরণরাও তেমন সচল সজীব থাকার কথা নয়। এরা কেউ তাই তেমন করে থেকেও যায় নি। এদের যে কখনও ভুলতে পারি নি তা পরিষ্কার বুঝে গেছি যখন এরা ফিরে ফিরে মনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। যখনই বলেছে—দেখতো চেয়ে চিনিতে পার কিনা?—তখনই উচ্চকিত হয়ে ভেবেছি হারিয়ে গিয়েও তো সব হারিয়ে যায় না!

এমনি এক বিস্ময়-মুগ্ধ মুহূর্তে দেখা হল নয়নতারার সঙ্গে। অলস জীবনের অলসতর দৃষ্টিকে গ্যাংটকের দিঙমণ্ডলের ছোঁয়া লাগিয়ে ফিরছি। রাতের ট্রেনে জলপাইগুড়িকে বেশি দূরে ফেলে আসতে পারিনি তখনও। আমার গোছগাছ করার বিশেষ কিছু নেই; বসা আর শোওয়া আমার সমান সহজ। কিন্তু যে পরিবারটি অবশিষ্ট পাঁচটি বার্থের অবাধ অধিকারকে রাতের যোগ্য করে নিতে অত্যন্ত তৎপর তাদের মধ্যে বয়স্ক কর্তাটি সিটের এক কোণে বসে দশভুজারূপিনী-তন্বী শ্যামা প্রৌঢ়দর্শনা স্ত্রীর বাক্সপ্যাঁটরা যুদ্ধ ও অন্যান্য প্রশাসনিক কুশলতাকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে দেখছিলেন। ছেলেমেয়েরা মাকে সাহায্য করতে ব্যস্ত। নয়নতারার সময়

ছিল না অন্যাদিকে মন দেওয়ার ; আমি কিন্তু ওর সেই কালো চোখের আলোকে এক পলকেই চিনে ফেলেছিলাম। এমনিতেই অপরের কাজে বাধা হিসেবে বসে থাকতে চাই না। উঠি উঠি করছিলাম—ওরা গুছিয়ে গাছিয়ে নিলে ফিরে এলেই হবে—এমন একটা ভাবনা মনে এসেও গেছিল। আর তখনই বাল্যের নয়নের তারা আমার নয়নতারাকে একেবারে সামনে দেখে বিস্ময়কে আগলে নিয়ে সরে গেলাম ওদের সামনে থেকে।

দরজার ধারে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় তাপ দিতে চাইলাম। প্রথম বেলার বোকামিটা এই শেষ বেলায় আর একবার ধরা পড়ে গেলে আমার কেমন লাগবে সে কথার চাইতে ওর ঐ কচিকাঁচাদের সামনে, সবিশেষ নির্বিবাদী ঐ ওর স্বামীটিই বা কি ভাববেন ? আমার বোধবুদ্ধি যে সেই ফুলহরার গ্রাম্য পরিবেশ পার হয়ে আসার পরে শত আঘাতে আর বহু শহরের জল খেয়ে খেয়েও কিছুমাত্র বাড়ে নি তা তো আমার জানা। আর আমি যা জানি তা জানতে বুঝতে নয়নতারার যে বিন্দুমাত্র সময় লাগবে না তা আমার চাইতে আর কে বেশি জানে। মনে মনে আনন্দের অভিঘাত যেমন টের পেয়ে যাচ্ছিলাম তেমনি একটা ভয় ভয় ভাবও আমাকে পেয়ে বসেছিল; এই এতোদিন পরে অকস্মাৎ দেখা হয়ে যাবার সৌভাগ্য যেমন অনেক স্মৃতিকে একলহমায় তাজা করে তুলেছিল, তেমনি নিজের অপদার্থতার জাবেদা খাতা খানাও যে আজ নয়নতারার নজরে পড়ে যাবে তা ভেবে বেশ বিমর্ষ বোধ করছিলাম।

শনৈঃ শনৈঃ নিজের সিটের কাছে গিয়ে প্রত্যন্ত উপান্তে বসতে গেলাম। কারণ অবশিষ্ট সিটে নয়নতারার আপাত-উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী দখল জমিয়ে থিতু হয়ে আছে। অনধিকার অধিকার জমিয়ে রেখেছে মনে করেই বোধহয় নয়নতারা কিছু একটা অনুনয়-অনুরোধের সুসভ্য-উচ্চারণ করতে আমার দিকে তাকাল। তাকিয়েই একেবারে থমকে গেল। বলল, 'তপু না ?' আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুমি আমাকে একবারেই চিনে ফেললে ? কি করে পারলে ?—চিনতে ?—মনে রাখতে ?' নয়নতারা এমন হাত দুলিয়ে বলে উঠলো'—শোন কথা !,' —যে আমি ওর স্বামী সন্তানদের চোখগুলো পড়ে নিতে সচেষ্ট হলাম। বলল, 'জান জ্যোতিষ, এই হল তপু' এর কথা তোমাকে আমি বিয়ের পরেই বলেছি। তুমি নিশ্চয়ই তপুর কথা মনে রাখ নি ? আজকের কথা তো নয় !'

বয়স আমার ক্ষেত্রে গাছ-পাথরের নামতা ; নয়নতারা কোন্ মন্ত্রে যে তার দেহে-মনে জলপাই-তনিমাটুকু ধরে রেখে নামতাকে ফাঁকি দিয়েছে তা আমার অজানা। তবে ওর গঙ্গার মতো বহমান দীর্ঘ প্রসারিত কেশগুচ্ছ সময়ের স্পর্শকে এড়িয়ে যেতে পারে নি। রুপোলী রেখার ধারাপাতে বয়সের নামতা ধরা পড়ে গেছে একমাত্র সেখানেই। নির্বাক আমাকে হকচকিয়ে দিতেই যেন প্রশ্ন করেছিল, 'কি দেখছিস অমন হাঁ করে ? দেখিস যেন ছোট বেলার মতো আবার বোকা বোকা প্রশ্ন করে বসিস না !' বলেই ছোট মেয়েটাকে, একটি তরতাজা উজ্জ্বল তরুণীকে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'এই মামাটাকে তোর কিন্তু সামলাতে হবে. তোকেই ভার দিলাম আমি।'

সেই যাত্রায় নয়নতারা আমাকে নোতুন করে জীবনকে দেখতে শিখিয়েছিল। ওর মেয়ে অমি—অমিয়া—তার মিষ্টি ব্যবহারে আর আপনকরা মনের ছোঁয়ায় আমাকে নিজের করে নিয়েছিল। ছেলেটি চাকরি করে, বড় মেয়েটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। জ্যোতিষ বাবু নির্বিরোধ ভদ্রলোক। নয়নতারার উপর যে সব কিছু ছেড়ে দেওয়া যায় তা সবিশেষ বুঝতে পেরে নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করে চলেছেন।

অনেক-অনেক কথা আমরা সেদিন বলেছিলাম—কখনও শব্দে কখনও নিঃশব্দে। বারেবারেই ফিরে ফিরে আসছিল বাল্যের সেই গ্রাম, পরিচিত পরিজন পরিবেশ ; শেষ কৈশোরের অনুভবগুলোকে স্পর্শযোগ্য নৈকট্যে পেয়ে যেন অদ্ভুত আবেশে আপ্লুত হয়ে উঠছিলাম। আশ্চর্য পুলকে শুনছিলাম নয়নতারার বর্তমান জীবনের কাহিনী—স্বামী-পুত্র-কন্যা ও অন্যান্য পরিজনদের নিয়ে যা নিটোল শান্তিতে ভর ভরন্ত। গল্পের মাঝে মাঝেই ছেদ টেনে টেনে সে পরিবারের সব সদস্যদের জন্য তার কর্তব্যগুলো স্বাভাবিক কর্তৃত্বে অনায়াসে করে যাচ্ছিল—তা যেন তার কথাগুলিকেই কবিতার ঝঙ্কারে পরিণত করে তুলছিল। আর তাই সবকিছু ছাড়িয়ে এক নতুন নয়নতারা আমার সম্মুখে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। আমার বারে বারেই মনে হচ্ছিল সংসারে এমনই তো হওয়া উচিত, কিন্তু তা তো হয়না ? সে কি তাহলে নয়নতারার মত এমন এক সফল উজ্জ্বল পরিপূর্ণ নারীমূর্তি পরিবারের উৎসে নেই বলে ?

ছুটন্ত কামরার বাইরে—জ্যোৎস্নালোকিত আবেশময় প্রান্তর-নদী-নালা নাচের তালে তালে অভিবাদন জানাচ্ছে। নয়নতারার সুখ ও আনন্দের

জীবনের সন্ধান পেয়ে এক অনাস্বাদিত হর্ষে মন আমার ভরে উঠলো। রাত তখন কত প্রহর জানিনা; সকলেই যে যার ঘুমিয়ে পড়েছে, নয়নতারার নির্দেশে নিজের বার্থে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ওকে প্রশ্ন করলাম, "কোন মন্ত্রে তুমি সুখশান্তি খুঁজে পেলে জীবনে? সংসারে? আমাকে তার হদিস দিতে পার?" নয়নতারা একটুখানি হেসে বলেছিল, "কোন্ কাজে লাগবে এই অবেলায়?" বলেছিলাম, "আমার নিজের কাজে না লাগলেও অপরের কাজে তো লাগতে পারে; তুমি বলই না।" নয়নতারা যে গম্ভীর হতে পারে, ওর নয়নের গভীরতা স্থির থেমে থাকতে পারে তা এক মুহূর্তেই টের পেয়ে গেছিলাম। ও বলেছিল, "বিশ্বাস। বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা।"

নয়নতারার কথা দুটো রাতের অধিকাংশ সময়টাই দখল করে রেখেছিল। দ্রুতধাবমান ট্রেনের অবিরল যন্ত্রসঙ্গীতের তালেতালে শব্দ দুটো যেন নেচে নেচে আমার চেতনাকে সর্বক্ষণ তাতিয়ে রেখেছিল—বিশ্বাস? কার বিশ্বাসের কথা বলল নয়নতারা? কার প্রতি বিশ্বাস? বিশ্বাসের একটা গুণগত স্পেকট্রাম আছে, আছে একটা পরিমাণগত মাত্রাবিন্যাস। আছে প্রেক্ষিত, আছে স্থান কাল পাত্র! ভাবনা যতোই এগোয় অস্পষ্টতা যেন ততোই আমাকে মাকড়শার জালে জড়িয়ে পথহীন করে ফেলতে চায়। বিশ্বাস কি পারস্পরিক নয়? সংসারের বুনোটে জটিলতা তো বহু-প্রান্তিক—বহুজনের সংসারে প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে প্রত্যেক অপরের এবং ক্রম-অন্বয়ে সকলের যে সম্পর্কের টানাপোড়েন, বুনোট, তাতে বিশ্বাস কোথায় সংহতি পাবে? সামঞ্জস্যের বিন্দু? নির্ভরশীলতা বলে নয়নতারা যে ঠিক কি বোঝাতে চাইল তাও তো আমার মাথায় বেশ স্বচ্ছ-সহজ ঠেকল না। নিজে সংসারের বৃত্ত থেকে দূরে থেকেছি বলে অথবা সংসার নিরাসক্তের কারণে নিরাপদ ভেবেই হয়তো যাতনাপীড়িত নিকটজন প্রিয়জনেরা তাদের দুঃখজর্জর কাহিনী আমাকে শুনিয়ে তাদের বোঝা লাঘব করতে চেয়েছে, আমার সহমর্মিতা কামনা করেছে। আমার মনে তাই সংসার নিয়ে অনেক কথা জমে আছে। সে কথা বেদনার। সে ইতিবৃত্ত যন্ত্রণার। কৃষ্ণা-তাপস, প্রদীপ-সীমা, শচীন-বিমল-বিমলা, প্রিয়তোষ-রমলা-বরুণ-আলোদের মর্মদাহ আমাকে নিঃসীম বিমূঢ়তায় ফেলে দেয় মাঝে মাঝেই; আমি যে তাদের সমস্যাজটিল অন্ধকার জীবনে একবিন্দু আলোকের সন্ধানও দিতে পারিনি।

সকালের সকল পর্ব সমাপন করে ফাঁক মতো বলেছিলাম, "তোমার কথার

মাথামুণ্ডু কিছুই তো আমার মাথায় ঢুকল না। সারা রাত ভেবেছি, কিন্তু সুরাহা হয় নি কিছুই।" ছোট মেয়ে অমির দিকে এক পলক তাকিয়ে কণ্ঠকে একটু নিচু করে নয়নতারা বলেছিল, "সারারাত তুমি শুধু ভাবই নি, বেশ গভীর-গম্ভীর করেই ভেবেছো। বেঞ্চে শুয়ে পড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই যে হারে নাসিকা-সংগীতের মিড়-গমক-মূর্ছনার ধ্বনি বাহার ছাড়ছিলে তাতেই তোমার ভাবনার স্পষ্টতা টের পেতে আর বাকি ছিল না।" অমিয়া মুখ টিপে তার মায়ের খুনসুড়ি দেখে হাসছিল। নয়নতারাকে বলতে-চাওয়া-কথাও আমার তখন হারিয়ে গেল। বোকা বোকা মুখ করে বললাম, "আমার যে মনে হল আমি অনেকক্ষণ ধরেই তোমার কথা নিয়ে জেগে ছিলাম? সে কি তবে ঘুমের মধ্যে? স্বপ্নে?"

নয়নতারা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেশ গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল, "দেখ তপু, আমি গ্রাম্য মেয়ে। লেখাপড়া বেশি জানি না। যা কিছু জেনেছি, বুঝেছি, শিখেছি তা সবটাই প্রায় জীবনের পাঠশালায়, ঠাকুমা-দিদিমা, মা-মাসি, বাবা-কাকা, স্বজন পরিজনদের দেখে-শুনেই শিখেছি। তাছাড়া প্রত্যেকেই তো নিজের নিজের জীবনটা বাঁচতে বাঁচতেই শিখতে থাকে, শিখতে শিখতেই বাঁচতে শেখে, সমঝোতা বা সামঞ্জস্যটাই মনে হয় সব শিক্ষার শেষ শিক্ষা। ত্যাগ না করতে শিখলে কিছুই পাওয়া যায় না বলে আমার মনে হয়।" নয়নতারা থেমে গেল, বললাম, "থামলে কেন, বল। আমার শুনতে ভাল লাগছে।" ওর চোখমুখ দেখেই বুঝলাম নয়নতারা সচেতন হয়ে গেছে। ছেলেমি যে ওর স্বভাবের কাছে পিঠেই ঘাপটি মেরে থাকে—ছেলেমি? না দুষ্টুমি?—তা আমার সবিশেষ জানা। বলল, "তোমরা অনেক অনেক বই পড়ে পড়ে যা সব জান, জানতে পার, তা সব কি সহজে কাউকে দান কর? তাহলে আমি সারাজীবন জীবনের পাতা উল্টে উল্টে যা জেনেছি, বুঝেছি তা এতো সহজে, হঠাৎ-দেখা ট্রেনের-কামরায় তোমাকে দেবো কেন?"

ট্রেনটা গন্তব্যের দিকে জোর কদমে ছুটে চলেছে। এতক্ষণ সেই ছুটে চলার দিকে মন ছিল না। নয়নতারার কথা শুনে বেশ বেকায়দায় পড়ে গেলাম। সামলে নেবার জন্যে জানালা দিয়ে দৃষ্টিকে কাছে-দূরে স্বাধীনতা দিলাম। মনে মনে ভাবলাম—নয়নতারা একটা বেশ পরিপূর্ণ জীবন যাপন করে নিতে পেরেছে। সমঝোতা আর সামঞ্জস্য বোধহয় ওর জীবনে স্বাভাবিক বয়ে এসেছে। তাই ও যা বলে তা সহজ হয়ে প্রকাশ পায়। আর আমরা

যারা বিচার বিশ্লেষণের অলিগলি দিয়ে যুক্তি-তর্কের বেড়া টপকে টপকে সেই সামঞ্জস্যকে খুঁজে মরি তাদের কাছে সহজ সত্যটাই জটিল তত্ত্বের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কি জানি কি হয়। বললাম, "তাহলে কোথায় বসে পাঠ নিতে হবে তাই বলে দাও, হাজির হয়ে যাবো।" সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, "এই তো বুদ্ধিমানের মতো বুঝে গেলে। তবে যে বড় বোকা বোকা ভাব কর?" বললাম, "তুমি আমাকে বোকা বললেও আমার রাগ হয় না, বুদ্ধিমান বললেও লজ্জা বোধ করব না। শুধু বল কি তুমি বলতে চাও।"

নয়নতারা কিছু একটা বলতে গেল। তাকে থামিয়ে দিয়ে অমি বলে উঠল, "তুমি আমাদের নিমতার বাড়িতে চলে আসবে। মা তাই চায়। এটাও বুঝলে না, মামা?"

আমি যে বুঝিনি তা এবারে বুঝে গেলাম। নয়নতারার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠল, "ঠিকানাটা সঠিক লিখে নাও।" বলেই জ্যোতিষকে বলল, "দাও নাগো একটা নকসা করে তপুকে ঠিকানাটা বুঝিয়ে।"

ঘরে ফিরে এসেও আমার শূন্য ঘরে নয়নতারা কটা দিন প্রায় সারাদিনই আমার কাছে কাছে পাশে পাশে থেকে গেল। আমার অলস আহ্নিকগতি জীবনে কোনও বড় ঘটনা ঘটে না। ঘটে না তার কারণ মনে হয় এই যে ঘটনার বনজঙ্গলের উৎস যে বিবাহ তা আমার দ্বারা হয়ে ওঠেনি। আবার ঘটনার আর একটি যে সূত্র, আদর্শবোধ বা নিশ্চিত কোনও জীবন-লক্ষ্য, তাও তেমন করে আমার জীবন আকাশে ধ্রুবতারার মতো টেনে ধরল না। তাই সংসারে আমার আত্মীয় পরিজনের অভাব নেই। ঘাটতি থেকে গেল আপনজনের, স্ব-জনের। আর আদর্শের হাল, লক্ষ্যের পাল ছিল না বলে এলোমেলো জীবনচলনে বহু ঘাটের দেখা মিললেও তেমন করে কোনও ঘাটে নোঙর করার, পৌঁছোনোর সুযোগও মিলল না। সেই কবে কোন বালক কালে নয়নতারার চোখের কালোয় প্রাণের আলো খুঁজতে গিয়ে নোনা জলে ডুবে গেলাম তার পর থেকে কোনো চোখই আর আমার চোখে তেমন করে দ্যুতি ছড়ালো না। নিজ নিজ কক্ষপথে পরিক্রমা করতে করতে আমরা সকলেই হঠাৎ হঠাৎ একে অপরের কাছে এসে যাই, দূরে সরে যাই। প্রকৃতির নিয়মেই ঘটে। কিন্তু সেই প্রকৃতিতে আছে ঋতু পরিবর্তন আর মানুষের প্রকৃতিতে ঘটে সময়ের পরিবর্তন। বাইরের প্রকৃতিতে আছে চক্র-বৃত্ত পরিবর্তন, ভিতরের মানুষ প্রকৃতিতে ঘটে রেখায় রেখায় বহু-রেখ পরিক্রমণ

তাই প্রকৃতিতে ঊষার কিরণ মধ্যাহ্নের তাপে হারিয়ে গিয়েও আরবার ফিরে ফিরে আসে, বসন্তের কোকিল গ্রীষ্মের বায়স-কণ্ঠেই চিরবিদায় নেয় না, আবার ফিরে ফিরে আসে সেই প্রকৃতিরই শ্যামল কুঞ্জে, দক্ষিণে হাওয়ার পাখায় ভর করে। মানব প্রকৃতিতে আবর্তন নেই বলেই বাল্যকালটা আর ফিরে আসে না, পরিক্রমা আছে বলেই সে হারিয়ে যায়, পিছনে সরে সরে যায়। কিন্তু প্রকৃতি কৃপণ নয় বলেই নিজের চক্রব্যূহ থেকে মুক্তির পথ করে দিয়েছে রৈখিক-গমন মানব প্রকৃতিতে। সেই পথ স্মরণের আর কল্পনার পথ।

কিন্তু কল্পনায় নয়, বাস্তবেই একদিন নয়নতারার নিমতার সংসারে হাজির হলাম। আমার অনেক জানার বাকি, অনেক প্রশ্ন উত্তরেব জন্যে অপেক্ষা করে ছিল। এতো দিন বুঝি নি। নয়নতারার সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে যেন মনে হতে থেকেছে আমার অনেক জানার বাকি আছে, অনেক প্রশ্নের উত্তর আমার প্রয়োজন। আর কেন জানি না এটাও মনে হয়েছে সে সব জানার আগ্রহ ওর কাছে গেলেই মিটে যাবে, সে সব প্রশ্নের উত্তর নয়নতারার জানা।

নয়নতারার ঘর সংসার ঃ

কাঠা পাঁচেক জমির উপর দক্ষিণমুখী ঘর। দূর থেকেই পরিচিত পড়শির তর্জনীনির্দেশে জ্যোতিষবাবুর গৃহটি নিশ্চিত চিনে নিয়েছি। নারকেল সুপারির সতেজ সবুজ পাতারা যেন দূর থেকেই আমাকে চিনে নিতে পারল, হাতছানি দিয়ে অভিবাদন জানাল। নিচু পাঁচিলের টানা চৌহদ্দির মধ্যে সামনে-বাগান একতলা গৃহটি দেখে কোনও কিশোরীর আঁকা ছবি বলে মনে হল। লোহার গেট ঠেলে ভিতরে ঢোকার আগেই টানা দালানের সামনে মাটি কামড়ানো ঘাসের একফালি ফাঁকার ঠিক মাঝখানে তুলসীমঞ্চটি দেখা যাবে। ছোট্ট একটা মাটির ঘট ঝরনা হয়ে তুলসী গাছটিকে যেন সবুজ স্নেহের সেচন দিচ্ছে। সেই ঘটের গায়ে নয়নতারার হাতেরই বোধহয় শুভ্র আলপনা আঁকা। আর তুলসীমঞ্চের লাইনেই, বাগান শুরু হবার মুখেই দুপ্রান্তে দুটি পুষ্পভারাবনত নয়নতারা ফুলের গাছ। একটু থমকে গিয়ে

ভাবলাম—নয়নতারা নিজেই বসিয়েছে? না-কি জ্যোতিষ বাবু, অথবা ছেলেমেয়ের কেউ?

"তুমি কি বাগান দেখতে এলে, না আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে?" হকচকিয়ে গেলাম। নয়নতারার প্রশ্ন। প্রশ্নের উৎস খুঁজতে দেরি হল না। লাল দালানের চওড়া পার হয়ে ততক্ষণে নয়নতারা কালো বর্ডার সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নেমে এসেছে তুলসী মঞ্চের কাছে। বললাম, "যে কোন একদিন এখানে আসাটা ছিল তোমার প্রাপ্যের খাতায় আর আমার আদায়ের তালিকায়। কিন্তু আজকের আসাটা অমির অর্জন। বুক ফেয়ারে অমি আমাকে গ্রেপ্তার করে আজকের দিনটা কেড়ে নিয়েছে।"

আগ্রহের আতিশয্যে অপেক্ষিত সময়ের অনেকটা আগেই পৌঁছে গেছি। বারান্দার এক কোণে বেতের চেয়ারে বিন্যস্ত বসার জায়গা। সেখানে পৌঁছোনোর আগেই একে একে প্রশান্ত, সুপ্রিয়া এবং জ্যোতিষ বাবু যথারীতি আনন্দের হাট বসিয়ে দিলেন। বাগান, গৃহ এবং ছেলেমেয়েদের বিষয়ে কথাবার্তা ঘুরে ঘুরে এক ফাঁকে চায়ের কাপ স্পর্শ করে জল খাবারের থালায় গিয়ে থামল।

জ্যোতিষবাবু আমাকে বাগানের গোলাপ, চাঁপা আর গন্ধরাজের ইতিবৃত্ত শোনালেন, ঘুরে ঘুরে পাড়াপ্রতিবেশীদের বিষয়ে অবহিত করালেন এবং জলে কাদায় প্যাচপ্যাচে নিমতা থেকে পিচঢালা বর্তমানের কথা ও কাহিনী বর্ণনা করলেন। মাঝখানে হাইজ্যাক করে অমি আমাকে ওদের ছাদে নিয়ে গেল, চিলেকোঠায় নিজের ছবি আঁকার কর্মশালার খুঁটিনাটি চেনালো এবং তার পরে ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে দূর দূরান্তকে কথায় স্পষ্ট করে তুলতে চাইল। এক ফাঁকে সুপ্রিয়া উপরে এসে বলে গেল, "অমির হাত থেকে যদি ঘণ্টাখানেক সময় বাঁচাতে পার তাহলে তা থেকে আমাকে একটু সময় দিও। অধিবিদ্যার অধিকাংশ নিয়েই আমার কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা। তোমার কাছে দর্শনে প্রবেশের দৃষ্টিটা পাই কি না তা একবার দেখে নিতে চাই।" সুপ্রিয়া সুন্দর করে নিজের কথাকে বলতে চেষ্টা করল। আমি কিছু বলার আগেই অমি বলে উঠলো, "মামা আজ নিজেই ছাত্র হয়ে মায়ের কাছে এসেছে, গুরু হয়ে আজ আর তোমার গুরুভার দর্শনের মাকড়শার জাল ঘাঁটতে বসবে না।" আমি সুপ্রিয়াকে আশ্বস্ত করে বললাম, "সময় পেলে তোমার পড়ার টেবিলে যাব। গুরু শিষ্যের টোল খুলে না বসেও মামা-ভাগনীতে কিছু নিটোল প্রশ্ন উত্তরের

ভাগীদার হওয়া যাবে।" আমার কথায় সুপ্রিয়া যে বেশ খুশি হয়ে গেল তা বুঝলাম যাবার সময় ও অমির দিকে একটা 'কেমন হল'-গোছের দৃষ্টি ছিটিয়ে দিয়ে গেল দেখে।

রান্নাঘরের দরজার বাইরে একটা মোড়া বসিয়ে নয়নতারা বলল, "এখানেই তুমি বস। বসে বসে তোমার কথা বল। আমি রান্না করতে করতে শুনি।" আমি আবাক হবার ভান করে বললাম, "বা-রে আমি তো তোমার কথা শুনব বলে তোমার নিমতার বাড়িতে এসেছি। আর তুমি কিনা আমাকে বলছ আমার কথা বলতে।" উত্তপ্ত কড়াই-তে মুঠো মুঠো করে বাঁহাতে ধরা থালা থেকে ডানহাতে করে শাকপাতা ছাড়তে ছাড়তে একবার আমার দিকে তির্যক দেখে নিল। কড়াই থেকে ছ্যাঁক-ছ্যাঁক করে শব্দ এলো। থালাখানা শেষ কালে কড়াইতে ঢাকা দিয়ে বসার পিঁড়িতে চেপে বসে বলল, "আমার কথা? আমার আবার কথা কি?—বিয়ে হয়ে দূরদেশে চলে গেল কন্যে; শ্বশুর শাশুড়ি এবং স্বামীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করতে লাগল—হয়ে গেল সব কথা, আমার কথা।" এমন করে বলল নয়নতারা যে আমার শুনে হাসি পেয়ে গেল। বললাম, "কেন দেওর-ভাসুর-ননদ গেল কোথায়? তারা সঙ্গে থেকেও 'সুখ শান্তিতে' ঘর সংসার চলল কন্যের?"

একটু পাশ ফিরে বাঁহাতে সাড়াশি নিয়ে ডান হাতে খুন্তি দিয়ে থালা আর শাককে নয় যেন আমার কথাগুলোকেই চেপে ধরে নেড়ে চেড়ে দিল। বলল, "ছেলেবেলা থেকে পুতুলের সংসার করেছি। সব পুতুলের সংসারই যৌথ পরিবার হয়ে থাকে। তাই সকলের আনন্দ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রাপ্য-দেয় আমাদের জানা হয়ে যায় ছোটবেলা থেকেই। রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার যখনই গোলমেলে ঠেকেছে তখনই মা-মাসি ঠাকুমা-দিদিমারা হাত ধরে শিখিয়ে দিয়েছে। আমাদের সংসার তাই আবাল্যই সুখ শান্তির সংসার, আমৃত্যুও সুখ শান্তির সংসার। সংসারের মধ্যে আমরা হারিয়ে গিয়েই তো নিজেদের ভাসিয়ে তুলি। তাই হয়, তাইই হয়ে আসছে।"

আমি পট করে বলে বসলাম, "তা হয় না, তা হচ্ছে না। আজকাল সব কেমন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে?" "তা বলতে পারব না," নয়নতারা বলে উঠলো, "তবে এটা বলতে পারব যে চেয়ে পাওয়া যায় না, না-চাইলেই বোধহয় পাওয়া যায়। আমরা তো চাই নি কিছুই, শুধু প্রচলিত রীতি মেনে চলেছি। আমরা সংসার না চেয়েই পেয়েছি, সুখশান্তি চাই নি

চেয়েছি স্বীকৃত আচার আচরণে সকলকে তুষ্ট করতে। তাই বোধহয় সুখও পেয়েছি শান্তিও পেয়েছি। নয়নতারার কথা শুনতে আমার মনে কবির দুটি লাইন নড়ে চড়ে উঠলো—যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না—নয়নতারা বোধহয় টের পেয়ে গেল। বলল, "আমার কথায় কান না দিয়ে তুমি কার কথায় মন দিয়ে আছ শুনি?" তৎক্ষণাৎ সচেতন হয়ে একটু নড়ে-চড়ে বসে বললাম, "না-না, তোমার কথাতেই তো মন দিয়ে আছি। তবে মাঝখানে···" আমাকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে বলন, "মাঝখানে? কি হল মাঝখানে?" নয়নতারাকে কবির কথা বলতেই রেগে গেল। বলন, "তুমি কি মনে করো কবির ঐ কথাটাও আমি জানি না? আমি গ্রাম্য হতে পারি কিন্তু আমাকে গেঁও মনে করলে কি করে?"

আমি জানি এটা নয়নতারার ঝগড়া নয়, আক্রমণ নয়, উত্তেজনা তো নয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেই সামাধান। তাই সেই জানা পথেই চুপ করে গেলাম। প্রতিপক্ষ নড়াচড়া না করলেই জানা হয়ে যায় যে সে আত্মসমর্পণ করেছে। বিজয়ীর পক্ষে তখন স্বাভাবিক হতে আর বাধা থাকে না। নয়নতারা পুরোনো কথার খেই ধরে বলতে শুরু করল, "যে কোনও চাওয়ার মধ্যেই স্বার্থের চেতনা থেকে যায়, একক করে, একেবারে একমাত্র নিজের করে পাওয়ার ব্যাপারটা থেকে যায়। জট পাকায় এই স্বার্থের সুতোগুলোই। সংসার কি কারো একার? স্বামী একার, পিতা একার হতে পারে, পারে মাতাও একার হতে। কিন্তু সংসার? পরিবার? সে তো সকলের হতে বাধ্য। তাহলেই দেখ প্রত্যেক চাওয়ার মধ্যে একটা অসামঞ্জস্যের বীজ, একটা বিরোধের উৎসমুখ থেকেই যাচ্ছে। সেই বীজ থেকেই ভুলের অংকুর, বৃদ্ধি এবং বনস্পতি; সেই উৎসমুখেই ভুলের জন্ম প্রবাহ এবং বন্যা। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিগত, স্বার্থগত, চাওয়ার মধ্যেই ভুল করে চাওয়াটা ওত পেতে থাকে। ঠিক তেমনি প্রত্যেক পাওয়ার পিছনে অসামঞ্জস্যের আর বিরোধের বেদনাবোধ হুঁ হুঁ করে প্রকাশ পেয়ে যায়।"

"তাহলে কি মানুষ সুখ শান্তি চাইবে না? সুখ চাইলেই ভুল চাওয়া হল? শান্তির জন্যে উম্মুখ হলেই অশান্তি পাওনা হয়ে যাবে? তাহলে তো বিষম বিপদের কথা দেখতে পাচ্ছি।" আমার কথা শুনে নয়নতারা একটুখানি হাসি অধিকন্তু উপহার দিয়ে বলল, "কুটকচালিতে—যুক্তির কুটে আর তর্কের কচালিতে—আর যাই মিলুক সুখ শান্তি মেলে না তা জেনে

রেখো তপু। এটা সোজা কথা, তুমি যেখানে নিয়োজিত, যে স্থান-কাল-পাত্র বিন্যাসে তোমার অবস্থান, সেখানে তোমার কর্মটিও তো নিশ্চিত। তো, সেই নির্ধারিত কাজটুকু যথাযথ করে গেলে আর ঝামেলা থাকেনা। সুখ শান্তি মানে কি ? ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট না থাকাই তো ? বিঘ্নবিপদ না ঘটাইতো ? না-না করে বললে তাই হয় না ?"

আমি উত্তর দেবো কি, নয়নতারার মুখে গীতার কর্মযোগের অনুরণন শুনে অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর সেই জন্যেই এই এতোবয়সেও একটা বকুনি খেয়ে নিলাম। "হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছ কেন ? কিছু একটা হ্যাঁ-বা-না বল !" আমি নড়েচড়ে বসে নয়নতারার বকুনি হজম করতে করতে বলে উঠলাম, "সে তো ঠিকই, সে তো অবশ্যই, কিন্তু ফলাফলের অধিকার বা আকাঙ্ক্ষা বর্জন করে কি কোনও কাজই করা যায় ? অথবা কর্মের জন্যেই কর্ম করা ? যেমন এক বিশ্বখ্যাত নীতি-দার্শনিক বলেছেন যে ফলাফলের বাসনা, মানসিক ঝোঁক এমন কি ভাল লাগা মন্দ লাগা পর্যন্ত কঠোর ভাবে কর্ম থেকে বাদ দিতে হবে যদি কর্মকে সঠিক কর্ম বা স্বীকৃত কর্ম বলে মানতে হয়।" থেমে গেলাম মাঝপথেই। থেমে গেলাম কারণ পরিষ্কার দেখতে পেলাম নয়নতারার বড় বড় চোখের কালো কালো তারায় বিদ্যুৎ থেমে আছে। ঠিকরে বেরুলে তা আলো দেবে, না জ্বালিয়ে দেবে তা বুঝতে না পেরেই থেমে গেলাম।

চোখের তারার ঝিলিক ছড়িয়ে নরনতারা বলল, "থামলে কেন ? আরও দুচার পাতা বলে যাও না।" বলেই আমাকে চুপ করে থাকার সুযোগ দিল বোধহয়। তারপরে সাফল্যে চোখকে নম্র করে বলল, "তোমরা পণ্ডিতরা ভীষণ বোকা হতে পার। সোজা কথাটা সহজ করে দেখতে পাও না ; দেখতে পাও না, না, দেখতে চাও না তা অবশ্য আমি বলতে পারব না। দু'কথায় সব কথা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের ভয় হয় পাছে লোকে আনপড়, অজ্ঞ বলে মনে করে বসে। বিষয়কে নেড়ে চেড়ে যথেষ্ট ধুলো উড়িয়ে তবে তোমরা বুঝতে পার যে বিষয়টা কাঙ্ক্ষিত রকমের কঠিন কারণ সমাধান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না ! কাজ করার সময়ে যদি ফলের অধিকারবোধ বা আকাঙ্ক্ষাটাই চোখ জুড়ে থাকে তাহলে কাজটা কি ঠিক ঠিক করা যাবে ? হাঁড়ি মাথায় দুধওয়ালী যদি সম্ভাব্য রাজকুমারের বিবাহপ্রস্তাব মাথায়-হাঁড়ি-অবস্থাতেই মাথা-নেড়ে নাকচ করে দেয় তাহলে তার দুধ বিক্রয় পণ্ড এবং ফলের আকাঙ্ক্ষার-

ও গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। দুধ বিক্রির কাজে সে দিকেই মন দেবার কথা, ফলাফলের দিকে অধিকারের দিকে নয়। খেলার মাঠে যে ছেলেটি গোল দেবে সে যদি গোল-হয়ে-গেল-অবস্থাটার কথাই মনে ক'রে এগোয় তাহলে তার পায়ের বল কি তার পায়ে থাকবে? যে কাজটা সদ্য, যার জন্যে ব্যক্তি নিয়োজিত, সেই কাজটাতেই মনোযোগ দেবার কথা; কাজের সময়ে ফলের প্রতি অধিকার বোধ আর আকাঙ্ক্ষায় মনোবিক্ষেপ কাজটাকেও পণ্ড করে ফলকেও অধরা করে দেয়। সংসারের সুখ শান্তির বেলায় অন্যথা হবে কেন? সুখ চাই শান্তি চাই বলে হাপিত্যেশ করে হেদিয়ে মরলেও সুখ শান্তির হদিস মিলবেনা। অথচ করণীয় কাজগুলো যথাযথ করে গেলে, মন লাগিয়ে সম্পন্ন করতে থাকলে গাছেও ওঠা যাবে, যথাসময়ে এক কাঁদি হয়ে সুখ শান্তিও হাতে আসবে।"

বাধা না দিলে নয়নতারা অনেক কথা বলতে পারে বুঝে গেলাম। বললাম, "তাহলে কৃষ্ণার মনে সুখ নেই কেন? সংসারে শান্তি নেই কেন?" ক্ষণকাল ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থেকে নয়নতারা বলে উঠলো, "সে বোধহয় কালো মেয়ের কপাল দোষে। অথবা কৃষ্ণা নামের জন্যেই!" আমি বললাম, "কৃষ্ণা তো কালো নয়, খুবই ফর্সা, সুন্দরী এবং কাজকে ভয়তো পায়ই না বরং বলা যায় ভালই বাসে।"

চোখের কোণে ঝিলিক তুলে চিমটি কাটার মতো করে বলল, 'অনেকক্ষণ হয়ে গেছে বুদ্ধির গোড়ায় তাপ দাও নি, ওটা এতক্ষণে বরফ-শীতল নির্বোধ মতো হয়ে গেছে। ও ঘরে গিয়ে একটা সিগারেট ধরাও আমি চা নিয়ে আসছি। দ্বিগুন বা দ্বিমাত্রিক তাপের যোগান না পেলে তোমার মাথাটা আর কাজ করবে বলে মনে হচ্ছে না। কৃষ্ণা কে? তাকে আমি চিনি নাকি মশাই?"

নিজের জন্যে নিজের বেশ কষ্ট হল। বারান্দার নির্দেশিত স্থানে যেতে যেতে ভাবলাম—তাই তো! ঝোঁকের মাথায় ধরেই নিয়েছিলাম যেহেতু আমি কৃষ্ণাকে চিনি সুতরাং নয়নতারাও চেনে। শুনতে পেলাম সুপ্রিয়াকে 'ভাতটা একটু দেখিস তো সুপি'—বলে নয়নতারা এদিকেই আসছে। চায়ের কাপটা বেতের টেবিলে রেখে বলল, "এবারে বল কৃষ্ণা কে? কেন তার জীবনে সুখ নেই, সংসারে শান্তি নেই?" বলেই টিপ্পনী কাটল, "সিগারেট ধরাও নি যে বড়? শুধু চায়ের গরমে বরফ গলবে?"

কৃষ্ণার যন্ত্রণা ঃ

নয়নতারার কথায় কান না দিয়ে বললাম, "কৃষ্ণা আমার এক ভাইঝি। বিজ্ঞানের সাম্মানিক স্নাতক, চব্বিশ, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি, সুশ্রী। ফর্সা এবং সুন্দরী আগেই বলেছি। ঠাকুমার আদরে লালিত, মা-বাবার স্নেহে পালিত এবং তিন সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠটি বলে অভিমান ও সচেতনতা সমধিক। পত্র যোগাযোগে চারশতাধিক মাইল দূরে পাত্রস্থ। পতিগৃহে শ্বশুর, শাশুড়ি এবং স্বামী। এক ননদ একঘণ্টার বাসের দূরত্বে বিবাহিতা। দুই সন্তানের জননী স্কুল শিক্ষক এবং অগাধ ভূসম্পত্তির মালিকের ঘরনী বলে ননদ সুস্থিত।" নয়নতারা ফিক করে হেসে ফেলল। বলল, "তুমি এমন করে বললে যেন পাটিগণিত থেকে কোনও অংক পড়ে শোনালে। প্রশ্ন অংশটি এখনও পড় নি কিন্তু।" বলেছিলাম, "কেন ? প্রশ্ন তো আগেই করেছিলাম—কৃষ্ণার মনে সুখ নেই কেন ? সংসারে শান্তি নেই কেন ?—সে কি ভুলে গেছ ?"

এবারে নয়নতারা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, "মনে আমার ঠিকই আছে। বিবরণ থেকে মানুষের, বিশেষ করে যুবক যুবতীর মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা গতি-প্রকৃতি মনোভাব মূল্যবোধ বিষয়ে কিছু কি জানা যায় ? জীবন তো আর অংক নয় যে কষে নিয়ে উত্তর নিশ্চয় করা যাবে ; জীবন তো একটা জীবন্ত প্রবাহের শতমুখ অগ্রগমন একটা মানসিকতার ক্রম উত্তরণের ধাপে ধাপে ক্রমপরিবর্তন ক্রমঅভিযোজন এবং বলা যায় একটা দীর্ঘ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি আনন্দ-বিষাদের রূপরেখার নাম। অনিশ্চয় ভবিষ্যের দিকে নিশ্চিত পদক্ষেপ। বাধা দিয়ে বলেছি, "আমি এলাম সত্যলাভের আশায় আর তুমি কিনা তত্ত্বজ্ঞানের দার্শনিকতায় আমার চিন্তাকেও আচ্ছন্ন করে দিতে চাইছো !" নয়নতারার চোখ দুটো আবার নেচে উঠেছিল। বলেছিল, "আমি যা বললাম তা দর্শন ? তাহলে তো দর্শন বেশ সোজা বিষয়, সব লোকই তাহলে তো দার্শনিক।"

মনে মনে বুঝে গেলাম—এপথে হবে না। তাই সোজা পথ ধরে এগুবো স্থির করে বলেছি, "কৃষ্ণা সম্পর্কে কি কি জানতে চাও বল। আমি যা জানি তা অবশ্যই জানাব তা ছাড়াও যদি তোমার কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই

তুমি তোমার অনুমান কল্পনা আর অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে পার। এক-টাই অনুরোধ আমাকে বোকা বানানোর জন্যে তুমি অমন করে তোমার চোখের পল্লব নাচাবে না!" খিল খিল করে হেসে উঠে নয়নতারা বলল, "আচ্ছা, বেশ, নাচাব না। কিন্তু নিজে নিজে নেচে উঠলে তুমি আমার ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারবে না।" মনে মনে ভাবলাম—চোখের পাতা নিজে নিজে কেঁপে উঠতে পারে, কিন্তু নাচে, নাচতে পারে বলে কখনও শুনিনি। মুখে বললাম "তথাস্তু।"

নয়নতারা প্রশ্ন করল, "নিজের স্বামীর বিষয়ে কৃষ্ণার কোনও অভিযোগ আছে? কি ধরনের অভিযোগ? মনে মনে কৃষ্ণার মুখটা ভেবে নিলাম। বহুবার বলা আর বহুভাবে বলা কৃষ্ণার অভিমান-অভিযোগ-বিবরণ থেকে খুঁজে খুঁজে নয়নতারার প্রশ্নের উত্তর তালাশ করতে চেষ্টা করলাম। আমাকে ভাবতে দেখে নয়নতারা যোগ করল, "দেখ তপু, তুমি যখন ভেবে ভেবে উত্তর দিতে তথ্য কুড়িয়ে ফিরছ তখন আমার বাকি প্রশ্নও করে রাখি। স্বামী ছাড়াও আমি কৃষ্ণার শ্বশুরমশাই, শাশুড়ি এবং ননদ বিষয়েও অভিযোগ বা মূল্যায়ন জানতে চাইব। তার পরে অবশ্য কৃষ্ণার বিষয়ে ওদের, ওই স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি এবং ননদের কথা তাঁদের মতামত অভিযোগ জানতে চাইব। তুমি ভেবে গুছিয়ে ঠিক করে নাও। ততক্ষণে আমি একটু রান্নাঘরটা দেখে আসি।"

মনে মনে কৃষ্ণার কথা নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কৃষ্ণা বলেছিল, জান জ্যেঠুমণি তাপসের সবই ভাল কিন্তু তাপস বড্ড কঠিন আর জেদী। নিজে যা বোঝে নিজে যা ঠিক বলে মনে করে তা থেকে এক চুলও নড়বে না। নড়বে তো না-ই বরং জেদ ধরে সেই কাজ করিয়ে ছাড়বে। তাছাড়া মায়ের কথা তাপসের কাছে বেদবাক্য। বলেই কৃষ্ণা আমার ভাবনাকে সাহায্য করতেই যেন বলেছিল—আর তাপস আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল মায়ের কথা, সবকথা শুনে চললে তোমার কোনও কষ্ট হবে না। এদিকে তাপস একদম বোঝে না যে মায়ের নির্দেশ মতো আমি যদি কিছু করি বা না করি তা তাপসের পছন্দের নাও হতে পারে। এরকম যখন বিরোধ দেখা দেয় তখন আমি যদি বলি—মা বলেছেন তাহলে তাপস রেগে যায় 'না ককখনো না, মা এমন কথা বলতে পারে না এমন নির্দেশ দিতে পারে না।' তুমিই বল আমি কোথায় দাঁড়াই? যদি বলি—মাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিও তিনি বলেছেন কিনা

তাপস কঠিন হয়ে জবাব দেবে 'মায়ের বিষয়ে আমার থেকে তুমি বেশি জান? তোমার কাছে মা কি বলতে পারে-না-পারে তা আমাকে জানতে হবে?'—আমার রাগও হয় কান্নাও পেয়ে যায়।"

সেদিন কৃষ্ণার কথা ভাবছিলাম আর ওর কষ্টের কারণগুলো অনুভব করতে চেষ্টা করছিলাম, "তোমরা দুজনেই তো বিজ্ঞানের স্নাতক। তাপস সাধারণ বিভাগের আর তুমি সাম্মানিক শ্রেণীর। বিষয় আলাদা, কিন্তু বিজ্ঞান মন বলে একটা অনুসন্ধানী মন দুজনের মধ্যেই তো বেড়ে ওঠার কথা ছিল। তা হল না কেন?" কৃষ্ণা ফোঁস করে উঠেছিল। বলেছিল, "সেটাই তো আমার দোষের হয়ে গেল। তাপসের মনে বোধহয় একটা কমপ্লেক্স আছে। তাই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যেই বোধহয় ও আমার অজ্ঞতার এলাকাগুলো আমার চোখের সামনে মরা ইঁদুরের মতো দোলাতে থাকে আর সুযোগ পেলেই ঢাকে কাঠি দিয়ে সকলকে জানাতে চায়।" কৃষ্ণাকে সহানুভূতি জানাতে বলেছি, "আমরা সকলেই তো যা জানি তার চাইতে সহস্রগুণ বেশি জানি না। না-জানার অন্ধকার এলাকা দিয়ে তো জ্ঞানের পরিচয় নয়, জানার পরিধিই তো আমাদের আলোর সন্ধান দেয়।" ছলছল চোখে কৃষ্ণা বলেছিল, "অথচ, তাপস তা বোঝে না। আমরা মেয়েরা বই পত্রের প্রতি যতটা মনোযোগী থাকি ততটা কি বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী, ক্রিকেট মাঠের শতরান আর নিত্যদিনের খবরের কাগজে সময় দিয়ে থাকি? আমাদের পড়াশুনোর মধ্যে মধ্যেই মা-বাবা ভাই বোন আর সংসার ঢুকে পড়ে। আর ছেলেদের? ওদের বেলায় মাঠ-ঘাট ক্লাব-রাজনীতি আড্ডা-দোকান। আমরা তাই সাংসারিক জীব হয়ে বেড়ে উঠি না? আর ওরা বেশি বেশি জাগতিক?—তুমিই বল!"

তাপসের প্রসঙ্গ থেকে কৃষ্ণাকে সরিয়ে নিতেই বলেছি, "তা, তোমার শাশুড়ি কেমন? তোমাকে মেয়ের মতন দেখেন তো?" কৃষ্ণা ঝরঝর করে ফেটে পড়েছিল, "প্রথম প্রথম মনে হয়েছিল—অত্যন্ত স্নেহময়ী, মমতাময়ী, যেন করুণার প্রতিমূর্তি। ছেলে অন্ত-প্রাণ, কৃষ্ণা-অন্ত গৃহিনী। দু'চার দিন যেতেই বুঝে গেলাম—'আপন-আপন পর-পর যে না বোঝে সে বর্বর'— নীতির একনিষ্ঠ বিশ্বাসী। ছেলে তাঁর আপন, আমি তো পর—পরের বাড়ির মেয়ে, নিজের তো নই, তাই। ছেলে যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ তাকে আগলে আগলে রাখে। সব আমি করব—রান্নাবান্না, ঘর গোছানো,

খেতে দেওয়া, জলখাবার-চা—সবই। কিন্তু খেতে দেবার বেলায় তিনি সর্বেসর্বা হয়ে বসবেন, বিশেষ করে ছেলের বেলায় কোনও সুযোগ আমাকে তিনি দেবেন না।" আমি জানতে চেয়েছি, "তাপস এ-সব জানত না? বুঝতে পারত না?" চোখে আগুন ঝরিয়ে কৃষ্ণা বলেছিল, "জানবে-বুঝবেন কি, তিনি তো মাতৃ-অন্ত শিশুটি তখন! 'এটা কেমন হয়েছে? ওটা কেমন খেলি, মাছ আর একখণ্ড দেব নাকি'—এমতো টুকরো টুকরো প্রশ্ন আর 'একটু ভাল করে খা, শরীরটার দিকে একটু নজর দে, দিন দিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছিস'—এমতো বহু কথা শত ইঙ্গিত নাড়াচাড়া করেন। কোনও পদ যদি ছেলের পছন্দ হল না তাহলেই আমাকে আর আমার মাকে নিয়ে পড়বেন সুযোগ পেলেই—কিছু শিখে আস নি, তোমার মা'ই বা কেমন, কিছু শেখায় নি, শুধু লেখা-পড়াতে কি কাজ চলে, ঘরের কাজ তো একটু আধটু শিখে আসতে হয়—আরও কতো কি! ধীরে ধীরে জেনে গেলাম—বই পত্রের নির্যাসে সংসার সচল হয় না, স্কুলকলেজের সার্টিফিকেট কোনো ধুয়ে খাবার বস্তু নয়, আধুনিকারা শ্বশুরবাড়ি গিয়েই নাকি স্বাস্থ্যের গতিপ্রবাহটিকে ছেলে থেকে নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়—এবং আরও কতো কি।"

আমি কৃষ্ণাকে বেশ সন্তর্পণে বলেছিলাম, "বয়স্ক মহিলারা বিশেষ করে শাশুড়িরা একটু বেশি সংসারপ্রিয় থাকেন। নোতুন বউ এলেই তাঁরা নিজ নিজ সংসারের ঐতিহ্য বিষয়ে বোধহয় একটু বেশি সচেতন—বলতে পার স্পর্শকাতর—হয়ে পড়েন।" বাধা দিয়ে কৃষ্ণা বলেছিল, "তুমি জাননা জ্যেঠুমণি, অধিকার বোধ—সেন্স অব পজেশন—সংসারের কেন্দ্র থেকে, জীবনের উত্তেজক-বৃত্ত থেকে এরা সরে যেতে যেতেও থেকে যেতে চায়, আগন্তুক পরগৃহকন্যাকে নিজের অতীত স্হানটি দখল করে নিতে বাধা দিতে চায়, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চায় বলেই এরা এমন ব্যবহার করে।" বলেই কি একটু ভেবে নিয়ে বলেছিল, "জান এরা মিথ্যা কথা বলে, বানিয়ে বানিয়ে বৌদের নামে নালিশ ক'বে, যা-নয়-তাই ব'লে ছেলেদের মনে বিষের বীজ উপ্ত করে দিতে চায়। কেন? ভবিষ্যতের পদধ্বনিতে শংকিত হয়েই নয় কি? ছেলে হারানোর চেতনাতেই নয় কি?"

"আর তোমার শ্বশুর মশাই?" যেন আমার প্রশ্নের অপেক্ষাতেই ছিল। বলে উঠল, "সদাশিব, দেবতুল্য, নির্বিরোধ। কথা কম বলেন, ধৈর্য বেশি প্রকাশ করেন। দীর্ঘদিনই এই দেখেছি, এই জেনেছি, এবং এই বুঝেছি।

কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা আর নানা কাহিনীর বুনোটে এই সব তথ্যই অন্যতর সত্যের নির্দেশ করেছে। জেনেছি তিনি স্ত্রী-নির্দেশের অপেক্ষায় অসীম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন, নিজের কোনও কথা নেই বলেই কম কথা বলেন এবং সংসারের হালটি সম্পূর্ণত স্ত্রীর হাতে হস্তান্তরিত বলে নিজ দেহে ভস্ম-মেখে রাখেন। দীর্ঘ জীবনে গৃহিণীর বিরুদ্ধে কখনও যান নি বলেই অভ্যাসে নির্বিরোধ। আমাদের সংসারে তিনিই কর্তা, যেমন নৈবেদ্যের থালায় শশার টুকরোটি। ওঁর জন্যে আমার কষ্ট হয়েছে ; কিন্তু ওঁর নিজের কোনও কষ্টবোধ ছিল কিনা তা টের পাই নি। দিনের পর দিন দেখেছি আমার স্বামী এবং শাশুড়ি ওঁর স্তুতি করেছে কিন্তু কখনও ওঁর মতামতের জন্যে প্রস্তুতির বিন্দুমাত্র নমুনা দেখি নি।"

স্বাভাবিক প্রশ্ন মুখে এসে গেছে, "তোমার ননদিনী ?" কৃষ্ণাকে সেই প্রথম হাসতে দেখেছিলাম অনেকক্ষণ বাদে। বলেছিল, "রায় বাঘিনী নয়, স্পটেড চিতা ! মনসার সঙ্গে ধুনোর গন্ধের প্রবাদসম্পর্কের গভীরে জানি-না, কিন্তু বয়স্ক স্বামীর যুবতী স্ত্রী যদি প্রথম সন্তান হিসেবে অতীব ফর্সা চিকমসুন্দর একটি কন্যা রত্ন উপহার দেয় তাহলে সংসার তরীটি যে আজীবন সেই কন্যাপ্রাপ্তিতে স্ত্রীর দিকেই হেলে পড়ে, একেবারে ডুবু ডুবু হয়ে যায়, তা প্রত্যক্ষ করেছি। এবং এ-ও জেনেছি, অনেক দুঃখেই জেনেছি, যে সেই কন্যা পিতামাতার স্নেহ-ভালবাসার হিসেবের খাতায় ব্ল্যাঙ্ক-চেক কাটার আজীবন সুযোগ পায়। এক দিকে তাপসের মা—আমার পক্ষে তত-দিনে মা-মনসা হয়ে গেছেন—অন্যদিকে ননদিনীর আগমনে যে ধুনোর গন্ধ তা আমার টের পেতে বেশি বিলম্ব হয় নি। আমি থাকতাম আগ্নেয়গিরির শীর্ষে আর আমার স্বামীটি এক ঝটকায় তার বিবাহপূর্ব কুমার জীবনের খোলসে আ-চক্ষু ঢুকে পড়তো। কে আমাকে তখন বাঁচাবে ? না-দেবে না-মানবে !"

একদম খেয়াল করিনি। আমার চোখের সামনে একখানা হাত, হাতের আঙুল এদিকওদিক নড়াচড়া করছে টের পেলাম। সম্বিত ফিরে এলে নয়ন-তারাকে বুঝতে পেরে নড়ে চড়ে বসলাম। সিগারেটের দিকে হাত বাড়াতে গেলাম। নয়নতারা এগিয়ে দিল। বলল, "কোথায় হারিয়ে গেছিলে ? প্রায় যে ক্যারটের বদলে সিগারেট দেখিয়ে তুলে আনতে হল !" একটা বোকা বোকা হাসি মিশিয়ে বলেছিলাম, "কৃষ্ণার সঙ্গে ছিলাম। শেষ কালটায় বেশ

মজা করে কৃষ্ণা কথা বলছিল। তাই বোধহয় একটু বেশি ভুলোমিতে পেয়ে গেছিল।"

"তা কৃষ্ণা কি বলল?" গুছিয়ে বসতে বসতে নয়নতারা প্রশ্ন করল, "উত্তর কিছু মিলল?" আমি সবিস্তারে কৃষ্ণার কথা নয়নতারাকে বললাম। খুব মনোযোগ দিয়ে সব শুনল। বলল, "তা ওদের কথাও তো জানতে হবে— ওই তাপস, তাপসের মা, বাবা এবং দিদির কথা। না হলে বুঝবো কি করে যে গোলমালটা কোথায়?" বললাম, "ওদের কথাতো ওদের মুখে শুনি নি তবে কৃষ্ণার বাবার কাছে যা জেনেছি তাই বলতে পারি। তা'থেকে তোমাকে বুঝে নিতে হবে।" নয়নতারা বলল, "তাই তুমি বল। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি বলবে এবং সংক্ষেপে। স্নানাহার বিলম্বিত হলে আমাদের দুঃখ বাড়বে কিন্তু।"

বাগান পার হয়ে জ্যোতিষবাবু ফিরলেন। কি একটা মিটিং ছিল। সেরে এলেন। বলে গেছিলেন এবং প্রথাসিদ্ধ অনুমতিও প্রার্থনা করেছিলেন। ছেলের ক্লাবে কি একটা বিরাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছে। তাই যাবার আগে প্রশান্ত বলেছিল, জ্যেঠু, কিছু মনে করবেন না। দুপুরের পরে আপনার সঙ্গে সময় কাটানো যাবে। সুপ্রিয়া নোটস-এর ধান্ধায় অনিচ্ছা-সত্ত্বেও কিছুটা সময় বাইরে গেছিল। সংসারের দাঁড়ে-হালে নয়নতারা আর আমি। কৃষ্ণার দুঃখ অশান্তির ঝোলা খুলে কার্যকারণের উকুন বাছতে বসে গেছি ওদেরই সুখ-শান্তির অঙ্গনে। ওরা যে যার দ্বিপ্রাহরিক কাজে কর্মে ব্যস্ত হয়ে গেল, আর আমি সেই ফাঁকে কিছু প্রহর কাটালাম তাপসদের সংসারে, ভাইয়ের হাত ধরে ধরে।

"আদর দিয়েছেন আর বিলাসের উপভোগে, ব্যসনের ভাসমান জীবনে বড় করে তুলেছেন বেয়াই," কৃষ্ণার শাশুড়ী বলেছিলেন, "একটু যদি সংসার মুখী করতেন তাহলে আমাদের যন্ত্রণাটা একটু কমত!" মেয়ের শ্বশুর বাড়ি বলে কথা। আমার ভাই একেবারে বোবা হয়ে গেছিল। শাশুড়ী ঠাকরুন আরও বলেছিলেন—সুযোগের পুরোপুরি সদ্ব্যবহারের মানসেই বোধহয়— "এতো আর আট দশ বছরের বালিকা ঘরে আনা যে ধীরে ধীরে শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে নেবো! এ যে একেবারে ঝুনো নারকেল, বেয়াই, পারলে আমাকেই দু'ছত্র শিখিয়ে দিতে পারে।" বলেই বিধেয় ঠিক রেখে উদ্দেশ্য পাল্টে যোগ করেছিলেন, "কর্তাকে তখন পৈ পৈ করে বারণ করেছিলাম, অতো লেখাপড়া জানা মেয়ে ঘরে আনতে হবে না। সংসার কি পাঠশালা না স্কুল

যে বিদ্যেধরী আনতে হবে ? তা, আমার কথায় কেউ কানই দিল না তখন—না ছেলে, না তার বাবা। ঠেলা সামলাতে আমার প্রাণ যায় অবস্থা।" বিষয় পাল্টানোর জন্যে যেন একটা প্যারাগ্রাফ ফাঁক দিলেন। অথবা, তাঁর কথাগুলো ঠিক ঠিক বিন্ধ করছে কিনা তা বুঝে নেবার জন্যে। বললেন, "নিয়ে যেতে এসেছেন নিয়ে যান। দরকার হলে দু'চারদিন বেশিও রাখতে পারেন। তবে একটু বুঝিয়ে-শুঝিয়ে মানুষ করে পাঠাবেন। আমার এই অনুরোধটা বেয়ানকেও বলবেন। এই বুড়ো বয়সে আর ঝি-এর কাজ ভালো লাগেনা আমার।"

মর্মের গোড়ায় বিক্ষত হয়েও বেয়াই মশাইয়ের পাশে বসে দু'টো কথা বলতে চেয়েছিলো মেয়ের বাবা। তিনি বলেছিলেন, "ছেলেমানুষ, বোঝে না। সব দিক সামলাতে এখনও শেখে নি। শিখে যাবে।" ভাই বুঝেছিল ভাষা আলাদা, সুর এক। বিন্ধ করার ক্ষমতা তাতে বিন্দু মাত্র কম বলে মনে হয়নি তবে রক্তক্ষরণ অনেক কম হয়েছিল।

বাবাজীবনের ঘাড় নিচু করে মেঝে-দৃষ্টি কথায় সম্মান দেখানোর প্রক্রিয়া ছিল না শ্বশুর মশাই-এর দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার বাসনা প্রকট ছিল তা নিয়ে আমার ভাই আর সময় নষ্ট করে নি। তাপস বলেছিল, "আমার মনে হয় কৃষ্ণার মনে অহংকার অত্যন্ত বেশি। শিক্ষার অহংকার, অর্থ-সম্পদের অহংকার এবং পারিবারিক অহংকার। তার পাশাপাশি ওর স্বাধীনতা-সচেতনতা প্রায়ই পীড়ার কারণ হয়ে থাকে, এবং আমাদের পীড়া দেয়। আত্মসম্মানবোধ যেন পুরুষদের চাইতেও বেশি। মুখে মুখে কথা বলে, যুক্তি-তর্কের পথ ধরে বিষয়কে সম্পর্কের বাইরে নিয়ে যেতে চায়। সংসার যে সত্যান্বেষণের লেবরেটরি নয়, জীবন যাপনের ক্ষেত্র তা কৃষ্ণাকে বোঝাতে পারি না। ওর আরও অনেক দুঃখ আছে কপালে। মায়ের কোনও কথাই শোনে না, এমন কি আমার কথারও বাধ্য নয়। আগে বাবাকে সম্মান করত, শ্রদ্ধা করত; এখন যেন আর তেমন পাত্তাই দিতে চায় না। আমার দিদি এলে এমন একখানা ভাব করে যেন—এই এলেন! একা এলে নাকি সে লংকা কান্ড বাধায়, সকলে মিলে এলে কিস্কিন্ধাকাণ্ড! তবেই বুঝুন!"

অনেক ভেবে চিন্তে আমার ভাই নরমতম কণ্ঠে একটি প্রশ্ন করেছিল তাপসকে। জানতে চেয়েছিল শত সহস্র দোষের বাইরে কৃষ্ণার কি কোনও গুণই নেই? বলেছিল, "তোমাদের পরিবারে এসে আমার মেয়ে কি শুধুই

দোষগুলোকেই প্রকাশ করল এতোদিন, একটি কোনও গুণই কি প্রকাশ করতে পারল না ?" তাপস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল, "না, তা কেন। গুণ আছে ভুল করে ক্ষমা চায়, ক্ষমা চাইতে ওর বিলম্ব হয় না। যখন ভাল থাকে তখন তো বেশ ভাল থাকে। কিন্তু মাকে ও সহ্য করতে পারে না। কাজ যা করে তা নিজের বলেই করে, মায়ের মন রাখতে করে না। জেদ প্রচণ্ড বেশি। না তো না, একেবারেই না। বড়দের মান-সম্মানের কোনও তোয়াক্কাই করে না। তা বার বার ক্ষমা চাইলে ক্ষমা ব্যাপারটাই কেমন অর্থহীন হয়ে পড়ে না ?"

দুপুরে খাবার ঘরে আসন করে ওরা গোল হয়ে খেতে বসল। নয়নতারার সংসারের একেবারে অন্দরমহলে হৃদয়ের তাপ, অন্তরের আনন্দ আর মনের সচল প্রবাহ টের পেলাম। অন্নপূর্ণার হাতের স্বাদ, লক্ষ্মীর শ্রী আর বাঙালীমনের খুনসুড়িপনার উচ্ছল প্রকাশে ওরা যেন সকলেই বেশ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। আমার অভিজ্ঞতার পোড় খাওয়া মনে একটাই প্রশ্ন বার বার উঁকি দিচ্ছিল ঃ প্রশান্তর হাত ধরে যখন একটি পুত্রবধূ আসবেন এই সংসারে তখন নয়নতারা কি করবে ? এই সুখ এই শান্তি এই ঘন নৈকট্য বজায় থাকবে তো ? নয়নতারা পারবে ? মনে মনে স্থির করে ফেললাম আবার আসব, এসে দেখে যাব, জেনে যাব।

'লোকে হার্টের ভয়ে পানদোষ থেকে দূরে থাকে শুনেছি আর…' বলতে বলতে একটা পান নিজের মুখে পুরে দিয়ে নয়নতারা আমার পাশে বসে বক্তব্য শেষ করল, 'আর তুমি শুনলাম দাঁতের ভয়ে পান-দোষ থেকে দূরে আছ ?' একটু 'পানের' লোভ সামলাতে না পেরে বললাম, 'পানে অনীহা আছে অবশ্যই কিন্তু 'পানে' নেই—তুমি পান চিবিয়ে যে রস পাচ্ছ তার চাইতে আমি 'পান' করে অনেক বেশি রস আহরণ করতে পারলাম !' একটা ঢোক চিপে নয়নতারা বলল, "তাহলে তোমারও 'পান'-দোষ আছে বল ?" বললাম, "না, সেক্ষেত্রে বলব, আমার পান-গুণ আছে। কারণ সাহিত্যে পানকে দোষ বলে নি গুণ, ভাষার গুণ বলে বলা হয়েছে।" নয়নতারা চোখ সরু করে বলল, "তোমার কাছে এই প্রথম হার স্বীকার করলাম।" বললাম, "তিনযুগ আগে হলে তোমার এই হারকে আমি কণ্ঠহার করে নিতাম।" "তাহলে তোমার একটা হিল্লে হয়ে যেতো নিশ্চয়ই কিন্তু বেচারি জ্যোতিষের কপালে নয়নতারার বদলে চোখে সর্ষে-ফুলের তারা ছিটকাতো। তা, সে কথা

থাক। এখন তুমি কৃষ্ণার কথায় চলে এসো।"

একটা সিগারেট ধরালাম। সময় নিয়ে প্রথম ধোঁয়াটুকু বেশ ধীরে ধীরে ছাড়তে ছাড়তে নিজেকে গুছিয়ে নিলাম। সবিস্তারে নয়নতারাকে কৃষ্ণা বিষয়ে তাপসের, তাপসের মা-বাবার এবং দিদির মনোভাবের রূপরেখার বর্ণনা দিলাম। মন দিয়ে শুনল। তার পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "দুই পক্ষই অপ্রস্তুত। সামাজিক ও আর্থিক ভাবে অবশ্যই যাবতীয় প্রস্তুতি ওরা নিয়েছেন কিন্তু মানসিক প্রস্তুতির ছিটে ফোঁটাও ওদের তালিকায় স্থান পায় নি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি দুই পক্ষই বিয়েটাকে একটা গেটপাস, একটা পাস-পোর্ট হিসেবে দেখেছে। একজীবন থেকে অন্যজীবনে প্রবেশের পাস-মাত্র করে দেখেছে। কৃষ্ণা। আবার তাপসও। একটা প্রাপ্তির জন্যে দক্ষিণান্ত করণই যে সব নয়, দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মনটিকেও যে তৈরি করতে হয় তা ওরা কেউই যথাযথ করে জেনে-বুঝে নেয় নি।"

মনে মনে নিশ্চয় হতে পারলাম না নয়নতারা কি প্রি-ম্যারেজ কাউনসেলিং-এর কথা বলতে চাইছে, না কি পোস্ট-ম্যারেজ এডজাস্টমেন্টের কথা তুলছে। তাই সহজ পথটাই নিলাম। বললাম, "তোমার কথা বুঝি নি।" একটু সামনে ঝুঁকে পট করে প্রশ্ন করল, "বোঝ নি না আমাকে দিয়ে ব্যাখ্যা করিয়ে নিতে চাও?" ধরা পড়ে গিয়ে ঝোপঝাড় না পিটিয়ে আত্মসমর্পণ করলাম। বললাম, "ঠিক তাই, আমি কোনদিনই তোমার সঙ্গে চালাকি করে পারি নি। আজও তাই চেষ্টা করে লাভ নেই। তুমিই বল।"

নয়নতারা অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বোধহয় নিজের বক্তব্য-কেই গুছিয়ে নিল। বলল, "কোত্থেকে শুরু করি বল তো? তোমাদের মতো জ্ঞানগম্যি নেই আমার, তবে এটুকু বুঝি যে জীবনের প্রত্যেকটি পর্বই একটা করে স্থির করা ক্যানভাসে নিজেকে মেলে ধরে, ফুটিয়ে তোলে, প্রকাশ করে। সেই ক্যানভাসটা আমরা নিজেরা তৈরি করি না, কেমন এক রকম করে স্বাভাবিক পেয়ে যাই। তোমাদের ভাষায় একেই বোধহয় পূর্বস্বীকার না কি যেন বলে। সুপ্রিয়া একদিন বলেছিল একেই না কি বিজ্ঞানে কনস্ট্রাকট বলে বলে, প্রি-সাপোজিশন।" আমি অবাক হয়ে নয়নতারার মুখে বৈদগ্ধের আলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ছেলে মেয়েরা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো করলেই যে তাদের মুখের আলো মা বাবার মুখে প্রতিফলিত হবে এমন কথা নেই। মনে যদি আগ্রহ থাকে আর সম্পর্কে

যদি প্রার্থিত নৈকট্য থাকে তা হলে বিদ্যার প্রবাহটির কিছু কিছু বোধহয় সাইফোনড হতে পারে, জ্ঞানের আলোর বিচ্ছুরণ অপরের মনেও বোধহয় উন্নত চেতনার আভা মেখে দিতে পারে। নয়নতারা বোধ হয় পরের বক্তব্য স্থির করছিল, আর আমি নয়নতারাকে নিয়েই ভাবছিলাম। কখন যে জ্যোতিষ বাবু এসে গেছেন তা টেরই পাই নি। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন "কি হল? একেবারে চুপ চাপ কেন? আমি যোগ দিলে গোলমাল বা ভিড় বাড়বে না তো?"

প্রথমটায় ভাবনায় নাড়া লাগল। তার পরেই বলে উঠলাম, "আমরা গুনগুন করে গান ভাজছি না যে একজনেই সুবিধা হবে। না আমরা কোনও পাঠ অনুশীলনে ব্যস্ত যে 'দুয়ে পাঠ'-সার্থক হয়ে উঠবে। সুতরাং ছড়ার অবশিষ্ট অংশও অপ্রযোজ্য—তিনে গোলমাল এবং চারে হাট—প্রযুক্ত হবার মতো বাতাবরণই নেই! আপনি সচ্ছন্দে বসতে পারেন এবং অংশ গ্রহণও করতে পারেন।" জ্যোতিষ বাবু একবার নয়নতারাকে চোখে একটু দেখে নিয়ে বললেন, "আমি তো শ্রোতা এবং দ্রষ্টা হিসেবে সংসারের সর্ববিষয়েই সহযোগিতা করে থাকি। তাতেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। নয়ন তার নক্ষত্রসুলভ তেজ ও দীপ্তিকে সচেতনে দূরে রেখে আমার জীবনে নিজের শান্ত আলোটুকুকে দান করেছে। তাতেই আমার সুখের অন্ত নেই। আপনি জেনে আনন্দ পাবেন যে আমার ছেলেমেয়েরাও এখন আমার সঙ্গে একমত।"

নয়নতারার মন যে বিষয় থেকে সরে যায় নি তা বুঝতে দেরি হল না। বলল, "তোমার ওই বাতাবরণ কথাটিই বোধহয় আমি খুঁজছিলাম। যে বাতাবরণে আমরা শৈশব বাল্য কাটিয়েছি তাতে উত্তর বিবাহ বাতাবরণের অনেক ছবি অত্যন্ত সহজে ফুটে ওঠার অবকাশ ছিল, অতীত আর ভবিষ্যৎ জীবনের মধ্যে একটা যোগসূত্র যেন যৌথ পরিবারের লেনদেনের মধ্যে স্বাভাবিক অঙ্কুরিত পল্লবিত-মঞ্জুরিত হবার সুযোগ পেয়ে যেতো। পুতুলের সংসার থেকে মায়ের সংসার আর সেখান থেকে শাশুড়ি-স্বামীর সংসার যেন একটা প্রবাহেরই এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত বলে মনে হত। আজকাল সেই বাতাবরণই নেই। এখন ছেলে-মেয়েরা, বিশেষ করে মেয়েরা, মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত সমাজে, সংসারী হয়ে গড়ে না উঠে ব্যক্তি হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে। এখন গৃহের চাইতে স্কুলের প্রতি টান থাকে বেশি, খেলার পুতুলের পরিবর্তে পাঠ্য-বিষয়ে মন দেবার দায় অনেক বেড়ে গেছে। এখন সংসারের

খবরের চাইতে দেশে, দেশের বাইরে বিদেশের খবর মনকে বেশি আকর্ষণ করে। একদিকে ব্যক্তিত্বের গঠন একটা স্বাধীন চেতনার ক্রম উন্মেষে নারীপুরুষের চারদিকে আত্ম-সচেতনতার গণ্ডি টেনে প্রত্যেককেই স্বার্থের সুতোয় একা-একা করে তুলছে, অন্যদিকে নারী-পুরুষ সমকক্ষতার বোধকে শিক্ষা এবং জীবনসংগ্রামের তাপে প্রতিনিয়ত উত্তপ্ত করে তুলছে। এই প্রক্রিয়ায় যা মার খাচ্ছে তা সংসারের সুখ-শান্তি।"

নির্বাক কিন্তু মনোযোগী দুই ছাত্র পেয়ে নয়নতারা হয়তো আরও কিছু বলত কিন্তু পরিষ্কার বুঝে নেবার তাগিদে আমি বাধা দিলাম। প্রশ্ন করলাম, "লেখাপড়া শেখা, বিশ্বচেতনা, স্বাধীনতা বোধ এবং আত্মসচেতনতা—এসব কি তাহলে মেয়েদের জন্যে অনাকাঙ্ক্ষিত গুণ বা প্রাপ্তি? সেকেলে হয়ে ঠাকুমা দিদিমাদের মতো সংসারের ঘানি টানাই কি মেয়েদের ব্রহ্ম প্রাপ্তি?" আমার প্রশ্নের মাঝখানেই জ্যোতিষ বাবু কিছু একটা বলতে গেলেন, বোধহয় আমাকেই। তা, নয়নতারা তাঁকে মুখ খুলতে দিল না। বলল, "না, একেবারেই না। অর্জন যোগ্য কোনও গুণই কারো একার অধিকারে থাকে না—সকলের অধিকারই সমান। বিশেষ করে যে যে গুণ মানুষের অন্তরের সম্পদকে বাড়িয়ে তোলে, দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে মনোভাবের পরিশীলন ঘটায় তা সমান ভাবেই সকলের জন্যে কাম্য। প্রশ্ন অর্জনের নয়, সেই অর্জিত গুণসমূহের প্রয়োগের ক্ষেত্রে, ব্যবহারের উদ্দেশ্যের মধ্যেই খুঁজতে হয়। তাছাড়া এই ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে বলে কোনও প্রভেদ রেখা টেনে দেওয়াটা অশ্রদ্ধেয়ই নয়, অমানবিকও বটে।"

নয়নতারা থেমে গেল। আমি আমার অনুভবকে গুছিয়ে তুলতে সময় নিচ্ছিলাম। একটা কোনও বৈপরীত্যের অনুভব। সেই ফাঁকে যেন অতি সন্তর্পণে পা ফেলে প্রবেশ করার মতো করে জ্যোতিষ বাবু বললেন, "দেখ নয়ন, তোমাকে আজ আমার বেশি জটিল বলে মনে হচ্ছে। একবার বললে অতীতের বাতাবরণটাই ছিল সরল জীবন প্রবাহের অনুকূল, এক জীবন স্বাভাবিক অন্যজীবনের পাড়ের বাঁধনে গতি পেয়ে যেতো। একটা প্রস্তুতি পর্বই যেন প্রতিনিয়ত প্রাপ্তিতে আর সেই সদ্যপ্রাপ্তকেই পরবর্তী ধাপের প্রস্তুতিতে মিশিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতো। আবার বললে বর্তমানের ব্যক্তি চেতনা, স্বাধীনতা বোধ এবং সংসারকে ছাড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার বাসনা স্বাভাবিক এবং প্রার্থিতও। তাহলে তখন সুখশান্তি ছিল এখন নেই কেন?"

আমি জ্যোতিষ বাবুকে বলতে গেলাম যে তিনি না জেনেও আমার মূল প্রশ্নের ঠিকানা পেয়ে গেছেন—সংসারের সুখ-শান্তির অভাবের প্রশ্নের—তা, সে কথা আমার বলা হল না। বলা হল না কারণ নয়নতারা তার দুহাত জোড় করে বলে বসল, "দোহাই তোমার তপু আজ প্রথম দেখছি জ্যোতিষ অনেক কথা বলতে পারে এবং বলছেও, আর তার চাইতেও বড় কথা আমি যে জটিল কথা বলতে পারি তা ও নিজ মুখে এবং আমার চোখে তুলে ধরেছে। তাই তুমি নয়, আমিই আমার কথা বলতে চাই।"

বিষয়টি দাম্পত্য চাপানউতোরের বাইরেই ছিল এবং আলোচনার সুবিধার জন্যে তেমনই থাকা বিধেয়। কিন্তু বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ওদের দু'জনের এই বিষয় ছাড়িয়ে আশয়ে—নিজনিজ অন্তবের ঊর্মিমালায়—জড়িয়ে যাওয়াটা আমার বেশ ভাল লাগল। ভাল লাগল কারণ বিষয় মাথা ছেড়ে অন্তরের ছোট ছোট ছোঁয়ায় অতঃপর তিরতির চলতেই থাকবে বলে মনে হল।

নয়নতারা বলল, "আসলে বিপরীত নয় সেই জীবন আর এই জীবন—ওরা স্বতন্ত্র বাতাবরণে, আলাদা ক্যানভাসে ফুটে ওঠা একই জীবন। একই বলা বোধহয় ঠিক হল না, একই জীবনের পরিবর্তিত ছবি কারণ প্রেক্ষিত পরিবর্তিত।" জ্যোতিষ বাবু বললেন, "বুঝলাম না", আমিও বললাম, "বুঝি নি"।

নয়নতারা এবার, এই অনেকক্ষণ একনাগাড়ে গম্ভীর থাকার পর প্রথমবার তার চোখে ঝিলিক তুলে বলল, "শ্রোতারা যখন বক্তার প্রাসঙ্গিক কথা বোঝে না, বুঝতে পারছে না বলে জানায়, তখন বুঝতে হবে হয় তারা নির্বোধ, নয় অতিশয় বুদ্ধিমান, চালাক। তোমরা কোন দলের?" জ্যোতিষ বাবু তৎক্ষনাৎ জানালেন যে তিনি নির্বোধের দলে; আমি বললাম "অতিশয় চালাকের দলে!" বিন্দুমাত্র হতচকিত না হয়ে নয়নতারা হাঁক দিয়ে বলে উঠলো, "অমি, ওদের জন্যে বেশ কড়া করে চা করে আনবে। সিগারেটের তাপে ওদের নিরেট মাথার ঘিলু গলবে না, উষ্ণ চা-হলে যদি গলে।" বলেই উঠে গেল। যেতে যেতে বলে গেল, "সিগারেট ধরিয়ে নিজেদের বুদ্ধি মতো বিষয়ে ঢুকে পড়, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।"

সেদিনের বিকেলের আসর সমাপ্তি সঙ্গীতের দিকে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে গেল। জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে অতীত বর্তমান নিয়ে কথা বলতে বলতে প্রশান্ত এলো, সুপ্রিয়া অবকাশের অভাবের অনুযোগ দায়ের করে গেল, অমিয়া চা

নিয়ে এলো, ভবিষ্যতের দু'চার টুকরো কথা ভবিষ্যতদের নিয়ে নাড়াচাড়া হল। তার পরে একসময়ে পূর্ণদিনের সংগ্রহ ঝোলায় ভরে ফিরে এলাম নিজের শূন্য জীবনের আগোছালো গৃহে।

ফিরে এলাম কিন্তু নয়নতারার শেষ কথাগুলো আমাকে অন্য কোনও বিষয়ে ফিরতে দিল না। নয়নতারা কি পূর্বস্বীকার বা কনস্ট্রাকট বলতে পুরুষ শাসিত, পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থার কথা বলেছিল? আর বাতাবরণ? যৌথপরিবারের বহুর পটভূমিতে যে একক পরিবার আর একক পরিবারের ঘেরাটোপে যে যৌথ জীবন তার মূলে কি একই মেনে নেওয়া, মেনে চলার কথা বলতে চেয়েছিল, একই স্বপ্ন একই লালন-পালন একই দুঃখ-বেদনা আনন্দ আহ্লাদের টানা-পোড়েন বিষয়ে ইঙ্গিত করতে চেয়েছিল তাহলে ব্যক্তি চেতনা স্বাধীনতা স্পৃহা, আত্মসম্মানবোধ অথবা বাইরের টান? নয়নতারা বোধহয় বলতে চেয়েছে এ-সবই ছিল এবং এখনও আছে। ভিন্ন বাতাবরণে বলে আমরা সেই সব ঠাকুমা-দিদিমা জীবনের ব্যক্তি চেতনাকে, স্বাধীনতাবোধ ইত্যাদিকে বর্তমান জীবনের কুঙ্কা দীপাদের সেই বোধ থেকে আলাদা করে দেখি, নিম্ন-মানের মনে করি। তাহলে কি তফাৎ শুধু বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যয়ন পত্রের অভাবে আর যোগানেই উৎসারিত? অতীতের গৃহিনীরা তাদের সকল বোধ-বুদ্ধি-অর্জনকে সংসারের সুখে নিয়োজিত করে দিত— সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে—লিখে ঘরের দেওয়ালে এবং মনের দেয়ালে টানটান ঝুলিয়ে রাখত। 'সাবসার্ভিয়েন্স'? আর বর্তমানের স্ত্রীরা তাদের সার্টিফিকেট সমৃদ্ধ যাবতীয় বোধ-বুদ্ধি-অর্জনকে নিজ অঙ্গের পারিপাট্য বাড়াতে স্ব স্ব ব্যক্তিত্বের সামনে পিছনে লটকে রাখতে চায়?

একা একা এই সব বিষয় ভাবতে ভাবতে মনে হল নয়নতারার সঙ্গে আমার আরও কথা বলা দরকার। মনে হল যতো কথা ও বলেছে তার চাইতে অনেক বেশি না-বলা রেখেছে। দারিদ্র পীড়িত অথবা সম্পদ লালিত—সকল মেয়েরাই তো শ্বশুর ঘরে পিছনের দারিদ্রকে এবং সম্পন্নতাকে একইভাবে জীর্ণ বসনের মতো ছেড়ে চলে গেছে সেই অতীত দিনে। দু'চারটি যে অন্যথা হয় নি তা নয়। কিন্তু ব্যতিক্রম অত্যল্প হলে তা নিয়মকে প্রতিষ্ঠাই করে মাত্র। আজকাল সেই দারিদ্র স্বামীগৃহে লাঞ্ছনার কারণ, সেই সম্পন্নতাও জীর্ণবস্ত্র হয়ে পিছনে না থেকে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধেয়ে যায় তপ্ত উজ্জ্বল স্মরণের আঘাত হয়ে স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়িকে ধরাশায়ী করতে। বোধ বুদ্ধি অর্জন এখন।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেভিংস এ্যাকাউণ্টে সেলফ-সার্ভিয়েন্ট! স্বাধীনতা বোধ যদি অপরের স্বাধীনতাকে পীড়িত করতে চায় তাহলে সে লক্ষ্য হতে পারে না, সে উপায় মাত্র। জীবনের বা সংসারের প্রেয়কে লাভ করার জন্যে, আমাদের স্বাধীনতা চাই। ইনস্ট্রুমেন্টাল। এ-কথাটা অতীত দিনে জানা ছিল আর এখন বিস্মৃত? তাই কি?

কৃষ্ণা কি তবে সুখশান্তি চায়নি? সে চেয়েছিল স্বাধীনতা, সম্পন্নতা, ভোগের অঢেল যোগান? গন্তব্যকে ভুলে গিয়ে সে কি পথকেই প্রধান করে তুলেছিল? একেই কি নয়নতারা প্রস্তুতিহীনতা বলে বলেছিল? তাহলে তাপস? তাপসের মা? তাদের প্রস্তুতির অভাব বলতে কি বলতে চেয়েছিল নয়নতারা? অনেক ভাবনার ধারা একে একে মনের মূল প্রশ্নপ্রবাহে এসে মিশে যেতে লাগল। কোনও উত্তরটাই মনের মতো হল না। নয়নতারার চোখটা স্মরণে আনার চেষ্টা করলাম। সেই চোখজোড়া চকচক করে ভেসে উঠতেই যেন উত্তরটাও পেয়ে গেলাম। সেই চোখে নয়নতারা যেন বলে উঠল, "এই সহজ কথাটাই বুঝতে এতো কষ্ট পেলে? কৃষ্ণারা তো এখন মা-বাবার সংসারে অনেক অনেক বেশি দিন ধরে লালিত পালিত হয়। শত শত মূলে আর সহস্র ধারায় তাদের জীবনে পত্র-পল্লব-পুষ্প শোভার স্ফুরণ ঘটে। তখন তাদের তুলে নিয়ে আসে কোনও স্বামী এক লহমার মন্ত্র-উচ্চারণে। আশৈশব পরিচিত মাটি-জল-বাতাস আর প্রাণের বাতাবরণটি এক নিমেষে হারিয়ে যাওয়া এই সব উৎপাটিত জীবন যে যত্ন, লালনপালন আর সেচন অপেক্ষা করে, প্রত্যাশা করে তা ক'জন স্বামী, শ্বশুর শাশুড়ি মনের গভীর থেকে উপলব্ধি করে থাকেন? এদের, এই কৃষ্ণাদের বর্তমানটা একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণে নিজের বলে মনে হয়, আর সবই অধরা অপ্রাপ্য থেকে যায়—কিন্তু উত্তেজিত বর্তমানের তাড়নায় অনুত্তেজক বিরস দীর্ঘ বর্তমানকে হারাতে বসে। আবার সুদীর্ঘ অতীত আজীবনের সংগ্রহ হয়ে মনের মণি-কোঠায় প্রোজ্জ্বল থাকে বলে ভবিষ্যতের অন্ধকার গাঢ়তর বলে মনে করতে থাকে। যে গৃহের অঙ্গনে এই সমূল উৎপাটিত জীবনটি প্রোথিত হল সেই গৃহের স্বজন-পরিজনেরা তাৎক্ষণিক ফলপ্রাপ্তির বাসনায় এই সদ্য ট্রানস-প্লানটেড জীবনকে বার বার ঝাঁকুনি দিতে থাকেন। নুয়ে পড়া, নেতিয়ে পড়া এই নবজীবন আশানুরূপ ফল ভূমিষ্ঠ করতে পারে না—মানসিকভাবে তা সম্ভব নয় বলেই—প্রতিনিয়ত সমালোচিত, তিরস্কৃত ধিক্কৃত হতে থাকে।

পোষণ না করেই শোষণের আগ্রহ, লালন না করেই কৃষ্ণাদের কাজের জন্যে লালায়িত হওয়া আর সেচনে প্রাণবন্ত না করে তুলে শোধনের প্রাবল্যে শীর্ণ শুষ্ক একটি জীবন নড়ে চড়ে বেড়াতে দেখেন নিজ নিজ গৃহাঙ্গনে। রাগ গিয়ে পড়ে মেয়ের মায়ের অশিক্ষা-কুশিক্ষার উপর, তার বাবার আদর-স্নেহের আধিক্যের ঘাড়ে। শাশুড়ির কপালের কুঞ্চন সংসারের কপাল ফিরাতে বাধা দেয়, কৃষ্ণাদের মনে আত্মাভিমানের আগুন দাউ দাউ জ্বলে ওঠে। অর্জন সমূহ তখন আর সাব সার্ভিয়েন্ট না থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার কেতনে পত পত করে উড্ডীন হয়ে পড়ে।

ভাবনায় ছেদ পড়ল। মনে হল এসব কথা এত জটিল হবার কথা নয়। এ বোধহয় আমার কথা, নয়নতারার নয়। সে বললে অন্যরকম হত। তার মুখে কঠিন কথাও সহজ হয়ে ধরা দেয়। আমাদের বেলায় সহজ কথাটাও কেমন যেন কঠিন হয়ে প্রকাশ পেয়ে যায়। তাই ঠিক করলাম, মনে মনেই ঠিক করলাম, নয়নতারার কথা নয়নতারার মুখেই শুনে নিতে হবে। জেনে নিতে হবে কৃষ্ণা যে বলেছিল পুরুষরা স্বামী হতে পারে না, মালিক হয়ে যায়—সে কথাটার কতোটা ঠিক। কৃষ্ণা আরও অনেক অনেক কথা বলেছিল। সে সবের কতোটা সত্য আর কতোটা তার আবেগের তাড়নায় আক্রমণের প্রকাশ তা বুঝে নিতে হবে। কৃষ্ণা বলেছিল, "জান, জ্যেঠুমণি, আমরা ধীরে ধীরে ব্যক্তি হয়ে গড়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ বিয়ের পরেই লোফালুফির পুতুল হয়ে সানাইয়ের সুর ফুলের গন্ধ আর নতুন শাড়ির সুবাস মিলিয়ে যাবার আগেই ব্যক্তিত্ব বিসর্জনের বাদ্য শুনতে পাই। রাত্রে আমরা প্রক্ষিপ্ত, ব্যবহারের সাগ্রহ সামগ্রী; দিনেও আমরা প্রক্ষিপ্ত, রাতের নৈকট্য থেকে নির্বাসিত হয়ে ভেসে বেড়াই সংসারের বহুজনের বিপরীত বিরুদ্ধ প্রত্যাশার বিক্ষুব্ধ সাগরে। রাতের 'বন্ধু'-কে দিনে চেনা যায় না: দিনের বহু প্রত্যাশার অসামঞ্জস্যকে পরিজনদের দেখিয়ে দেওয়া যায় না। সংসারের স্টেজে আমরা সর্বক্ষণই ফোকাসে থাকি, আমাদের স্ক্যানিং হতে থাকে, এক্স-রে ভিশনের লেনসে প্রতিনিয়ত দেখে দেখে আমাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দেহ-মনের নড়াচড়ার গ্রাফ তৈরি হতে থাকে। দর্শকরূপ স্বামী-শ্বশুর-শাশুড়ি এবং আত্মীয়স্বজনদের দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা এবং প্রকৃতি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। একটা অস্বস্তির বাতাবরণে প্রতিমুহূর্তের জীবন কাটে। একটা রিলিফ-হীন বিড়ম্বনা। তখন কি সে অন্ধ বেগে ছুটে যেতে চাইবে না সেই তার মুক্ত জীবনে? তার

ফেলে আসা আজন্মপরিচিত বাপের বাড়ির রিলিফ-এ ? এবং এখানেই কি সংঘর্ষের বীজটি উপ্ত হয়ে যাবে না ?”

কৃষ্ণার মনের এই সব কষ্টের কথা নয়নতারাকে বলা হয় নি। নয়নতারা বলেছিল বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা থাকলে সুখ আর শান্তি পাওয়া যায়। জেনে নেওয়া হয় নি এই বিশ্বাস কাকে কখন কিভাবে করা হবে এই নির্ভর-শীলতাই বা লালন-পালন সেচন-সমৃদ্ধি পাবে কোন মন্ত্রে। বুঝে নিতে পারিনি এই বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা কি একমুখী না দ্বিমুখী। সব ছেড়ে ছুড়ে যে যায়, যে দীর্ঘজীবন পিছনে ফেলে অজ্ঞাত অপরিচিত অস্পষ্ট এক অন্য সংসারে চলে যায় নিজের সমস্ত ভবিষ্যতকে সন্তর্পণে আঁচলে বেঁধে সে তো নির্ভর করেই যায়, সে তো বিশ্বাসকে একাগ্র করেই যায়। তাহলে তো বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতার স্রোতমুখটি প্রথম থেকেই নিম্নমুখী, একমুখী, নববধূ মুখী হাওয়ার কথা। কারণ যা আছে তা থাকা উচিত বলে ঘোষণা করার মধ্যে স্ববিরোধ থাকে। যা নেই, কিন্তু থাকার কথা সেই বিষয়েই বলতে পারি যে তা থাকা উচিত। এ-কথা মনে হতেই ভাবলাম—তাহলে কি কৃষ্ণাদের যাবতীয় দুঃখকষ্টের উৎস এই প্রাথমিক বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতার অভাব থেকে উৎসারিত ? যে মেয়েকে যোগ্য বলে ঘরে আনা হয়েছে তাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করা হচ্ছেনা ? তার উপর সর্বথা নির্ভর করা যাচ্ছেনা ?

ভাবতে গিয়ে আমার সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল। বেশ বুঝে গেলাম যে অলস মাথায় শান্তি বাসা বাঁধে সহজে। সেই আমার শান্তির নীড়কে অকারণে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেই আমার এই হাল হয়েছে। শান্তি পাচ্ছিনা। তখনই আবার কৃষ্ণার কথা মনে হল। কৃষ্ণা বলেছিল, “যোগ্য হয়ে কি কেউ জন্মায় ? তুমিই বল জ্যেঠুমণি, যোগ্যতা তো একটা গুণ যা যতো বেশি স্বীকৃতি পায় ততো বেশি বেড়ে উঠতে পারে। ‘তুমি অযোগ্য, কোনও কাজেরই নও, তোমার দ্বারা কিছুই হবে না’—এমতো নেতিবাচক বাতাবরণে যোগ্যতার মতো ইতিবাচক অনুশীলনযোগ্য গুণ কি অংকুরিত পল্লবিত হবার সুযোগ পায় ? আর যদি এর বিপরীত বাতাবরণটি থাকে, যদি জানা যায় ‘তুমি যথেষ্ট যোগ্য, তুমি আরও ভাল করে করার ক্ষমতা রাখ’ তাহলে পংগু হয়তো গিরি লংঘন করতে পারে, অন্ধেরও দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে। বিশ্বাসের আকাশটা পেলে, নির্ভরশীলতার মানসিক পটভূমিটি পেলে আমাদের চেতনার কিশলয়ে সহজে বেড়ে ওঠার দাক্ষিণে

বাতাস দোলা দেবে কিনা বল ? বিশ্বাস পেলে বিশ্বাসী হয়ে ওঠাটা সহজতর হয় কিনা তুমিই বল, বল যদি অপরে আমার উপর নির্ভর করে তাহলে আমি আরও বেশি নির্ভরশীল হয়ে উঠতে চাইব কিনা ? তুমিই বল, জ্যেঠুমণি।"

কৃষ্ণার কথা আমাকে অভিভূত করেছিল। মনে হয়েছিল ওর কথাগুলো বর্ণে বর্ণে ঠিক। কিন্তু তাহলে যা ঠিক তা হয়না কেন ? এই কেনর উত্তর কে দেবে আমাকে ? নিজে আমি যথেষ্ট ভাবতে পারি না। আর যেটুকু ভাবি তা যে ঠিক না বেঠিক তা ঠাহর করতে পারি না। তাই কৃষ্ণাকেই প্রশ্ন করেছিলাম, "তা, তোমার কি মনে হয় ? এই যে তোমরা আঁচলে করে অগাধ বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা নিয়ে শ্বশুর ঘর করতে স্বামীর হাত ধরে পৌঁছেও তো, সেখানে সেই বিশ্বাসের আর নির্ভরশীলতার বীজ কেন আরও বিশ্বাসের সবুজশ্যামল শস্যকে বাড়িয়ে তোলে না ?" প্রশ্নটি করতে পেরেই যেন আমার মনের পীড়া অনেকটাই লাঘব হয়ে গেল। বোধহয় এমনই হয়। উত্তর দেবার দায় যখন মনকে উতলা ক'রে তোলে তখনই সেই দায় অপরের স্কন্ধে চাপিয়ে দিতে পারলে উত্তরটা অন্বেষণের কষ্টটা যেমন কমে দায়মুক্ত মনটাও তেমন হালকা বোধ করে।

ভেবে ভেবে কৃষ্ণা বলেছিল, "এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই। তবে মনে হয় প্রথম তো বৌদের মেয়ে বলে বলা হলেও মেয়ে হিসেবে দেখা হয় না। দেখা হয় বহিরাগত আগন্তুক, অন্যতর শিক্ষাদীক্ষা কৃষ্টি সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে। একটা বিভেদ রেখা অজান্তেই টানা হয়ে থাকে। তাছাড়া আছে, আগেই বলেছি, প্রত্যাশার বৈপরীত্য-বিরুদ্ধতা। প্রত্যাশার উৎসমুখে সামঞ্জস্য কেউ খুঁজতে বসে না, কিন্তু প্রত্যাশা-পূরণের ক্ষতবিক্ষত প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বদাই অনুসন্ধান চলে অসামঞ্জস্যের, অক্ষমতার, অযোগ্যতার। কিন্তু সব থেকে মারাত্মক বলে যা মনে হয় তা বোধহয় নারী সম্পর্কে পুরুষের সতীত্ব-ধারণা, ধারণা না বলে আকাঙ্খা বা চাহিদা বলাই সমীচীন।" আমি বললাম, "তোমার এই শেষ কথাটা তো বুঝলাম না।"

একটু থেমে বোধহয় ভেবে নিয়ে কৃষ্ণা বলল, "না-বোঝার মতো তো কিছু নেই। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সামাজিক ব্যবস্থা নারীপুরুষের মনকে একটা বিশ্বাসের গঠন দিয়ে থাকে। সেই বিশ্বাসটা শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো সহজ-স্বাভাবিক গ্রহণ করেই আমরা বড় হই, বেড়ে উঠি। পুরুষমাত্রই রত্ন, শক্তির প্রতিভূ, নারী মাত্রই ভোগ্য অস্তিত্ব, পরাধীনতার প্রকৃতি। আশৈশব

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই বিশ্বাসের বাতাবরণে অনেক স্বীকার বা ধারণা অনিবার্য হয়ে সমাজ চেতনায় এবং ব্যক্তি মনে দৃঢ়মূল। শরীর মনের পবিত্রতা আর সতীত্ব তাই নারীর কাছে শর্তহীন প্রত্যাশা, পুরুষের কাছে নয়।" বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হয়ত ভাবছিলাম—উপলব্ধির আর বিশ্লেষণের এই ক্ষমতা নিয়ে শ্বশুর বাড়িতে মধ্যবিত্ত মনের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণার পক্ষে আগুন জ্বালানো হয়তো বা সম্ভব, আলো কি সে দিতে পারে? হঠাৎই কৃষ্ণার তীক্ষ্ন দৃষ্টি আমার দিকে স্থির ধরা আছে বুঝতে পেরে বললাম, "তা সেই সমাজতত্ত্বের সত্য পারিবারিক জীবনে কিভাবে প্রভাব ফেলছে তা তো বললে না?"

কৃষ্ণা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "আমি অনুভব করেছি, অনুভব থেকে অনুমান করেছি। আমার স্বামী কলকাতায় থেকে, হোস্টেলে থেকে, স্নাতক হয়েছে। তার পরেও দীর্ঘ দিন কলকাতার জলহাওয়ায় নিজের যৌবনকালকে পুষ্ট করেছে। নিজেকে আধুনিক বলে মনে করে। সেকথা বলেও প্রকাশ করে। কিন্তু নানা ভাবে আমার তরুণী জীবনের—স্কুলের এবং কলেজের জীবনের বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহে আগ্রহ দেখায়। আমি তার বর্তমানকে জানতে চাই, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা বিষয়ে আগ্রহ দেখাই; তাপস কিন্তু আমার অতীত জীবনের চাল থেকে সম্ভাব্য কাঁকড়ের অন্বেষণে অধিকতর মনোযোগ দেখায়। এই যে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, এটা কেন হয়?" আমি সন্তর্পণে বলে উঠি, "তা, তোমার অনুমানে, অনুভবেও তো ভুল হতে পারে। বর্তমানকে জানতে সেই বর্তমানের ইতিহাসটুকু তো কম জরুরী নয়। সঠিক চেনা জানার জন্যে কি তাপস তোমার অতীত জানতে চাইবে না? চাইতে পারে না?

একচিলতে হাসি ঠোঁটের প্রান্তে ভাসিয়ে রেখে কৃষ্ণা বলেছিল, "তোমাদের সমাজ আমাদের সব দিক থেকেই মেরে রেখেছে, কিন্তু আমাদের প্রকৃতি আমাদের জন্যে কিছু রক্ষাকবজের ব্যবস্থা করতে ভোলেননি। অনেক আগে থেকেই যেমন আমরা যৌন জীবন বিষয়ে অবহিত হতে পারি ঠিক তেমনি অনেক আগে থেকেই আমরা চোখের দৃষ্টি, প্রশ্নের অন্তর আর পুরুষের উদ্দেশ্য টের পেয়ে যাই। সেই প্রত্যক্ষ যে কি, কোন্ 'রাডারে' ধরা পড়ে তা তোমাদের বোঝাতে পারব না, বোঝাতে পারব না কারণ সেই প্রত্যক্ষ তোমাদের অন্তরে প্রকৃতি দেন নি, সেই রাডার তোমাদের কাজে লাগে না বলে

নেইও তোমাদের।" বলেছিলাম, "তোমার অনুভবের সত্যমিথ্যা নিয়ে কথা বলব না, তোমার অনুমানের যাথার্থ্য নিয়েও নয়, তবে এটা অবশ্যই বলব যে যদি তাপসের অনুসন্ধানে বা প্রশ্নে তোমার মনে সন্দেহ জেগে থাকে তাহলে বিশ্বাস ব্যাপারটা প্রথমেই মার খেয়ে যায়। বিশ্বাস মার খেয়ে যায় আর নির্ভরশীলতার ক্ষেত্রটিও ঊষর পড়ে থাকে।"

কৃষ্ণা বলেছিল, "তাহলে তুমিই বল জ্যেঠুমণি, যার হাত ধরে আমরা শ্বশুর বাড়ি যাই সেই আমাদের প্রধান অবলম্বনই যদি তথ্য-দৃষ্টি হতে গিয়ে সত্য-দৃষ্টি হারায়, অতীত অন্বেষণ করতে গিয়ে যদি বর্তমানকে বিসর্জন দেয় আর মা-বাবার মন রাখতে গিয়ে স্ত্রীকে সংসারের বেদিমূলে বলি দিতে উদ্যত হয় তাহলে সমঝোতা আর সামঞ্জস্য কি একেবারেই একপক্ষের দায় হয়ে দাঁড়ায় না?"

যেদিন আমি এই সব কথা কৃষ্ণার কাছে শুনেছিলাম সেদিন ওর জন্যে কষ্ট বোধ করেছিলাম। দুঃখ পেয়েছিলাম ওদের কথা ভেবে—এই সব শিক্ষিত বোধবুদ্ধির অধিকারী মেয়েদের কথা ভেবে। আর আজ আমার কষ্ট হতে লাগল আমার নিজের জন্যে। ভাবতে গিয়েই ভাবনায় পড়ে গেলাম। নয়নতারার সঙ্গে দেখা হাওয়াটাই আমায় যেন কেমন গোলমালে ফেলে দিয়েছে। অলস জীবনের নিস্তরঙ্গ জলে জীবনের নানান ছবি পড়ছিল কিন্তু কোনও আলোড়ন তৈরি করছিল না। ছবিগুলো তাৎক্ষণিক চেতনায় সুখদুঃখের ঊর্মি তুলেই আবার বেশ সহজেই মিলিয়ে যাচ্ছিল। এখন কেমন যেন প্রশ্নের ঢেউ হয়ে হয়ে মনের কূলে ছলাৎ ছলাৎ আঘাত করে চলেছে। উত্তরের জন্যে যেন মাথা কুটে কুটে মরছে।

বাধ্য হয়েই নয়নতারাকে একটা চিঠি লিখে সব জানালাম। কৃষ্ণার কথা, আমার কথা এবং আরও কিছু বেদনার কথা লিখে ওর মতামত জানতে চাইলাম। কিন্তু নয়নতারার মতামতের বদলে একদিন বিকেলে জ্যোতিষবাবু এসে হাজির হলেন। বললেন, "পেয়াদা এসেছে শমন নিয়ে। ডাক পড়েছে আপনার।" জ্যোতিষবাবুকে দেখে বেশ অবাক হয়ে ছিলাম। ঘোর কাটিয়ে একটু মজা করতেই বলেছিলাম, "আশা করে বসেছিলাম ডাকের চিঠি আসবে, এলো শুধুই ডাক! শয়নে স্বপনে যখন শিয়রে শমনের সময় আর বেশি দূরে নেই তখন এলো নয়নতারার শমন? একেই বলে ভাগ্য মশাই ভাগ্য!" জ্যোতিষবাবু কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন,

"ভাগ্য কিনা জানি না, তবে এটা জানি যে তিনযুগ পরে কৈশোরে উপ্ত বীজ দীর্ঘ হাইবারনেশনে ঘাপটি মেরে থাকার পর যে এমন চিকনসবুজ পাতা ছাড়তে পারে তা আপনাদের না দেখলে বিশ্বাসই হত না!" চোখদুটো দিয়ে স্থান নির্দেশ করে বলেছি, "তা ওখানে কি একটু একটু জ্বালা বোধ করছেন এখন?" জ্যোতিষবাবু ইঙ্গিতটুকু উপভোগ করে হেসে উঠে বলেছিলেন, "ওটা আর এখন যন্ত্র নেই যে যন্ত্রণা দেবে; ওটা এখন সবটাই তারাময় হয়ে গেছে যে!"

বিহ্বল প্রদীপ ঃ

রান্নাঘরের সামনে মোড়ায় বসে নয়নতারার সঙ্গে কথা বলতে আমার বেশ লাগে। মনে হয় যেন সংসারের ঠিক মাঝখানটিতেই স্থান পেয়ে গেছি। সংসারের না, নয়নতারার মনের? প্রথমেই নয়নতারার প্রশ্নে হকচকিয়ে গেছিলাম; বলেছিল, "তা তোমাকে চিঠি লেখার বুদ্ধিটা কে দিল?" একটু সামলে নিয়ে মোড়ায় বসতে বসতে বলেছিলাম, "তোমার কি ধারণা যে ও বস্তুটা আমার ঘটে একেবারেই নেই যে তা থেকে একটু আধটু সময়ে অসময়ে খরচা করা যায়?" নয়নতারা এককাপ চা এগিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, "তুমি সঠিক চেন না তাই ওকে, তোমার ঐ ঘটের দ্রব্যকে বুদ্ধি বলছ। আসলে ওটা দুর্বুদ্ধি!" আমি একেবারে থ। হাতের চা নয়নতারার এগিয়ে দেওয়া একটা টুলের উপর রাখতে রাখতে বলেছি, "এ জগতে দুর্মুখের অভাব কোনওদিনই ছিল না, এখনো নেই। তা, তুমি আমাকে ওদের কাছে একটুও বসতে না দিয়ে সোজাসুজি অমিকে দিয়ে এখানে ধরে আনলে কেন?" "আজ যে তোমার এজলাসে হাজিরা!" সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা বলে উঠলো, "আর আমার এজলাস তো এই রান্নাঘর, তাই, অমিকে বলাই ছিল। ও শুধু গৃহ-পেয়াদার কাজটুকু করেছে।" বলতে বলতে নয়নতারা কি সব টুকিটাকি গুছিয়ে গাছিয়ে নিচ্ছিল।

নয়নতারার এই সহজ ব্যবহারের নৈকট্যটুকু আমার বেশ ভাল লাগছিল, কিন্তু ঐ এজলাস-ব্যাপারটা আমাকে বার বারই খোঁচাচ্ছিল। বললাম, "তা, এজলাসে তো শুনেছি বিচার হয়। আর বিচার ব্যাপারটা আবার কোন না কোন অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। আমিই কি অপরাধী? তাহলে আমার অপধার-

টাই বা কি ?" ততক্ষণে নয়নতারা পিঁড়ি টেনে নিয়ে আমার মুখোমুখি বসেছে। বলল, "তোমার অপরাধ কি একটা যে এককথায় বলে দেবো ? তবে প্রথম এবং প্রধান অপরাধটাই আগে বলি। তুমি একপেশে। শুধুমাত্র কৃষ্ণাদের কথাই—মেয়েদের কথাই, সাতকাহন করে বলেছো। ছেলেদেরও যে কিছু বক্তব্য থাকতে পারে, ওদেরও যে দুঃখ বেদনা থাকতে পারে তা তোমার চিঠিতে একেবারেই নেই। কেন নেই ?"

মনে মনে ভাবতে বসলাম, ভাবলাম—সত্যিই তো নেই, তেমন করে ছেলেদের কথাতো নেই। কেন থাকল না ? থাকল না কারণ তাপসের সঙ্গে আমার কোনও কথা হয়নি। তাপসের সঙ্গে হয়নি কিন্তু প্রদীপের কথা তো আমার কিছু কিছু জানা। প্রদীপ আমার বন্ধু এবং প্রতিবেশী ধরণীবাবুর পুত্র। কিছুদিন হল বিয়ে করেছে। তিনমাস যেতে না যেতেই অশান্তি। সেই অশান্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে পোঁছোতে সময় লাগে নি। প্রদীপের স্ত্রী ঘুমের বড়ি এক-পাতা একসঙ্গে খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। যমে-মানুষে টানাটানি। পাশের বাড়িতে ওর দাদা ডাক্তার। তাই পাঁচকান না করে, থানা পুলিশ হাসপাতাল এড়িয়ে সীমাকে বাঁচান সম্ভব হয়েছিল। সীমা প্রদীপের স্ত্রী। সীমার বাবাকে খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি এসেছিলেন। দুদিন ছিলেনও। সবই আমার জানা। ঘটনার ঘোর কেটে গেলে একদিন অনেকক্ষণই প্রদীপের সঙ্গে কথা হয়েছিল। অনেক কথাই সেদিন প্রদীপ দুঃখে ক্ষোভে আর যন্ত্রণায় আমাকে বলেছিল।

"চল এবারে জলখাবারটুকু টেবিলে বসে খাবে চল।" নয়নতারা আমাকে তাড়া লাগাল, "বারান্দায় চল, ওরাও তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। এসে অবধি তো এই রান্নাঘরের কোণ ধরে বসে আছ।" আমি আকাশ থেকে পড়ার মতো করে প্রতিবাদ করতে গেলাম। থামিয়ে দিয়ে নয়নতারা বলল, "থাক আর ঝগড়া করতে হবে না। যা বলছি তাই কর।" বুঝলাম প্রতিবাদ করা বৃথা। নয়নতারার চোখে সেই ফুলহরার দিনের গভীর কালোর ঝিলিক দেখেই বুঝে গেলাম কিছু বললেই আর একবার 'তুই ভীষণ বোকা রে তপু'-শুনতে হবে। তাই ভাল ছেলের মতো উঠে বারান্দার দিকেই পা চালালাম। আর মনে মনে ভাবলাম—রমণীদের প্রতি এই যে ভয়, এই যে সমীহ করে চলা এর মধ্যে কোথায় যেন একটা রমণীয় আনন্দ ঝিরি ঝিরি ঝরনার মতো আবেশ ছড়িয়ে দেয় ! আগে কখনও এমন করে টের পাই নি। এমন সময়ে সামনে

জ্যোতিষবাবুকে বেতের চেয়ারে আধশোয়া অবস্থায় কাগজ-চাপা বুকে দেখেই বুঝে গেলাম তিনি চোখে আমাকে আবাহন করছেন। তখনই মনে হল, জ্যোতিষবাবুর ভয়টাও বোধহয় আমার পাওয়া ভয়েরই মত। তাই উনি সানন্দে নয়নতারার ভয়ে নিশ্চিন্ত সমীহ করেই জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।

ও-বাড়িতে সেদিন বেশিরভাগ সময়ই যে আমি একা একা কাটালুম, সে বোধহয় নয়নতারার পরিকল্পনা মতোই ঘটে যেতে লাগল। বলাটা বোধহয় ঠিক হল না, আমি আর নয়নতারা প্রায়ই একা একা থাকলাম—বললে ঠিক হয়। জলযোগ শেষ হতেই জ্যোতিষবাবু—একটু আসছি—বলে সেই যে গেলেন আর তার টিকির দেখা পেলাম না। অমি মাঝে একবার 'মামা তোমার চা'—বলে চোখ বাঙময় করে হাজিরা দিয়ে গেল। সুপ্রিয়া সম্ভাষণ করে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বলে গেল— আজ দর্শনের দিন নয় সমাজ-চিন্তার সময়! বুঝে গেলাম ওরা আজকের বিষয় জানে। প্রশান্ত তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো অন্য একটি অপরিচিত মেয়ের সঙ্গে। মেয়েটি আমাকে প্রণাম করে বলল, "আমি রত্না, সুপ্রিয়ার বন্ধু। আপনি তো তপুমামা?" আমি কিছু বলার আগেই প্রশান্ত একটু চিমটি কাটার মতো করে বলে উঠলো, "সুপ্রিয়ার বন্ধু, কিন্তু আমার আর মায়ের শত্রু বোধহয়!" রত্না চোখের মোচড়ে প্রশান্তকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করেই দেখে নিল ওদের যুদ্ধের কতটা আমার চোখে ধরা পড়ল। ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওদের নৈকট্যের গভীরতাকে অনুভবে ধরার চেষ্টা করলাম।

একটুখানি একা হতেই প্রদীপ মনের মধ্যে নড়াচড়া করে উঠল। প্রদীপ বলেছিল, "জানেন কাকু, প্রথমদিন থেকেই সীমাকে আমার ভাল লেগেছিল সীমা সুন্দরী নয়, ফর্সা নয়। কিন্তু, আপনিও তো দেখেছেন, ওর একটা শ্রী আছে যা সকলকেই আপন করে নিতে পারে। শিক্ষিত পরিবারের শিক্ষিতা মেয়ে, গান জানে ভাল, রবীন্দ্রসংগীতের গলাটি বেশ শুদ্ধ-পরিশীলিত। ছবি আঁকায় হাত আছে। এসব দেখে শুনে আমার মনে হয়েছিল আমি ভাগ্যবান। সীমার মধ্যে একটা শিল্পী মন আছে ভেবে ওকে আমি প্রথম থেকেই শ্রদ্ধা করতাম।"

প্রদীপকে বাধা না দিয়ে একমনে কথা শুনছিলাম। প্রদীপ কেন থেমে গেল তা বুঝতে না পেরে ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রদীপ আবার বলে উঠেছিল, "কিন্তু কি যে হল তা বোঝার আগেই কেমন

যেন ঘটনা ঘটে যেতে লাগল। সকাল ন'টার মধ্যে তাড়াহুড়ো সব সেরে অফিস চলে যাই, সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটায় বাড়ি ফিরি। যে কল্পগৃহে ফিরে আসতে চাই তা আমার প্রায়ই ঘটে ওঠে না ; বাস্তব মেলে না কল্পনার সঙ্গে। ভাই-বোন মা-বাবা আর সীমা। ভোরবেলায় স্বপ্নের রাত আর স্বপ্নময় রাত ভোর করে সকালের সংসার আর সকলের সংসার আমাদের গ্রাস করে নেয়। স্বাভাবিক। কিন্তু ক'দিন যেতে না যেতেই সীমার মুখে শ্রাবণের মেঘ এবং আরও কদিনেই ভরা ভাদর দেখে আমি বেশ মুষড়ে পড়ি।" এবারে থাকতে না পেরে প্রশ্ন করি, "এই পরিবর্তনের কারণ বিষয়ে তুমি সীমার সঙ্গে কথা বল নি ? সীমা নিজে কিছু বলেনি তোমাকে ?"

সিলিং-এর দিকে ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে প্রদীপ বোধহয় নিজেকেই দেখে নেবার চেষ্টা করল, অথবা নিজেকে কিছুটা সামলানোর। তারপরে বলল, "সেই জানতে গিয়েই তো হল আমার অস্বস্তি আর সীমার অভিমান। সীমা অভিযোগ করল আমার মায়ের নামে—'তোমার মা আমার কোন কাজই পছন্দ করেন না, আমি নাকি কোন কাজই পারি না।' নালিশ করল আমার বোনের নামে—'তোমার বোন আজকালকার মেয়ে হয়েও কেমন মায়ের কথায় সায় দেয়, তাল দেয়, একবারও আমার কথা ভাবে না, আমার কষ্টকে কষ্ট বলেই মনে করে না।' তার পরেই চোখের জলে বক্তব্যকে আবছা করে আমার কাছে অনুরোধ জানায়—'তুমি আমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যাও। আর অন্তত কিছু দিনের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আমার এখানে একদিনও ভাল লাগে না। তুমি সারাদিন অফিসে থাক, আমার কেমন যেন ফাঁকা লাগে, একা একা লাগে। একদম সহ্য করতে পারি না।' এবং এমতো কষ্টের কথা, যন্ত্রণার কথা, আর সেই সব কষ্ট-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির সম্ভাব্য প্রস্তাব। আবার ওদিকে সুযোগ পেলেই মা বলেন তাঁর কথা, বোন বলে তার নিজের মনের কথা। সঠিক পথের খোঁজে যখন আমি দিশেহারা তখন অবস্থা সামাল দিতে সীমাকে ক'দিনের জন্যে তার বাপের বাড়ি রেখে এসেছি।"

আমি বলেছিলাম, "এতো সমস্যাকে সামনাসামনি সমাধানের চেষ্টা না করে সমস্যা থেকে পলায়ন। এতে তো কাজ হবার কথা নয়।" প্রদীপ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল, "সে আমি তখন বুঝিনি। তখন মনে হয়েছে মা-বাবার কাছে দু'চার দিন থাকলে মনটাও ভাল থাকবে আবার তাঁরাও তাঁদের জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতা দিয়ে মেয়েকে বুঝিয়ে শুঝিয়ে মানিয়ে চলার মতো করে

তৈরি করেও দিতে পারবেন। তাছাড়া, আমি চেষ্টা করে দেখেছি। তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। সীমা উত্তেজিত হয়েছে, ভব্যতার সীমা ছেড়ে অভব্য আচরণ পর্যন্ত করেছে। এমন সব কথা বলেছে, অভিযোগ করেছে যা ভাবা যায় না।" আমি প্রদীপের দিকে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়েছি। প্রদীপ একবার আমার দিকে একবার মেঝের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেছে, "সীমা বলেছে—বিয়ে করে স্ত্রী ঘরে না এনে তোমাদের উচিত ছিল সর্বক্ষণের একজন ঝি ঘরে আনা! বলেছে—গ্রাজুয়েট মেয়ে ঘরে আনার সময়ে তোমরা কি ভেবেছিলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ঘরমোছা, বাসনমাজা, জামাকাপড় গোছানো আর রান্নার কুশলতার জন্যে সার্টিফিকেট দিয়েছে? নাকি, ভেবেছিলে আর পাঁচটা গৃহসজ্জার মতো গ্রাজুয়েট পুত্রবধূ ব্যাপারটাও একটা গৃহের ডেকরেশন এবং সামাজিক মান-বৃদ্ধির বিষয়?" আমি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছি, "সীমা কাকে এসব কথা বলেছে? তোমাকে?"

সঙ্গে সঙ্গে আমাকে উত্তর দেয় নি প্রদীপ। স্মৃতি থেকে তুলছিল তা আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম। একটুখানি সামলে নিয়ে প্রদীপ বলেছিল, "আমাকে তো বটেই, এমনকি সীমা যখন আমার বোনকে কথা শুনিয়েছে তখন বিদ্ধ-লক্ষ্য যে আমার মা ছিলেন তা বুঝতে মায়েরও বিলম্ব হয় নি। এসব কথা আমি মায়ের কাছে শুনেছি চোখের জলের ধারায়, বোনের কাছে শুনেছি চোখের জ্বালায় তাপ বিচ্ছুরণের হলকায়। আর যখন রাত্রে সীমাকে প্রশ্ন করেছি তখন সে আমাকে এক-চোখা, মাতৃভক্ত নাবালক, কাপুরুষ, এবং শষ্প-শস্যভোজী অবলা প্রাণী বিশেষ বলেও গাল-মন্দ করেছে। বলেছে,—'তোমাদের সংসারে সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার সম্ভাবনাই নেই, গুণের কদর নেই, স্বাধীন চিন্তার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। তোমার মা হিটলারের প্রথায় সংসারের কর্তৃত্ব আগলে আছেন, থাকবেন। আমার জন্যে তাঁর মনে কোনও স্থানই নেই, তোমার বোনই তাঁর ব্যক্তিগত পরামর্শদাত্রী এবং পথপ্রদর্শিকা। এমতাবস্থায় আত্মসম্মান বাঁচাতে, স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে আমার সামনে দু'টি মাত্র পথই তোমরা খোলা রেখেছ।' —আমি তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি, অসম্মানিত হয়েছি ধিক্‌কৃত হয়েছি।"

এই শেষ কথাগুলো বলতে প্রদীপের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। ওর গলার স্বর ভারি হয়ে এসেছিল। আমার অনভিজ্ঞ চোখে কার্যকারণের গুণগত এবং পরিমাণগত সমতা ধরা পড়ছিল না। কিন্তু প্রশ্ন করে প্রদীপের অনুভবের স্রোতকে বাধা দিলাম না কারণ এটা জানি যে উপযুক্ত শ্রোতা পেলে অন্তরের আবেগ সহজেই প্রকাশ পায়। অপেক্ষাকেই শ্রেয় বলে চুপ করে রইলাম।

"জানেন কাকাবাবু, প্রথম থেকেই আমি সীমার সব আবদার, সকল ইচ্ছা পূরণ করে চলেছি। গৃহ পারিপাট্যের বহুবিধ দ্রব্যসম্ভার, নিজের জন্যে শাড়ি, টুকিটাকি গয়না, এবং নিত্যনব মার্কেটিং-এর চাহিদা। আর্থিক অনটনকে ওর চোখের বাইরে রেখে অপেক্ষা করেছি একদিন ও নিজেই সচেতন হবে। তা তো হয়ই নি বরং উল্টে আমাকে দরিদ্র, কৃপণ এবং ক্ষুদ্রচেতা বলে অভিযোগ করেছে। বলেছে—'সারাজীবন আমরা সচ্ছল অবস্থাতেই অভ্যস্ত হয়ে বেড়ে উঠেছি। সে তোমাদের অজানা থাকার কথা নয়। আর এখন এই তোমাদের সংসারে এসে কিনা আমাকে শুনতে হল যে আমার জন্যেই তোমাদের সংসারের ভরাডুবি হবে, শুনতে হচ্ছে যে আমি বেহিসেবী, উড়ন-চন্ডী স্বভাবের! যদি স্ত্রীর সাধ আহ্লাদ পূরণ করার সামর্থই ছিল না তাহলে ছাঁদনাতলার বাসনা হয়েছিল কেন?" প্রদীপ মাথার চুলকে মুঠো করে ধরে নিজের অন্তরের বেদনাকেই যেন চেপে ধরে রাখতে চাইল।

"কিন্তু একটা বিষয় আমার কাছে পরিষ্কার হচ্ছে না", বলেই ভাবলাম প্রদীপের এই মনের অবস্থায় এ-ধরনের প্রশ্ন করা ঠিক হবে কিনা। আর তাই মাঝপথে থেমেও গেলাম। প্রদীপ তার ঘোলাটে চোখদুটো আমার দিকে স্থির রেখে জানতে চাইল, "কোন বিষয়টা কাকাবাবু?"

"সীমার এই যে উত্তেজিত অনুযোগ-অভিযোগ যা প্রায়ই আক্রমণের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে তার জন্যে যোগ্য কারণের হদিস পাচ্ছি না। মনে হয় তোমার অনুপস্থিতিতে তোমাদের বাড়িতে এমন সব কথা হয় বা ঘটনা ঘটে যা তোমার জানার মধ্যে নেই, বা ছিল না। আর দিনান্ত যন্ত্রণার তীক্ষ্ণ রক্তক্ষরণের কারণে সীমা তোমাকে সেই সব কথা বা ঘটনার বিবরণ দেবার মনটিই খুঁজে পেতো না, শুধুই ফেটে পড়ত। তুমি তাই ক্রমশই সীমা থেকেই শুধু নয়, তোমার মায়ের কাছে, বোনের কাছে বা বাবার কাছে যা জানতে তাও ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ না হয়ে আবেগ-অনুভবের বর্ণনা মাত্র হয়ে দাঁড়াত। সেই

অপ্রকাশিত কথা বা ঘটনাসমূহ ঠিক ঠিক জায়গায় বসিয়ে ফাঁক পূরণ না করে নিলে তো পরিষ্কার বোঝা যাবে না কেন এমন হল, কেন এমন হচ্ছিল। তুমি কি সেই চেষ্টা করেছিলে ?”

চায়ের ট্রে-হাতে নয়নতারা কাছে এলো। টেবিলে ট্রে-রেখে চেয়ারে বসে বেশ ভাল করে আমাকে দেখল। বলল, “তুমি তপু এখানে, এই নিমতার ধারে কাছেও ছিলে বলে মনে হচ্ছে না। কোথায় ছিলে এতক্ষণ ? এই একটু আগে অমি গিয়ে বলে এলো—যাও মা দেখ গিয়ে তপুমামা কোন্ অথৈ জলে ভেসে বেড়াচ্ছেন।—তাই একেবারে চা সঙ্গে করেই তোমাকে উদ্ধারেব জন্যে এসে গেলাম।”

একটু নড়ে চড়ে বসে বললাম, “না নয়নতারা, সমস্যা বেশই জটিল। এত জটিল যে আমার দীর্ঘ অবহেলায় লালিত বুদ্ধিশুদ্ধির অগম্য। তাছাড়া আমি এতোই অনভিজ্ঞ যে এ-ধরনের একটা তপ্ত-সমস্যার মরুভূমিতে মূর্খের মতো পদচারণা না করলেই মনে হচ্ছে ভাল হত।” নয়নতারা হেসে ফেলল। বলল, “কার ভাল হত ? তোমার না কৃষ্ণার, কৃষ্ণাদের ?” বললাম, “সকলের ভাল হত কিনা জানিনা, তবে আমার যে ভাল হত তা এখন বিলক্ষণ বুঝতে পারছি। বিশেষ করে প্রদীপের বিবাহিত জীবনের কথা স্মরণ করে।” নয়নতারা সহজে আমাকে ছাড়ে না। বলল, “তোমার ভাল যখন আমিই করতে পারি নি তখন তা আর হবার নয়। হবার যে নয় তা এতোদিনে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছ। সে কথা থাক। প্রদীপের কথা কি বলছিলে তাই বল।”

একে একে প্রদীপ আর সীমার সব কথা নয়নতারাকে বললাম।

খুব মন দিয়ে শুনল। প্রদীপের সঙ্গে আমার শেষ কথাগুলো যখন নয়নতারাকে বললাম তখন দেখলাম ওর চোখ দুটো আবার নয়ন-তারা হয়ে ঝিলিক দিচ্ছে। বেশ অসহায় বোধ করে থেমে গেলাম। “থামলে কেন ? শেষ কর।” বলেই নয়নতারা একটা দীর্ঘশ্বাসমত ছেড়ে ঘোষণা করল, “নাঃ আর তোমাকে দেখছি বোকা বলা ঠিক হবে না। তবে বুঝে উঠতে পারছি না এই বোধবুদ্ধি তুমি পেলে কোথায় ? জীবন থেকে না পুঁথি-পুস্তক থেকে ?” নয়নতারার কথায় আমার অসহায়তা যেন বেড়েই গেল। বললাম, “তোমার এই সব কথা আমার নিন্দা না প্রশংসা তা আমার কাছে সমান মূল্যের। তা তুমিও জান। তবে এটা জানি যে সীমা-প্রদীপের ব্যাপারটা আমার কাছে বেশই অস্পষ্ট, অপরিষ্কার।

"তাহলে তোমাকে আমাদের সুনীতির কথা একটু বলি।

সুনীতি যখন শ্বশ্রূমাতা ঃ

আমাদের এই বাড়ির চারটে বাড়ি পরে সুনীতির বাড়ি, সংসার। বড় মেয়ে রেখার বিয়ে দিয়েছেন অনেকদিন হল। বছর দুয়েক হল বড় ছেলে অজিতের বিয়ে দিয়েছেন। ছোট ছেলে কলেজ শেষ করে চাকরির চেষ্টা চালাচ্ছে, ছোট মেয়ে কলেজে পড়ে। বছর তিনেক আগে সুনীতির স্বামী রেলের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে ছিলেন। একবছর পরে ছেলের বিয়ে দিলেন, এবং তার এক বছরের মাথায় নিজে চির-বিদায় নিলেন। বড় ছেলেটি ডাক্তার। রেলের চাকরি ছিল বলে সুনীতি শাশুড়ির আওতায় বেশিদিন কাটায় নি। প্রথম দিকের বছর পাঁচেক বাদ দিলে সারা-জীবনই নিজে সংসার করেছে, নিজের সংসারের একচ্ছত্র কর্ত্রী হয়েই সে কাজটি সমাধা করেছে। সংসারের কেন্দ্রও সুনীতি, বৃত্তবিন্দুতেও সুনীতি এবং পরিধির সর্বত্রই সুনীতি। এই হল ছোট্ট ইতিবৃত্ত। এখন সুনীতি শাশুড়ি হয়ে, স্বামীর অবর্তমানে, একমেবাদ্বিতীয়ম, সর্বেসর্বা সকল দণ্ডমুণ্ডের সর্বাধিকারী।

একটু না হেসে পারলাম না। নয়নতারা প্রায় ফোঁস করে উঠলো, 'আমার কথার মধ্যে হাসির কি দেখলে?' আমি যথাসম্ভব 'বুদ্ধি' বাঁচিয়ে বললাম, 'অঙ্কের পরিভাষা তোমার মুখে শুনে হাসি পেল। একটা সুদূর অতীত দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠল। মনে হল এই এতোদিন পরে তুমি তেঁতুল বিচি দিয়ে মেঝেতে দান ফেললে, সুনীতি দেবী গোটা গোটা অক্ষরে ছড়িয়ে পড়ল। একটা দানার সঙ্গে অন্য দানার যোগ নেই। যেন এধারে কড়ে আঙুল দিয়ে বিচিগুলোর মধ্যে দাগ কেটে কেটে টোকা মেরে মেরে একটা করে টুক টুক করে তুলে নিলেই হল!' নয়নতারার চোখের তারায় সেই অতীত যে ঝিলিক দিয়ে উঠল তা বুঝে গেলাম এক মুহূর্তেই। বলল, 'দারুণ বলেছো তো তপু। কি সব দিনই না চলে গেছে।' বলেই বোধহয় সেই সব দিনের পিছু পিছু লালপাড় শাড়ি পড়ে নয়নতারা কিছুক্ষণ আপনমনে ঘুর ঘুর করতে লাগল। আমি প্রায় অরসিকের মতো বিড়ালে-ইঁদুর-ধরার প্রক্রিয়ায় ওকে বর্তমানে তুলে আনলাম। বললাম, 'তাছাড়া সুনীতিদেবীকে

তুমি যেভাবে তুলির ছোট ছোট টানে এঁকে তুললে তাতে একজোড়া ডেয়ো-মাছি-গোঁফ বসিয়ে দিলেই নারী-হিটলার হয়ে যায় !'

'তুমি ঠিকই বলেছ, তপু', বলে নয়নতারা সুনীতির জীবনে কর্তৃত্বটা ছিল জাগ্রত চেতনার মতো। চলনে, বলনে, আঁচলের চাবির ঝনঝনানিতে। একমাত্র যাকে সে সমীহ করত সে ছিল তার বড় মেয়ে। সমস্বভাবের। আর অসম বয়স মেয়েকে অধিকতর অধিকারী করে তুলেছিল। বিয়ে দিয়ে মেয়েকে পার করার পর থেকেই সুনীতি একচ্ছত্র।'

আমি বললাম, 'তুমি অজিতের স্ত্রী বা সুনীতির পুত্রবধূর কথা একটু বল।' সঙ্গে সঙ্গে নয়নতারা কপালে দু'তিনটি কুঞ্চন তুলে বলে উঠল, 'এই তোমাদের দোষ, বাচ্চাদের মতো শুধু গল্পটাই শুনে নিতে চাও। গল্পের পট-ভূমিতে আগ্রহ দেখাও না। সুনীতিকে, সুনীতির সংসার বুনোটকে না জানলে তিতির, তিতিক্ষার দুঃখকষ্টকে কি তুমি বুঝতে পারবে?' বুঝলাম তিতি বা তিতিক্ষা নিশ্চয়ই সুনীতিদেবীর পুত্রবধূ। তবুও শোধ নিতে বললাম, 'কৃষ্ণার বেলায় তুমি আমার বুদ্ধির দৈন্য বিষয়ে কটাক্ষ করেছিলে, আর তিতিক্ষার বেলায় আমার কি করণীয়?' নয়নতারা বোধহয় আমার চোখের মধ্যেই বুদ্ধির দৈন্যকে খুঁজে বার করতে চাইল। বাধ্য হয়েই আমি টেবিলের বেতের বুনোটে মন দিলাম। ও বলল, 'বুদ্ধিমানরা বোকা বোকা কথা বললেও লোকে গভীর কিছু তাৎপর্য আছে বলে মনে করে, কিন্তু বোকারা যদি বুদ্ধিমানের মতো কথা বলে তাহলে শ্রোতারা হেসে উঠতে পারে. কৃষ্ণা ছিল প্রসঙ্গহীন হঠাৎ উত্থাপন। তিতি এলো পরিষ্কার একটা পারিবারিক প্রসঙ্গে। তিতিকে না চিনতে পারার মতো নিরেট বলে তো তোমাকে মনে হয় নি।' বুঝলাম বুদ্ধির ঝলক দেখাতে নিরেট-এর ফলক এঁকে নিলাম, বললাম, 'আর কিছু বলব না, তুমিই বল। তোমার মত করেই বল।'

'অজিতের সঙ্গে তিতির পূর্বপরিচয় ছিল' বলেই নয়নতারা একটু থেমে আমার প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করল। বুঝলাম ফাঁদ। তাই কণ্ঠ বাড়ালাম না। আরও সার্টিফিকেট সংগ্রহের আর বাসনা ছিল না। 'এই তো বুদ্ধি-মানের মতো চুপ করে আছো! পূর্বপরিচয় মানে অবশ্যই প্রেম। সুনীতি টের পায়নি তা নয় কিন্তু পাত্তা দেয় নি। পাত্তা দেয় নি কারণ সে জানতো তার অমতে অজিতের পক্ষে ওই মেয়েকে—ওই মেয়েকে কেন, কোনো মেয়েকেই ঘরে আনা সম্ভব নয়!

'ছেলে ডাক্তার। চাকরি ছেড়ে প্র্যাকটিসে বসল। মা মনে মনে পাত্রী নির্বাচনের পরিকল্পনায় মন দিল। ছেলের পসার বাড়তে লাগল আর মায়ের চাহিদা। ছেলের নজর উন্নতির দিকে তো মায়ের পাত্রীপক্ষের সম্পন্নতার মেদবাহুল্যে। ছেলে রুগ্নী দ্যাখে আর মা পাত্রী দ্যাখে। সুনীতি পাত্রী দ্যাখে আর তালিকা পাল্টায়, তালিকায় নতুন আইটেম যোগ করে।' আমি বললমি 'তার মানে, সুনীতিদেবী বরপণ বিষয়ে লোভী ?'

'সে কথা আর বলতে ? পাত্রী দেখে দেখে স্বামী শিক্ষাদীক্ষা শ্রেণীগোত্র স্থির করেন আর সুনীতি অসবাবপত্র গয়নাগাটি লেনদেনের স্বাস্থ্য নিরূপণ করতে করতে তিতিক্ষাকেই ঘরে তোলেন।' আমি বলে ফেললাম, 'গৃহকর্ত্রী অর্থাৎ শাশুড়ির যদি এমন দৃষ্টিভঙ্গি হয় এতো লোভ থাকে তাহলে তো সংসারে দুঃখ স্রোতের মতোই নেমে আসার কথা।' নয়নতারা বলে উঠলো, 'এই তো তোমাদের দোষ তপু। সবটা না শুনেই নিজের বক্তব্য মন্তব্য দিয়ে ফেল। জ্যোতিষকে সহজেই মানুষ করে তুলেছিলাম, তোমাকে মানুষ করার ভার তো আর আমার হাতে পড়ে নি, তাই। আর আমার হাতেই বা বলি কেন, কারো হাতেই তো ভরসা করে সে ভার তুলে দিতে পারলে না। তাই সারাটা জীবনই······' নয়নতারাকে বাধা দিয়ে বললাম, 'আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে, এখন তুমি সুনীতি-র কথা বল।'

'সুনীতির চোখ ছিল টিভি ফ্রিজ আলমারি ড্রেসিং টেবিলের দিকে' নয়নতারা বলতে লাগল, 'তাই সে টের পায় নি তিতিক্ষার কাকা কায়দা করে অজিত তিতিক্ষার পূর্বরাগ পূর্ব-পরিচয় চেপে রেখে বিয়েটাকে একটা সামাজিক দেখে শুনে বিয়ের চেহারা দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরে সেই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় আর তাতেই সুনীতি কেমন একটা জ্বালা বোধ করে, সব রাগটা গিয়ে পড়ে তিতিক্ষার ঘাড়ে।' আমি বললাম, 'তা, ওরাই বা এটা করতে গেল কেন ? ওরা মানে অজিত তিতি এবং তিতির কাকা।' নয়নতারা জানাল, 'ব্যাপারটা সোজা। প্রেম বিষয়ে সুনীতির মনোভাব ওরা জানত। নিজের ছেলের ব্যাপারে সুনীতির গর্ব ছিল আকাশ ছোঁয়া। এমন ভাল ছেলে হয় না, মায়ের বাধ্য, প্রেম ট্রেম তো দূরের কথা তার ছেলে কোনো মেয়ের দিকেই তাকায় না—ইত্যাদি। তাই বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে অজিত সব সমস্যার সহজতম সমাধান করে নিয়েছিল।'

'প্রথম কদিনের আনন্দ অনুষ্ঠানের আর হৈ চৈ পর্বের শেষে মধুময় সময়

পার হতেই আটপৌরে জীবন শুরু হয়ে গেল। অজিত আটকে গেল সকাল-বিকেল চেম্বারে, দুপুর-রাত্রি কলে। তিতি ক্রমশই জড়িয়ে গেল সংসারের শতকাজে আর সুনীতি মাইক্রোস্কোপ চোখে এঁটে তিতির কাজকর্ম আচার-ব্যবহারের স্ক্যানিং-এ এবং কেনাকাটায় নোতুন বেয়াই-এর অদূরদর্শিতার নমুনার খোঁজে। ছোট মেয়ে রুচিরা বৌদির সঙ্গে সময় কাটালে বকুনি খায় পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে, অজিত যতক্ষণ বাড়ি থাকে তার সব সময়-টাই সুনীতি দখল করে নিতে চায় এ-কথা সে-কথা এবং নানান কথায়।' নয়নতারার কথার মধ্যেই আমি বলে উঠেছি, 'তাহলে তো তিতি আর অজিতের প্রতি ভারি অন্যায় হচ্ছিল।'

'অন্যায় ?' নয়নতারা বলেছিল, 'সুনীতি কিন্তু উল্টো কথা বলেছিল। সুনীতি বলেছিল—জান নয়নতারা, ছেলেবৌকে প্রথম থেকেই শাসনে না রাখলে ওদের পাখা গজিয়ে যায়। বৌরা তো সুযোগ পেলেই ছেলেদের পর করে দেয় মা থেকে। বৌ হয়ে এসেই ভাবে হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছে। বরকে গোলাম বানাতে তৎপর হয়ে ওঠে।' বলেছিল—যাকে পেটে ধারণ করে জন্ম দিলাম, লালন পালন করে এতো বড়োটি করলাম, গুচ্ছের টাকা খরচ করে মানুষ করে তুললাম, তাকে নিয়ে আমি ভাবব না তো কি ভাববে ওই হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসা বউ ?'

আমি বলেছিলাম, 'এতো দেখছি সেই আদ্দিকালের শাশুড়ি মার্কা কথা ! আর তুমি সেই সব কথা বেমালুম শুনে গেলে ? একটা প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না ?' নয়নতারা একটু হেসে বলেছিল, 'আমি কি তোমার মতো পাগল যে সুনীতির বাড়িতে বসে তারই কথার প্রতিবাদ করব ? নিজের সংসারে সে শান্তি জল ছেটাক আর আগুন ধরিয়ে দিক—সে তো তার নিজের ব্যাপার, তার পারিবারিক বিষয়। কিছু বলতে গেলেই তো খুঁচিয়ে দেওয়া হবে। তা হলে তিতির কপালে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।' বেশ রাগ হয়েছিল আমার। বলেছিলাম, 'যতোই বল, এ তোমার একটা সুবিধাবাদী মনোভাবকে চাপা দেবার কথা। তোমার কিছু বলা উচিত ছিল, সুনীতিকে বুঝিয়ে বলা উচিত ছিল।'

বেশ একটু ধমকে দেবার মতো করে নয়নতারা বলল, 'দেখ তপু, তুমি আমাকে তোমার ছাত্র পাওনি যে ফাঁক পেলেই কেতাবী উচিত-অনুচিত বোঝাতে বসবে। সারা জীবন দেখলাম যে যা বোঝে সে তাই বোঝে। নিজের

মতো করেই বোঝে। একটা সময় পার হয়ে গেলে প্রত্যেকের জানা বোঝার সবটাই শক্ত হয়ে যায়, বাইরের জানালা দরজা সব বন্ধ করে দিয়ে ভীষণ ভাবেই আত্মশস্ত, আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ক'জন লোক তুমি পাবে যারা খোলা মনের মানুষ? যারা সারাজীবনই মনের জানালা দরজা খোলা রেখে শিখতে চায়, জানতে চায়, জীবনকে নোতুন করে বুঝতে চায়?' বললাম, 'তাহলে যে বলে—'যতোদিন বাঁচি ততোদিন শিখি'—সে কথাটা কি ঠিক নয়?' দু'চারজনের জন্যে ঠিক, বহুজনের জন্যে বেঠিক ও আর সকলের জন্যেই উপদেশ হিসেবে সার্থক কিন্তু মেনে চলার জন্যে একেবারেই অনর্থক।" এমনভাবে নয়নতারা কথাগুলো বলল যেন এনিয়ে আর কথা হোক তা সে চায় না। তবুও মনে ভাবলাম বলি যে তোমার সব কথা মানতে পারলাম না, কিন্তু না বলে বললাম, 'তুমি সুনীতির কথাই বল, তিতির কথা বল।'

'আর বলার বাকি রইল কি? সুনীতি নিজে নিজেই একটা যুদ্ধকে তার সংসারের মধ্যে টেনে আনল। সে সর্বক্ষণ তার সংসারকে নিজের অধিকারে রাখতে চায়, ছেলেকে নিজের করে আগলে রাখতে চায়, নিজের পছন্দ-অপছন্দ দিয়ে তিতিকে নিজের মতো তৈরি করে নিতে চায়। তিতি নির্দেশ মতো চলতে চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিপদে বাধা পেয়ে পেয়ে সংসারের কেন্দ্রে পেঁছিতে পারেনা, তার জ্ঞানবুদ্ধি আহত হয়, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা মার খেতে থাকে, ছোট-খাট কামনা-বাসনাও শাশুড়ির মতামতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে আর প্রায়ই এলোমেলো হয়ে যায়। অজিতকে তিতি যেমন জানে, জেনেছে, তার সঙ্গে অজিতের মায়ের জানা-চেনা মেলে না।—'আমার ছেলে এটা পছন্দ করে না, ওটা তার কোনওদিনই ভাল লাগেনা, সেটা সে কোনওদিনই করে নি'—এমতো বহু অজিত-তথ্য তিতি জানে অজিত-সত্য নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুখ বুজে সহ্য করে যেতে হয়, মেনে নিতে যয়। ওদিকে অজিত সারাদিনে যে সময়টুকু ঘরের জন্যে খুঁজে পায় তার অধিকাংশই তার মা অধিকার করে রাখে বলে অজিত মনে মনে অস্বস্তি বোধ করে, তিতি কষ্টও পায় উত্তেজিতও বোধ করে। আর ওর মা মনে মনে আত্মপ্রসাদ বোধ করে এই ভেবে যে তার সংসার তার নিজের দখলেই আছে, তার ছেলে পর হয়ে যায় নি, পুত্রবধূটিও ট্যাঁ-ফোঁ করার সুযোগ পায় নি। সে কথা সুনীতি এ-বাড়ি ও-বাড়ির গিন্নীদের বড় গলা করে বলেও আসে।' আমি বললাম, 'এ-তো ঝড়ের পূর্বাভাষ!' নয়নতারা বলেছিল, 'না, ঝড় নয়, ভূকম্পন। ফাটল ধীরে ধীরে অনিবার্য হয়ে

উঠেছিল সুনীতির সংসারে। বড় মেয়ে রেবা বলেগেছিল—এতো শাসন ভাল নয়, বজ্র বাঁধনে ফস্কা গেরো হয়ে তোমার ছেলে বৌ ফস্কে যাবে!—তা সুনীতি তা শোনেনি। ছোট মেয়ে বোধহয় অনুমান করেছিল। দু'একবার মাকে বোঝাতে গিয়ে ধমক খেয়েছে—সেদিনের মেয়ে আমাকে সংসারের হাল বোঝাতে এসেছে! অজিত আর তিতি তলে তলে সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলল। বাবা মারা যাওয়াতে ওদের যাওয়া বিলম্বিত হল এই যা।'

আমি বলেছিলাম, 'অজিত মাকে ছেড়ে যেতে রাজি হল?' নয়নতারা বলেছিল, 'রাজি না হয়ে তার উপায় ছিল না। দু'একবার মায়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে। মা ছেলেকে পাত্তাই দেয় নি।—'ও তুই ভাবিস না খোকা আমি সব ঠিক করে নেবো। প্রথম প্রথম শহরের শিক্ষিত মেয়েরা বৌ হয়ে এসে স্বামীর কাছে অনেক কাঁদুনি গায়, নালিশ করে, অধিকারের কথা বলে, শিক্ষাদীক্ষার কথা তোলে। এ-সবই আমার জানা। অন্যান্য বাড়িতে, চারপাশে, দেখছি না? এমন কি আজকালকার বৌরা তো বিয়ের পরেই ছেলে পুলে মানুষ হবে না বলে আঁতকে ওঠে, শ্বশুর বাড়ির পরিবেশে তারা নাকি সুস্থ স্বাভাবিক বাতাবরণই পায় না।' তার পরে ছেলের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছে—'সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই একটু বিশ্রাম করে নে।' নয়নতারা একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে বাগান পার করে তার দৃষ্টিকে রাস্তার ওপাড়ে পাঠিয়ে দিল।

মনে মনে সুনীতিদেবীর কথাই ভাবছিলাম। জোর করে ধরে রাখতে গিয়ে তিনি সবই হারালেন। এমনই বোধহয় হয়। সহজ হতে না পারলে বোধহয় সংসারে কোন কিছুই সহজে পাওয়া যায় না। সংসার কি জবরদখল সহ্য করে না? যার যেখানে জায়গা, যার যতটুকু পাওনা, যার যতদিন যে ভূমিকায় থাকার কথা তারা সকলেই যে যার নিজ নিজ এলাকা ছেড়ে অন্যের এলাকায় ঢুকে পড়লেই বোধহয় অশান্তি। কে জানে!

নয়নতারা উঠতে উঠতে বলল, 'এবারে দিনের দিকে একটু তাকাও, হাত গুটিয়ে সংসারের দুঃখ আর অশান্তির কারণ খুঁজতে থাকলে আমার সংসারে আর সুখ থাকবে না।' বুঝলাম ওদের সকলের আসার সময় হয়ে গেছে। দুপুরের ব্যবস্থা করতেই নয়নতারার এই তাড়া। একটা সিগারেট ধরিয়ে সবে মৌজ করে ধোঁয়া ছেড়ে চেয়ারে হেলান দিয়েছি, জ্যোতিষ বাবু দেখলাম ঢুকলেন এবং বাগান পার হয়ে সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমাকে প্রশ্ন করলেন,

'বিচার পর্ব কেমন কাটল ?' আমি জ্যোতিষবাবুর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে বললাম, 'আপনি অজিত, ডাক্তার অজিত রায়, সুনীতিদেবীর ছেলে, তাকে চেনেন ?' অবাক হয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, 'চিনি মানে ? বিলক্ষণ চিনি। আমাদের বাড়িতে তো সেই ছোট্ট বেলা থেকেই আসে যায়। মামিমা মামিমা করে নয়নকে তো উত্যক্ত করে ছাড়ে তা। ভাল ছেলে, ডাক্তার হিসেবেও বেশ নাম। তা, কি ব্যাপারে অজিতকে চাই আপনার তাই বলুন, 'আমি বললাম, না, ঠিক তা নয়। ওকে আমার চাই না। ওদের বিষয়ে এই মাত্র নয়নতারার কাছে সব জানলাম তো তাই।,

কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে জ্যোতিষবাবু কি ভাবলেন তা তিনিই জানেন, বললেন, 'আপনি যে সমস্যাটা নিয়ে ভাবছেন সে বিষয়টি অবশ্যই বেশ জটিল। বিয়ের পরে ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের সমস্যা, শ্বশুর বাড়িতে এ্যাডজাস্টমেন্টের সমস্যা। এবং এর মূল এতো গভীরে যে আমার ক্ষমতার বাইরে।'

বললাম, 'মাঝে মাঝে আমার মনে হয় লেখাপড়া জানা শিক্ষিত পরিশীলিত মেয়েরা কতো আনন্দ করে শ্বশুর বাড়ি যায়। দুটি পরিবারের মধ্যে একটা অসীম হৃদ্যতার প্রেক্ষিতে অনুষ্ঠান ঘটে, মিলন হয়। তার পরেই কেমন যেন সব হয়ে যেতে থাকে। মেয়েকে বিয়ে দিয়ে ঘরের শূন্যতা নিয়ে মা-বাবার মনে যে দুঃখ হয়, অপরের মেয়েকে পুত্রবধূ করে ঘরে এনে সেই দুঃখের লাঘব হয় না কেন ? যদি বৌ-রা স্বামীগৃহে এসে স্বাধীনতা চায়, একটু স্বতন্ত্র জীবন চায় তা এমন কি দোষের। শ্বশুর-শাশুড়িরা তাদের সেই স্বাধীনতাটুকু দিলেই তো পারেন। নিজেদের মতো করে তারা, স্বামী স্ত্রীতে নিজেদের সংসার করতে চাইলে সেই অধিকারটুকু দিলেই তো মিটে যায় !'

জ্যোতিষবাবু মন দিয়ে আমার কথা শুনছিলেন। শেষকালে মনে হল যেন মিটিমিটি হাসছেন। বললাম, 'হাসছেন যে বড় ? জ্যোতিষবাবু বললেন, 'হাসছি কি এমনি মশাই, হাসছি ভূপতিবাবুর কথাটা মনে পড়ে গেল বলে।' বললাম, 'ভূপতিবাবু কে, ?' বললেন, 'আমাদের বড়বাবু। এই তো ক'দিন আগে দুঃখ করে তিনি বলছিলেন, জানেন জ্যোতিষবাবু আজকালকার ছেলে আর ছেলের বৌরা যে কি চায় তাই বুঝি না। তারা নিজেরাই জানে কিনা তাই এখন সন্দেহ হয় আমার।' —বলেই জ্যোতিষ

বাবু বললেন, সময় পেলে আপনাকে সবিস্তারে বলব। তবে আপনি যে ঐ স্বাধীনতা আর অধিকারের কথা বললেন, ভূপতিবাবুও ঠিক তাই ভেবেছিলেন। কিন্তু ধোপে টেঁকে নি। দুবছর আকণ্ঠ স্বাধীনতা আর সর্বৈব অধিকার ভোগ করার পরেও ভূপতিবাবুর পুত্রকে নিয়ে পুত্রবধূটি কলকাতায় চলে গেছে। তাহলে ?, এমন করে জ্যোতিষ বাবু আমার দিকে তাকালেন যে আমার মুখেও সেই একই প্রশ্ন ফুটে উঠল—তাহলে ?

সরলার একাকিত্ব :

নয়নতারার তাড়া খেয়ে আমরা উঠে পড়লাম। ওরাও সব এসে গেছে। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া সেরে আবার বারান্দায় এসে বসেছিলাম। কাগজখানা নাড়াচাড়া করতেই জ্যোতিষবাবু এসে গেলেন। পাশে বসে বললেন, ‚নয়ন আসার আগেই যতটা হয় বলে নেই।, বললাম, ‚উত্তম প্রস্তাব। তাই হোক।, কাগজখানা ভাঁজ করে টেবিলে রাখলাম। জ্যোতিষবাবু নিজেকে গুছিয়ে নিলেন।

‚ভূপতিবাবুর ঝাড়াঝাপটা সংসার। ভূপতি মিত্র। এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়ে বড়। বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন। ছেলে বি.এ.পাশ করার পরেই একটি প্রাইভেট সংস্থায় কাজ পেয়ে গেল। সুদর্শন, স্মার্ট এবং কাজেকর্মে নিপুণ, কথায় বার্তায় চতুর। এমন ছেলেদের যা হয় তাই হল। চটপট বড় অফিসারের নজরে পড়ে গেল। তরতর করে দু-তিন ধাপ এগিয়ে গিয়ে পার্চেজ সেকশনে একখানা সুইভেল চেয়ারে, ছোট্ট ঘেরাটোপে ঢুকে গেল। উপার্জনের চাইতে রোজগার বেশি হতে লাগল, অফিসের সময় বেড়ে গেল। আর যা হল তা অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রায়শই হোটেল রেষ্টুরেন্ট পথ আগলে দাঁড়াতে লাগল। এবং ইত্যাদি।

জ্যোতিষবাবুর ছেড়ে যাওয়া ফাঁক গলে প্রশ্ন করলাম, ‚তা, ভূপতিবাবুর স্ত্রীর কথা তো বাদ গেল। জ্যোতিষবাবু বললেন, “বাদ যায় নি। তাঁর কষ্টের কথা বলে শেষ করা যাবে না বলেই শেষকালে বলব ঠিক করেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। প্রথম দিকে ছিল কি সব স্ত্রীরোগের আক্রমণ, শেষকালে বাত-ব্যথা কোমরে হাঁটুতে চিরস্থায়ী ঘর বেঁধে বসে গেল। ভূপতি-বাবু যেমন অফিস অন্ত প্রাণ, তাঁর স্ত্রীও তেমনি সংসার অন্ত প্রাণ।

দুজনের মধ্যে তফাত এই যে ভূপতিবাবু অফিস ছাড়া আর যে একটি বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন সে তার স্ত্রীর বিষয়ে, অন্য দিকে সরলাদেবী, স্বামীর স্বাস্থ্যানিয়ে। দুজনেই অবশ্য মিশনের ভক্ত। এ-জীবনের প্রতি টানের চাইতে ওঁদের পরজন্মে নৈকট্যের জন্যে আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশি। দীর্ঘ শান্তির জীবন যাপন ক'রে, ছেলে মেয়েদের যথাসাধ্য লালন পালন ক'রে, মেয়ের ভাল একটা বিয়ে দিয়ে ভেবেছিলেন সময় মতো ছেলের বিয়ে দিয়ে একটি টুকটুকে বৌ এনে সুখে বাকি জীবন কাটাবেন।'

একমনে ভূপতিবাবুর কথা শুনছি! জ্যোতিষবাবু একটু থেমে বোধহয় পরবর্তী কাহিনী ঠিক কিভাবে বললে ঠিক হয় তা ভেবে নিলেন। বললেন, 'অঞ্জন ভূপতিবাবুর ছেলে। তা, ছেলের মত ছিল না বলে এবং একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নেবার সময় দেবার জন্যেও বটে ইচ্ছেটাকে স্বামী স্ত্রী মিলে কটা দিনের জন্যে শিকেয় তুলে রাখলেন। তারপর ছেলে যখন গুছিয়ে নিল তখন আর তেমন করে বিয়ের ইচ্ছেটা খুঁজে পেল না। ছেলের মনের ভাব দেখে মা বললেন—'খোকা এবারে তোর জন্যে মেয়ে দেখি? আর কতোদিন সংসারের ঠ্যালা সামলাবো। বুঝিয়ে শুঝিয়ে গুছিয়ে গাছিয়ে দিতে-টিতেও তো সময় লাগবে।' ছেলে বলে—'অত ব্যস্ত হবার কি আছে। সময় হলে আমি নিজেই বলব।' সব শুনেটুনে ভূপতিবাবু সরলাকে বলেন—'তুমি দেখে শুনে মেয়ে ঠিক কর, খোকা না করবে না। এমনিই চলছিল, হয়তো বা চলত আরও কিছুদিন। কিন্তু একটা যোগাযোগ ওদের তিনজনকে একটি বিন্দুতে একজায়গায় মিলিয়ে দিল।'

ধীরে সুস্থে সব কাজ সেরে নয়নতারা আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, 'অনেকক্ষণই দেখছি জ্যোতিষ কথা বলছে। ব্যাপারটা কি? কি কথা হচ্ছে তোমাদের?' জ্যোতিষবাবু বললেন, 'ভূপতিবাবুর কথা বলছিলাম তপুবাবুকে। উনিই শুনতে চাইলেন।' নয়নতারা টেবিলের ওপাশে একটা চেয়ারে বসে বলল, 'তা বেশ তো, বল না! থামলে কেন?' আমি বললাম, 'জ্যোতিষবাবু থামেন নি। কি একটা যোগাযোগের কথায় এসে যেতেই অন্য একটা গোলযোগ ঘটে গেল—তোমার এসে পড়াতেই গোলযোগ। না হলে তো ভূপতিবাবু মেয়ে দেখতে বলছিলেন সরলাকে, সরলা ছেলের অমতে মুষড়ে পড়েছিলেন আর অঞ্জন জীবনের প্রথম কিরণে পাখনায় ভর করে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল।'

জ্যোতিষবাবুর মন আমার কথায় ছিল বলে মনে হল না। বোধহয় সেই যোগাযোগেই যুক্ত ছিল। বললেন, "ওদের এলাকার মিল্ক বুথে মেয়েটিকে দেখেন ভূপতিবাবু। রোজই দেখেন সকালে দুধ আনতে গিয়ে। বোতলের দিকে দৃষ্টি থাকে আর নজর পড়ে থাকে কব্জিতে বাঁধা সময়ের কাঁটার দিকে। তাই চোখ পড়ে কিন্তু দেখা হয় না। শনি আর রবিবার অঞ্জন যায় দুধ আনতে। অফিসে কাজের চাপে আর রোজ সকালের বাজারের তাড়ায় ভূপতিবাবুর নিঃশ্বাস নেবার সময় থাকে না। এদিকে, রান্নাবান্নার হিসেব-পত্র রাঁধুনীকে বুঝিয়ে দিলেই সরলার ছুটি। তাই সরলাই বলেছিল—আমি দুধ আনতে গেলে তোমার একটু সময় বাঁচে, একটু ধীরে সুস্থে অফিস যেতে পার। সেরকম ব্যবস্থা তাই চালু হয়ে গেল।"

আমি একটু ফাঁক পেয়েই বললাম, "আমি বোধহয় আন্দাজ করতে পারছি।" নয়নতারা ফোঁস করে উঠল, "তা তো পারবেই, তোমার তো আর ভূপতিবাবুর মতো অফিসের তাড়া নেই। আরাম করে চেয়ারে বসে জ্যোতিষের মুখে ইতিবৃত্ত শুনছো যে! তাই অনেক বেশি দেখতে পাচ্ছ এখন।" আমাদের যৌথ উদ্যোগে নিজের মনোযোগ পণ্ড হতে না দিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, "সরলা কিন্তু প্রথম দিনেই মেয়েটিকে জরিপ করে এলো। ফর্সা, সুশ্রী এবং সপ্রতিভ। কলেজে পড়ে। দর্শনে অনার্স। মা-বাবার তিন মেয়ের বড় মেয়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে। সব শুনে ভূপতিবাবু বলেছিলেন—তোমরা মেয়েরা পারও বটে। আমি এতোদিন গেছি অথচ তুমি একদিন গিয়েই এতোসব জেনে এলে? সরলা বলেছিল—মেয়েটির নাম দীপা। আমার তো বেশ পছন্দ। স্বঘর। তাই শুনে ভূপতিবাবু তো অবাক। বলেছিলেন—তুমি এতোদূর ভেবে ফেলেছো? কিন্তু ছেলের মতামত? দুধের বুথে কাজ করে বলে অঞ্জন আবার নাক সিটকাবে না তো?"

ভূপতিবাবুর কথার মাঝখানে আমি বলে উঠেছি, "বিয়ের যোগ্য ছেলে থাকলে মায়েদের কী অবস্থা! সুশ্রী সুন্দর মেয়ে দেখলেই বৌ বানিয়ে ঘরে আনতে ইচ্ছে হয়।" নয়নতারা আমাকে চোখে আটকে নিয়ে বলেছিল, "তোমাকে বলেছে! ক'জন এমন মায়ের সঙ্গে তোমার এযাবত পরিচয় ঘটেছে মশাই?" সম্ভাব্য রণে ভঙ্গ দিতেই বলেছি, "এটা আমার নিজের কথা নয়, শোনা কথা।" নয়নতারা হাঁপ ছাড়ার মতো করে বলেছিল, "সেও ভাল।"

তারপর বোধহয় আমাকে মনে মনে মেপে নিয়ে বলেছিল, "মায়েরা তো তবু মেয়ে দেখলে ছেলের বৌ বলে ঘরে তুলতে চায়, ছেলেরা, বিশেষ করে বাবারা সেক্ষেত্রে কি করেন? এক্ষেত্রে তোমার কোনও 'শোনা কথার' সংগ্রহ আছে কি?" এমন করে 'শোনা কথা' শব্দ দুটোর উপর জোর দিল যে আমরা দুজনেই—জোতিষবাবু এবং আমি—বেশ জোর করে হেসে উঠলাম। হাসি যে কেবলমাত্র আনন্দের প্রকাশ ঘটায় তাই নয়, সে অস্বস্তিকে আড়াল করতেও বেশ কাজে লাগে তা সেই মুহূর্তেই বুঝে গেলাম।

"দু-চার দিনের মধ্যেই সরলা জেনে গেল", জ্যোতিষবাবু আবার আমাদের ভূপতিবাবুর জীবনে নিয়ে গেলেন, "এবং ভূপতিবাবুও জেনে গেলেন যে নাক সিটকানো তো দূরের কথা অঞ্জন দীপাকেই পছন্দ করে ফেলেছে। এবং দীপা অঞ্জনকে।" আমি বললাম, "বাঃ বেশ হল! মিঞা-বিবির ছড়াটা আর কাজেই লাগল না কারণ কাজীর প্রয়োজনই নেই। আর মা-বাবা আগেই রাজি।" নয়নতারা বাধা দিল। বলল, "তুমি জান যে কাজীর দরকার নেই? ওরা দুজনেই শিক্ষিত এবং আধুনিক। তাই সরকারের নির্দেশ আর আইনের উপদেশ থেকে সামাজিক বিয়ের আগেই রেজিস্ট্রি ম্যারেজের নোটিশ দিল।" আমার মনে হল আজ আমার দিন নয় জ্যোতিষ বাবুর দিন। নয়নতারা সুযোগ পেলেই আমাকে বোকা বানানোর তৎপরতা দেখাচ্ছে। একবারও জ্যোতিষবাবুকে কিছু বলে নি। চুপ করে থেকে দুর্যোগ কাটানোর সিদ্ধান্ত করলাম। তাতেই কি বাঁচোয়া আছে? নয়নতারা বলে উঠলো, "কী চুপসে গেলে কেন?" 'বোবার শত্রু নেই'—কথাটা নয়নতারার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে জ্যোতিষবাবুকে বললাম, "আপনি বলুন।"

"দীর্ঘদিন বাইরের আলো বাতাসে অভ্যস্ত দীপা ঘরের চার দেয়ালে স্বস্তি পাচ্ছিল না। অঞ্জন দীপার জীবনে বাইরের টানটাকে আরও বাড়িয়ে তুলল। নিজে একধাপ উঁচুতে উঠে গেল অফিসের মই বেয়ে, প্রশস্ত ঘর পেল, পেল 'ফারনিশড' দপ্তর। আর সেই সঙ্গে যোগাযোগ, পার্টি, ক্লাব এবং ইত্যাদি। সরলার নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত সংসারে অঞ্জন-দীপার গতিশীল ঊর্ধ্বশ্বাস আধুনিক জীবন সুস্থ বোধ করছিল না। ভূপতিবাবু টের পেলেন অনেক আগেই। সরলা কেমন যেন মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু যা হবার তা হলই। অফিসের নির্দেশে নির্ধারিত আবাসে চলে যেতে হল অঞ্জন দীপাকে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বলে ফেলেছি, "আহা রে! কারো দোষ নেই, অথচ দেখ ওরা, বুড়োবুড়ি, কেমন একা হয়ে গেল।" বলে ফেলেই ভয়ে ভয়ে নয়নতারার দিকে তাকালাম। কিন্তু চোখের ভাষায় যে অনুনয়ই থাকুক না কেন নয়নতারা তা বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে বলল, "বোবার শত্রু নেই—ঠিক কথা। কিন্তু যে বোবা মাঝে মাঝেই কথা বলে ওঠে তার শত্রুর অভাব কোথায়?" জ্যোতিষবাবু মিটি মিটি হাসছেন, আমি টার্গেট হয়ে স্থির অপেক্ষা করে আছি। নয়নতারা বলল, "ওরা কি দু'জনেই একা হয়ে গেলেন? একই রকমের একাকিত্ব? ভূপতিবাবুর অফিস আছে, বাজার আছে। সরলার কি আছে? বাতের আক্রমণে এখন আর বাইরে যেতে পারেন না। একা ঘরে সারাদিনই একা। তোমরা কেবল নিজেদের দিকটাই দেখতে জান, মহিলাদের কষ্ট যন্ত্রণাকে তোমরা একটা ব্র্যাকেটে না পেলে বোঝই না।" বলে একবার জ্যোতিষবাবুর দিকে তাকালেন। দৃষ্টি-আহত না হলে হয়তো জ্যোতিষবাবু কিছুই বলতেন না। কিন্তু এমতাবস্থায় বলে উঠলেন, "তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই। সরলার নিঃসঙ্গতার তো শেষ নেই। শেষ জীবনে সংসার ছেলে ছেলে-বৌ-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে যে একটু নিশ্চিন্ত হবেন তা আর হল না।"

কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নয়নতারার চোখ এড়ালো না। বলল, "থামলে কেন? বলেই ফেল যা বলতে মন চায়।" আমি মাথা নেড়ে জানতে চাইলাম ন্যাড়ার পক্ষে বারবার তৃতীয়বার বেলতলাটা প্রশস্ত নাও হতে পারে। নয়নতারা কি বুঝলো আমার জানা নেই তবে জ্যোতিষ-বাবু বললেন, "তপুবাবু তোমার ভয়েই মুখ খুলছেন না এটা আমি বুঝে গেছি।" নয়নতারা মুখের হাসিটি ধরে রেখেই বলল, "অভয় দিচ্ছি, তুমি বল।" বললাম, "সংসারে দুঃখ-যন্ত্রণা যে কেন আসে, কোন পথে আসে তা সব সময়ে সংসারীদের জানা-চেনা নাও হতে পারে, অবস্থা আর পরিস্থিতির টানাপোড়েন, অজ্ঞাত-অদৃশ্য সব কারণও কম দায়ী নয়। এই যেমন সরলার জীবনে ঘটে গেল। তাই বলতে চাইছিলাম। অন্য কিছু নয়।"

অশান্ত গৃহকোণে শচীন:

আজ সুপ্রিয়া আর রত্না মিলে বিকেলের চা নিয়ে এলো। ট্রে টিপট আর

স্ন্যাকস রেখে যাবার সময়ে সুপ্রিয়া বলে গেল, "তুমি কিন্তু তৈরি থাকবে তপু মামা, রত্নার এ্যাক্লেমেটাইজেশন চলছে এখন। শেষ হলেই সানাই-এর দিন ঠিক হবে।" আমি সাগ্রহে রত্নার দিকে তাকালাম। রত্না বলল, "এই সংসারের জলহাওয়া এতোই সহজ সরল যে আমার মনে হয় অনেক বেশি সময় লাগবে আমার। আমার কেন, আমার মতো যেকোনও আধুনিকার পক্ষে।" আমি বললাম, "সহজ-সরল যদি তাহলে সময় লাগবে কেন?" উত্তর দিল সুপ্রিয়া। বলল, "যা কঠিন, চ্যালেঞ্জিং তাকে নাকি সহজে জেনে বুঝে নেওয়া যায়। আর যা সহজ-সরল তার তল পাওয়া নাকি বেশ কঠিন, আয়াসসাধ্য। এটা রত্নার কথা।" ওরা চলে গেল সুপ্রিয়ার ঘরে। আমি মনে মনে আনন্দ পেলাম এই ভেবে যে নয়নতারার উত্তরসূরিটি বোধহয় অযোগ্য হবে না।

"তুমি যে একদিন কোন এক শচীন বাবুর কথা বলবে বলেছিলে, তা আজ বল না তাঁর কথা।" নয়নতারার কথায় আমি রত্না থেকে সরে এলাম। উষ্ণ চায়ে চুমুক দিলাম, মন চলে গেল শচীনবাবুর কাছে। বললাম, "সে যে দীর্ঘ কাহিনী। দীর্ঘ এবং জটিল। অনেক চরিত্র, বিচিত্র সব মন আর আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব। আমার হরিহর আত্মা বন্ধু। তাই প্রতিটি খুঁটিনাটি আমার জানা। সে তো আমি সংক্ষেপে বলতে পারব না।" জ্যোতিষবাবু বললেন, "আমাদের সময় তো তেমন কৃপণ নয়, কি বল নয়ন? সারা বিকেলই তো পড়ে রয়েছে, আছে সমস্ত সন্ধ্যাটাও।" নয়নতারা জ্যোতিষকে টিপ্পনী কাটার মতো করে বলল, "কেন, তপু রাত্রে এখানে থাকলে তোমার আপত্তি আছে? বড় যে বিকেল থেকে সন্ধ্যায় গড়িয়ে গিয়ে থেমে গেলে?" জ্যোতিষবাবু নয়নতারার দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েই আমাকে সাক্ষী মানার মতো করে বলে উঠলেন, "দেখলেন? দেখলেন কাণ্ডখানা? আপনি না হয়ে অন্য কেউ হলে কি ভাবতেন তিনি! আমি হাসতে হাসতে বললাম, "অন্য কেউ হলে নয়নতারা যে ওমনি করে বলতই তা আপনাকে কে বলে দিল?"

সুপ্রিয়া এক ফাঁকে এসে চায়ের সরঞ্জাম তুলে নিয়ে গেল। আমি মনে মনে শচীনের সংসারের কথা ভাবতে লাগলাম। জ্যোতিষবাবু সাগ্রহে আমার মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। নয়নতারা বলল, "কাহিনীতে সময় লাগে তো লাগুক, বাধা দেবো না। কিন্তু যাত্রাগানের পালা শুরু হবার

আগে দীর্ঘ আনাগোনা আর সুদীর্ঘ কনসার্টের মতো যেন ভাবতে ভাবতে বিকেলকে সন্ধ্যেয় জুড়ে দিও না। চটপট শুরু করে দাও।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বেশ মৌজ করে চেয়ারেই আসনপিঁড়ি হয়ে বসে একটু নাটকীয় ঢঙেই বলতে আরম্ভ করলাম ঃ

প্রথম অংক ঃ ইতি এবং পুনশ্চ ঃ

শচীনবাবুর কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে তিনি যাকে বলে সেলফ মেইড ম্যান। তাঁর লড়াকু জীবন শুরু হয়েছে তরুণ বয়স থেকেই। সব কিছু কাটিয়ে সব কিছু ছাড়িয়ে থিতু হওয়ার সময় যখন হল, অর্থাৎ যখন বার্ধক্য এল, তখনও শচীনবাবু ঈশান কোণে কালো মেঘের উপস্থিতি টের পেলেন। এবারে ক্ষেত্রটি তাঁর নিজের সংসারের ঘেরাটোপের মধ্যেই। কাজে কাজেই লড়াইটা যে খুবই টাফ্ হবে একথাটা শচীনবাবু আঁচ করে নিলেন। কোনো কোনো অলস মুহূর্তে তিনি ভাবেন সংগ্রাম ব্যাপারটা তাঁর জীবনকে নিয়ে যে খেলা শুরু করেছে তা থেকে তাঁর কি মুক্তি নেই ?

শচীনবাবুর তিনটি সন্তান। প্রথমজন পুত্র-বিমল। অপর দুজন কন্যা- অনিমা, তনিমা। উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনজনই কৃতি। বিমল সম্ভাবনাময় সরকারী চাকরি করে। অনিমাও চাকরি করে—বিয়ের প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। কনিষ্ঠা তনিমা বিবাহিতা, একটি কন্যাসন্তানের জননী। শচীন-বাবুর স্ত্রী জয়ন্তী শ্বশ্রূমাতার কাছ থেকে সংসারের পাঠ যথাযথ বুঝে নিয়ে দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুভার অন্তর্মুখী মমতা দিয়ে সুচারুরূপে পালন করতে করতে শাশুড়ি ঠাকুরাণির পরবছর তাঁরই পথে অনুগমন করে বসলেন। পরিবারকেন্দ্রের শূন্যতাকে ভরাট করতে পারবে এই ভরসায় বিগতদার শচীন-বাবু বিমলাকে পুত্রবধূ হিসেবে মনোনীত করলেন এবং পুত্রের সঙ্গে সহমত হয়ে তাকে ঘরে আনলেন। ওদের সূত্রে শচীনবাবু পেয়েছেন একটি ফুটফুটে নাতি যার সঙ্গে কাটে তাঁর বহু অমলিন উজ্জ্বল অবসর।

শচীনবাবুর নিজ সংসারের পরিচয় বাইরে থেকে এইটুকুই। আর যেটুকু বলার তা এই যে যা অনাবশ্যক তার প্রতি আগ্রহ তিনি কোনোদিনই অনুভব করেন নি। জীবনযাত্রায় তিনি সবসময়ই সাবলীল ভাবেই সাধারণ থেকেছেন।

তাই সংসারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করার মতো সম্পদ তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত। কাজেই পুত্র-পুত্রবধূ এবং কন্যা নিয়ে তাঁর ক্ষুদ্র পরিবারটি আপাত প্রেক্ষায় সহজ সরল ও সুখের বলে মনে হতে পারে। পারিবারিক তাপ ও শৈত্যের মধ্য দিয়ে শচীনবাবুর বার্ধক্যের দিন গুলি পরিবারের সকলকে নিয়ে সুখেই কাটবে এটা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু শচীনবাবু বুঝতে পারছেন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের সুর ঠিকমতো বাজছে না। পিতা-পুত্র ভ্রাতা-ভগিনী ভ্রাতৃবধূ-ননদিনী-র মধ্যেকার সম্পর্কের সূত্রে জটিল সব গ্রন্থির জট বেড়েই চলেছে। ঝড়ের আবির্ভাব যে কোনো সময়েই ঘটে যেতে পারে।

এমনিই একদিন শচীনবাবুর টেবিলে টেলিফোনটি বেজে উঠলো। রাত তখন প্রায় আটটা। শচীনবাবু শুনলেন মেয়েলি কণ্ঠে কেউ তাকে বলছে—বাপি কেমন আছ? শচীনবাবু বুঝলেন তাঁর মেয়ে বলছে. কিন্তু কোন মেয়ে তা বুঝলেন না, কণ্ঠস্বরে ধরা পড়লো না। বড় মেয়ে চাকরি করে। ফিরতে তার রাত হয়ে যায় কোনো কোনো দিন। কিন্তু কণ্ঠস্বরটি তো তার মতো শোনাচ্ছে না! ছোট মেয়ে এখন শ্বশুর বাড়িতে. প্রায় সাড়েতিনশো মাইল দূরে। কিন্তু অতীতের ঘটনার প্রেক্ষিতে তার কাছ থেকে কোনো বার্তা প্রত্যাশিত নয়। তবু অচিরেই তিনি বুঝলেন কথা বলছে তাঁর ছোট মেয়ে তনিমাই।

তনিমা বললো—বাপি তুমি ঊনত্রিশ তারিখে এখানে আসতে পার?

শচীনবাবু হতচকিত হয়ে গেলেন। তনিমার হঠাৎ এই আমন্ত্রণ বিস্ময়করই শুধু নয় অনপেক্ষিতও বটে। শচীনবাবুর মাথার মধ্যে তখন দ্রুত অতীতের ঘূর্ণি চলছে, মস্তিষ্ক তাৎক্ষণিক ভাবে অস্থির সামঞ্জস্যহীন তরঙ্গাঘাতে ইতিকর্তব্য চিন্তারহিত। কয়েকমুহূর্তের জন্যে। তারপরেই তিনি নানারকম অজুহাত দেখিয়ে স্বল্পকথায় প্রস্তাবটিকে পাশ কাটিয়ে দিলেন। যদিও ঠিক-বেঠিক উচিত-অনুচিত সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল তাঁর।

শচীনকে আরও বিব্রত করে তনিমা ওপাশ থেকে বলে উঠলো—তাহলে আগামী চার তারিখে আমিই তোমার কাছে যাচ্ছি, আমরা সবাই। তারপরেই কণ্ঠস্বরে উচ্ছলতা মিশিয়ে বলল—টুকির সঙ্গে কথা বল। একটি কচি কণ্ঠ ভেসে এলো—হ্যালো, দাদু! কেমন আচো? শচীনের মধ্যে অতীত ঢেউ

ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়তে চাইল। তিনি কথা বলতে পারলেন না, শুধু প্রতি-ক্রিয়া জানালেন। তারপর তনিমা কলকল করে অনেক কথা বলে গেল কিন্তু সে সবের একবর্ণও শচীনবাবুর মাথায় ঢুকলো না।

বিবাহিতা কন্যার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়ি আসতে চাওয়ার সংবাদে পিতার খুশি হওয়ারই কথা; কিন্তু শচীনবাবুর ক্ষেত্রে এমন বিপরীত প্রতিক্রিয়ার পিছনে যে ইতিহাস আছে তার বিবরণ সংক্ষেপে বলে নিতে হয়। তনিমার বিয়ে হয়েছে প্রায় পাঁচ বছর। কিন্তু ওর জীবন সুখের হয় নি। সে অন্য এক কাহিনী। অনেক ঝড়-ঝাপটা তোলপাড় সংগ্রাম সংঘর্ষ উজান-ভাটা আর মানসিক টানাপোড়েন গেছে দীর্ঘদিন। ঘুমের বড়ি খেয়ে আত্ম-হত্যার চেষ্টা, স্বামী-স্ত্রীতে মারামারি খামচাখামচি উতোর চাপান, আত্মীয়-স্বজনদের দলাদলি বিবাহ-বিচ্ছেদ মহিলা সমিতি ডিভোর্স-চিন্তা এবং ইত্যাদি নির্ভেজাল শাশুড়ি পুত্রবধূ সংবাদ। এরই মধ্যে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম, শ্বশুরের মৃত্যু এবং হরেক রকমের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশের খতিয়ান পার হয়ে অনেক ভাঙাচোরার শেষে ওদের জীবন কোথায়ও যেন স্থির চলনের নিশ্চয়তা পেয়ে গেছে। কেমন করে বা কোন মূল্যে তা শচীন জানে না, জানার আগ্রহও নেই। তবে এই সূত্রের রেশ ধরে মেয়ের শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে জামাতার সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত কন্যার সঙ্গেও শচীনবাবুর সম্পর্ক নিশ্চিন্ত তিক্ততায় স্থির হয়ে আছে।

অথচ শচীনবাবু তো সকলের সঙ্গে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণই রাখতে চেয়ে-ছিলেন। তার জন্য যা কর্তব্য তার সবই তিনি করবার চেষ্টা করেছেন। এমন কি কর্তব্যের বাইরেও তিনি অনেক কিছু করেছেন তাঁর পড়ন্ত বয়সের ভার, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বর্তমান আর স্ত্রীহীন সংসারের যাবতীয় অসুবিধা সমস্যা উপেক্ষা করেও। সময়-অসময় বিচার না করেই ছুটে গেছেন সেই সাড়ে তিনশো মাইল দূরে কন্যার ডাকে জামাতার প্রয়োজনে আর ওদেরই জটিল পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত সমস্যার মধ্যে। ওদেরই অনুরোধে। সাতমাস গর্ভবতী অবস্থায় ওদের পুত্রবধূকে স্ত্রীহীন শচীনবাবুর সংসারে যখন ডাম্প করে রেখে গেল তখন একই সঙ্গে পিতৃত্ব এবং মাতৃত্বের গুরুভার নিজের স্কন্ধে বহন করতে কোনো ত্রুটিই তো রাখেন নি শচীনবাবু আসন্নপ্রসবা কন্যার আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। কন্যার মাতৃত্বের উন্মেষ ও প্রসবকালীন যাবতীয় করণীয়গুলিই—আর্থিক, সামাজিক ও মানসিক সমস্যার

সমস্ত ঝুঁকিগুলিই সুচিন্তিত পরিকল্পনায় সুশৃঙ্খলভাবেই করে গেছেন তিনি।

সেই সময়ে স্নেহাকাঙ্ক্ষী গর্ভবতী পুত্রবধূকে নির্মমভাবে সরিয়ে দিয়ে সমস্ত দায় পিতার উপর চাপিয়ে ক্ষান্ত হননি বিচক্ষণ শ্বশ্রূমাতা ঠাকুরাণি। প্রসবের পর পাঁচ-ছ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার কোনো গরজ পর্যন্ত দেখাননি তাঁরা, যদিও নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বামীকে পত্র পাঠিয়েছিল তনিমা তাঁদের দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে। উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে তনিমা পিতাকে রাজি করিয়ে তাঁর সঙ্গেই ডিসেম্বরের এক সন্ধ্যায় রওনা হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। কাঙ্ক্ষিত আবাহন তো ছিলই না, এমন কি সদ্যোজাত শিশুর প্রতি আগ্রহেরও ছিল বেদনাদায়ক অভাব। অস্বাভাবিক এক বিষণ্ণ অনুভূতি নিয়ে শচীনবাবু ফিরে এসেছিলেন সেবার কন্যাকে তার শ্বশুরবাড়িতে, স্বগৃহে, রেখে।

তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। পরিস্থিতির কিছু পরিবর্তন হয়েছে ভেবে শচীনবাবু সম্পর্ককে নির্দিষ্ট স্তরে উন্নীত করার চেষ্টা করলেন। চিঠি পত্রের আদান প্রদান হল, প্রকাশ পেল আগ্রহ। ছুটিছাটায় শচীনবাবু বেশ কয়েকবার গেলেনও ওখানে। আদরের নাতনীকে দেখলেন বড় হচ্ছে, হাঁটতে শিখছে। দূর থেকে শচীনবাবু ভাবলেন ওদের জীবনের সুসময় সবারুণের মতোই আলো ফেলতে শুরু করেছে।

হঠাৎই এক শীতের সকালে স্বামীর সঙ্গে তনিমা হাজির হল টুকিকে নিয়ে। জামাতাটি প্রায় দুর্ব্যবহারই করল শচীনের সঙ্গে, পরিবারের অন্যান্য-দের প্রায় আমলই ছিল না। তনিমার চোখে মুখে অসহায়তার ছাপ। স্ত্রী আর কন্যাকে বাপের বাড়ি ফেলে রেখে জামাতা কলকাতা চলে গেল। বাড়িতে ছড়িয়ে দিয়ে গেল উৎকণ্ঠার পরিবেশ।

দিনকয়েক বাদে এক বিকেলে, চায়ের টেবিলে ধ্যান ভাঙ্গা রক্তাভ চোখে তনিমা শচীনবাবুর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—বাপি তোমার এখানে আমার জন্যে একটা ব্যবস্থা হতে পারে না? চায়ের টেবিলে উপস্থিত পরিবারের সকলেই হতচকিত। আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্নটি ছোট কিন্তু ঐটুকুতেই আইস-বার্গের টিপটি ধরা পড়ল, তার তলদেশে যে গভীর ব্যাপ্তি, যে অসীম সমস্যার বিধ্বংসী সম্ভাবনা উঁকি দিয়ে গেল তা উপস্থিত সকলের অনুভবেই কম্পন তুলে দিল! এটাকে তো আর হাল্কা ভাবে নেওয়া যায় না, বিশেষ করে দীর্ঘ

ইতিহাস আর সমূহ আগমন নির্ঘণ্টটি মনে রাখলে তনিমার মনের একটা হদিস পাওয়া সহজ হয়ে যায়। বার বার সে মানিয়ে চলতে চেয়েছে, চেষ্টার ত্রুটি করে নি, সংসারী মন নিয়েই সে সংসার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল। ইচ্ছের অভাব ছিল একথা বলা যাবে না ; ক্ষমতা, প্রতিযোজনা এবং প্রতিন্যাশ বিষয়ে অবশ্যই কোনও সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। তবে সে ক্ষেত্রে দু'পক্ষের ব্যাপারটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বার বার তনিমা অকৃতকার্য হয়েছে, হচ্ছে। কেন? দেখা গেছে তনিমা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না ; যখন সিদ্ধান্ত নিল বলে মনে হয় তখন আসলেও আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়। শচীন বার বার দেখেছে তনিমা সকালের সিদ্ধান্ত বিকেলে, এ-সপ্তাহের সিদ্ধান্ত ও-সপ্তাহে নাকচ করে দেয়। সেটি একটি উপরন্তু সমস্যা। অস্থির মতি? তা বোধহয় নয়। স্বামী-সংসার বিষয়ে ওর সনাতন ধারণা, বদ্ধমূল প্রত্যয় আর তীব্র আকাঙ্ক্ষা একদিকে যেমন ওকে শান্ত শাশ্বত বাঙ্গালী সংসারের হাতছানি দেয়, অন্যদিকে ওর বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত যৌক্তিক মন, পিতার পরিবারে সদা প্রবাহিত স্বাধীনতার আস্বাদ, উন্মুক্ত চিন্তার আলোবাতাস ওকে যেন কেমন দ্বন্দ্বের মধ্যে ঠেলে দেয়। এটা ওর অস্তিত্বের দ্বন্দ্ব বলা যায়! তাই ও যখন শচীনের কাছে একটু বাসস্থানের আবেদন জানায় তখন সেই আবেদনে সাড়া দেওয়া শচীনের পক্ষে অসম্ভব। কারণ বৃক্ষকে শিকড় শুদ্ধ অন্যত্র সরিয়ে দিলে না তার প্রাণ বাঁচে, না তার সর্বদেহ মনে রসের যোগান ঠিক থাকে। সে তো দু'দিনেই সনাতন বিশ্বাসের টানে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে। আর তখন তো সব দায় পড়বে শচীনের উপর। তনিমা তখন নিজের দ্বন্দ্ব, আবেগসর্বস্ব মানসিকতার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে শচীনকেই দায়ী করবে। কেন সে উপযুক্ত উপদেশ যথাসময়ে দিল না? কেন সে তনিমার জীবন ধ্বংস করে দিল? কেন? কেন? শত সহস্র কেন তখন শচীনকে তাড়া করবে। তখন?

তনিমা আবার বললো—আমাকে কোনো উকিলের কাছে নিয়ে যাবে? শচীনবাবু ক্ষত বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করলেন না কারণ বুঝে গেলেন ক্ষত অতিশয় গভীর গাঢ়।

তিনি অনুভব করলেন তনিমার যা প্রয়োজন, তখনই যা প্রয়োজন তা একটু সমবেদনার, একটু আত্মবিশ্বাসের, একটু আশ্রয়ের নিশ্চয়তার। তাই শচীন পরিষ্কার করেই জানালেন যে তাঁর যা আছে তাতে তনিমার সারাজীবন

ব্যাপী আশ্রয়ের অনটন পড়বে না। কিন্তু সেই সম্ভাবনা, সেই সিদ্ধান্তটি সুচিন্তিত যৌক্তিক পথেই বিচার করে নিতে হবে। নিজের ব্যক্তিত্ব, আশা আকাঙ্ক্ষা, বর্তমান, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সবিশেষ বিশ্লেষণ করেই আশ্রয় বিষয়ে ভাবতে হবে। অন্যথা ভুল করা হবে, যে ভুল শোধরানোর হয়তো আর পথ খোলা থাকবে না। তাই সে প্রস্তাব করল যে তনিমা নিজের মনটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ বুঝে নিক দেখে নিক ; আবেগের বশে নয় বিচারের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করুক। প্রয়োজন হলে শচীন তাকে চিন্তা দিয়ে বিশ্লেষণ দিয়ে সাহায্য করবে। তার পরে কি চাই, জীবনটাকে নিয়ে কি করা হবে, কোন পথে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা হবে, টুকির বিষয়, স্বামীর বিষয় ইত্যাদি সবিস্তার দেখে নিয়ে তবে ইতিকর্তব্য নিশ্চয় করতে হবে। হঠকারিতা বৃহৎ জীবনের সমস্যা সমাধানে যেন প্রভাব বিস্তার না করতে পারে। নিজেরা, সিদ্ধান্ত স্থির হলে, বইপত্র ঘেঁটে দেখতে হবে পথ কি নেওয়া যায়। তার পরে মোটামুটি মত এবং পথ স্থির হলে উকিলের পরামর্শ বা মহিলা সমিতির নির্দেশ নেওয়া ঠিক হবে। এখুনি হুট করে, ঝাঁপিয়ে পড়াটা কোনও কাজের কথা নয়।

শচীন লক্ষ্য করছিল তনিমা আবেগের চাপে বোমার মতো অগ্নি-সম্ভবা হয়ে উঠছিল। "অত কথা আমার ভাল লাগছে না। তুমি আশ্রয় দিতে ভয় পাচ্ছো। সম্ভবত ছেলের কথা ভেবেই!" অগ্নুদ্গার ঘটেই গেল। শচীন চুপ করে বসে রইল। তনিমা আক্রমণের পর আক্রমণ শানিয়ে গেল। "আমার মা থাকলে আজ তুমি অত কথা বলতে না। মা আমাকে কোলে টেনে নিত, আশ্রয় দিত। তুমি দেবেনা সেই কথাটা বলতে পারছ না কারণ আমি তোমার মেয়ে ; আবার দেবে সে কথাটাও ছেলের মতামত না নিয়ে প্রকাশ করে বলতে পারছ না কারণ ছেলে তোমার আপন।" ডিভান থেকে উঠে টুকিকে এক ঝটকায় টেনে নিয়ে শব্দ করে পা ফেলে ফেলে তনিমা বেরিয়ে গেল। বলে গেল, "যে দিকে দুচোখ যায় সে দিকেই চলে যাব। তোমার উপর আশা করেছিলাম, সে আশায় ছাই পড়ল!"

শচীন বজ্রাহতের মতো বসে রইল চেয়ারে। তার পুত্রবধূ ডিভানের এক কোণে বসে বসে নিশ্চুপ নখ খুঁটতে লাগল। কোনও কথাতেই সে যোগ দেয় নি। সে সদ্য এসেছে এই সংসারে। পিতাপুত্রীর এই মান-অভিমানের টানা-পোড়েনে সে বুদ্ধিমতীর মতো নিঃশব্দই রয়ে গেল। তাছাড়া সে যদিও

জানে অনেক, তনিমার ব্যাপার, তার শ্বশুর বাড়ির সমস্যা ইত্যাদি। অনেক জানলেও সে নাক গলাতে, মতামত দিতে, সচেষ্ট হয় নি। স্বাভাবিক।

সেই শুরু। দেড়মাসের মধ্যে শচীন আর তনিমা মনের দিক থেকে একে অপরের কাছে আসতে পারল না। প্রধান অন্তরায় হল টুকি! কি আশ্চর্য! অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। টুকি তনিমার নিজস্ব ধন, সম্পদ। তাই তার মায়ের যত ঝাল, যত উষ্মা ঝরে ঝরে পড়তে লাগল। উদ্দেশ্য অবশ্যই শচীনকে বিব্রত করা, শাস্তি দেওয়া এবং নিজেকেও শাস্তি দান! টুকি শচীনের নয়নের মণি; তাছাড়া শিশু। যেমন মিষ্টি তেমনি চঞ্চল। দেখলেই ভালবাসতে হয় এমন চোখ-মুখ-অভিব্যক্তি। শাসন বেড়ে গেলে শচীন বাধা দিতে যায়, সংঘাত বাড়ে! খাবার সময় টুকিকে মার দেয়, অত্যাচার করে, মন্তব্য করলে টুকির প্রাণান্ত হয় আর শচীনকে দূরে সরে যেতে হয় শব্দ-বাক্য আর 'বচনের' হাত থেকে বাঁচার জন্যে। এর পাশাপাশি চলে পা-মাড়িয়ে দিয়ে ঝগড়া করা। দু'জনের মধ্যে তাই ক্রমশ অপরিমেয় ফাঁক হয়ে গেল। শচীন 'বোবার শত্রু নেই' নীতিতে চুপ করে থেকে মিত্র অন্বেষণ করতে সময় নিতে চাইল। তনিমা 'উল্টা বুঝিলি রাম' হয়ে অভিযোগের বাণ্ডিল শক্ত করে বেঁধে নিল। 'বাপি আমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা বোধ করে! আমাকে মেয়ে বলে মনেই করে না। আমাকে আড়াতে পারলে বাঁচে! ইত্যাদি ইত্যাদির জপমালা জপতে লাগল। দু'জনে উত্তরমেরু দক্ষিণ মেরুতে বিভক্ত হয়ে একই বাড়িতে, একই ঘরে দিন কাটাতে লাগল।

এই সময়ে যে দুজন প্রকৃতিগত ভাবেই মেরুদূরত্বের বাসিন্দা সেই অনিমা-তনিমা হরিহর আত্মা হয়ে উঠলো। অনিমার বহু অভিযোগ আছে শচীনের বিরুদ্ধে, এখন তনিমারও অনেক অভিযোগ জমা হয়ে উঠেছে। তাই ওদের দুজনের নঞর্থক নৈকট্য বেশ জোরালো হয়ে দুজনের রক্তচাপ বাড়িয়েই তুলতে লেগেগেল। সম্ভাব্য মিটমাটের আর টিকিটিও বেঁচে রইল না।

মাসাধিককাল তনিমা পিতৃগৃহে বিদ্রোহীর ভূমিকায় ছিল। ওর স্বামী সম্পর্কছেদের হুমকি দিয়েছে, আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছে এবং চূড়ান্ত অসম্মান দেখিয়েছে শচীনকে, শচীনের পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি। তনিমা তখন তলে তলে এক আত্মীয়ের মাধ্যমে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করল এবং একটা ব্যবস্থা করে ফেলল। ওদের নিয়ে যাবার জন্যে লোক দাঁড়িয়ে থাকবে শিয়ালদহ

স্টেশনের আট নম্বর প্লাটফর্মে। শচীনকে এই খাপছাড়া ব্যবস্থায় সায় দিতে হল তনিমার আগ্রহে এবং অবস্থার বিবেচনায়। তনিমার চলে যাওয়াটা অনিবার্যই ছিল কিন্তু যে ভাবে সে গেল সেটি অনিবার্য ছিল না।

নির্দিষ্ট দিনে শচীনবাবুই সকন্যা তনিমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে পৌঁছে দিলেন। ট্রেন ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে তনিমা পিতার হাতে একটি চিঠি তুলে দিয়ে বললো—বাড়ি গিয়ে পড়বে। শচীনবাবু বুঝলেন পত্রটিতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিশ্চয়ই আছে। ফেরার পথে ট্রেনের কামরায় বসে তিনি পত্রটি আদ্যোপান্ত পড়লেন। অবিশ্বাস্য মনে হল শচীনের। পত্রের বক্তব্য মোটামুটি পরিষ্কার। তনিমা পিতার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেছে বলে লিখেছে এবং জানিয়েছে পিতৃগৃহ থেকে এমন কিছু সে গোপনে সংগ্রহ করেছে যেগুলো দিয়ে সে শচীনবাবুর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করে তার প্রতি অবহেলার প্রতিশোধ নেবে। যে মেয়ের জন্য তিনি এতোদিন ধরে এতো কিছু করলেন তার কাছ থেকে এমন আঘাত আসতে পারে শচীনবাবু স্বপ্নেও ভাবেন নি।

সেই যে ইতি টেনে তনিমা চলে গেল আর দেড় বছরের মধ্যে শচীন তার বিষয়ে কিছুই জানতে পারল না। চার খানা চিঠি দিলো শচীন। সাড়া পেল না। একবার চিঠির সঙ্গে জন্ম দিনের উপহার পাঠালো টুকিকে; নৈঃশব্দ্য সেইরকমই চূড়ান্ত রইল। ইতি যে এমন চির বিচ্ছেদের হতে পারে বিশেষ করে পিতার সঙ্গে কন্যার তা শচীনের দীর্ঘজীবনে এই প্রথম অভিজ্ঞতা। ইতির পরেও তো পুনশ্চ থাকে; আর সেই পুনশ্চ ধরে তো দুটি মনের কাছাকাছি আসার সম্ভাবনাটাও খুলে যেতে পারে? সে শচীনের কপালে ঘটল না দেড় বছরের মধ্যে। শচীনের দুঃখ আছে; কিন্তু তার পাশাপাশি অসীম সান্ত্বনাও তো আছে। 'মেয়ে সুখে আছে, স্বামীর সঙ্গে মিলমিশ হয়েছে'—এটুকুতেই তো সান্ত্বনা। শচীনকে বাদ দিয়ে, অসম্মান করে, ধিক্কার দিয়েও যদি তনিমার সংসার সুখের হয় তাহলে তো শচীন আনন্দ করতে পারে। সেই আনন্দেই ছিল এতদিন।

এই হল টেলিফোন বার্তার পূর্ববর্তী ঘটনাপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য বিবরণ। শচীনবাবুর বিচলিত বোধ করার কারণ বুঝতে তাই অসুবিধা হবার কথা নয়।

পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়েও শচীনবাবু কিছুদিন ধরেই বিব্রত

আছেন। শচীনবাবুর বড়মেয়ে অনিমার সম্বন্ধে এখানে কিছু বলে নেওয়া ভালো। অনিমার সঙ্গে বিমল-বিমলার সম্পর্কের অবনতি ক্রমশই সংসারে বিরাট এক ফাটলের সৃষ্টি করছিল। শচীনবাবুর সঙ্গেও তার দূরত্ব ইদানিং ক্রমবর্ধমান। অনিমা চাকরি করে। সকাল আটটার মধ্যে তাকে বেরোতে হয়। বাড়িতে ফিরতে বেশ দেরি হয়। মেয়ের একাকিত্ব বোধ যতো বাড়ছে যন্ত্রণাও ততো বেশি বেশি প্রকাশ পাচ্ছে। চাকরিটি তার পছন্দের নয়, যে পরিবেশে সেই চাকরি তাও তার পছন্দের নয়। পরিবারের মধ্যে থেকেও অনিমা তাই যেন পরিবারের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বিচ্ছিন্নতা প্রায় বেদনা-দায়কভাবেই সম্পূর্ণ।

এদিকে বিমল স্বভাবে জেদী, একরোখা, হঠাৎ হঠাৎ রক্তচাপের-আবেগ-প্রবাহে মস্তিষ্কের সমতা হারিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ঝুঁকে পড়ে। বিমলাকে ধীর স্থির শান্ত বলে মনে হয়েছিল, কিন্তু বিমল যদি ঘটনার অভিঘাতে এমন কোনো প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি ক'রে বসে তাহলে বিমলা কোন ভূমিকা নেবে তা পরীক্ষিত নয়। পারিবারিক অবস্থানের এই প্রেক্ষায় বসে শচীনবাবু তাই তনিমার আগমনের বিষয়টিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে মন দিলেন। তিনি অনেকগুলি সম্ভাবনাকে যেন দেখতে পেলেন।

প্রথম সম্ভাবনা : পিতার সংগে 'ইতি' ঘোষণার পরে বহুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। তনিমার মনে কি পিতৃগৃহ বিষয়ে, পিতার, ভ্রাতার এবং ভগিনীর বিষয়ে এতোদিন একটু আগ্রহ হয়েছে ? সে কি ইতি থেকে পুনশ্চে ফিরতে চায়। বাপের বাড়ি মেয়েদের মনে মহাদেশের মতো স্থান জুড়ে থাকে, থাকার কথা। কার্যকারণ শৃঙ্খলে সেই স্থানে গ্রহণ লেগে বহুদিন অন্ধকার হয়ে ছিল ; অসত্য বা মিথ্যা হয়ে যায় নি। তাই কি তনিমা 'হোম-সিক্'—গৃহ-টান অনুভব করছে ? বাপের বাড়ির গভীর সম্পর্ক না থাকলে মেয়েদের একটা বিরাট মানসিক গহ্বর সৃষ্টি হবার কথা ; সেটা শ্বশুর বাড়িতে, সেখানকার আত্মীয়স্বজনদের দৃষ্টিতে মেয়েদের অসম্মানের, অসহা-যতার এবং পায়ের নিচে মাটি না থাকার সামিল হতে পারে। তনিমার মনে কি সেরকমের কোনও বোধ ওকে ইতিতে ইতি ঘটিয়ে আবার আপন হবার প্রেরণা দিল ?

দ্বিতীয় সম্ভাবনা : তনিমা তার 'ইতি'-বাচক পত্রে ঘোষণা করেছিল :—দাদার সংসারের সর্বনাশ করবে ; ধ্বংস করে দেবে ওদের নোতুন গড়ে ওঠা

সংসারটাকে। এখন কি তার উপযুক্ত সময়? লোহাকে গরম মনে হল কেন যার জন্যে এই আঘাতের সময় নির্বাচন? অনিমার সঙ্গে পরিবারের বিচ্ছিন্নতা? অনিমাকে সঙ্গে পাওয়া যাবে? আঘাতকে দ্বিগুণিত করা যাবে?

তৃতীয় সম্ভাবনা: বর্তমান আইনে মেয়েরা সম্পত্তির অধিকারী। শচীনের অবসর জীবন যখন শুরু হয়েছে, তখন 'কখন আছে কখন নেই'— ভাবনায় এবং পিতৃ-অর্থের অংশ আদায় মানসিকতায় তনিমা স্বামীসহ পিত্রালয়ে আসছে নিজের অংশ বুঝে নিতে? অনিমা তাকে সঙ্গ দেবে এমন একটা সম্ভাবনা তার কাছে পরিষ্কার জানান হয়েছে? যুদ্ধ, সংগ্রাম এবং অর্জন?

চতুর্থ সম্ভাবনা: শ্বশুর বাড়িতে তনিমার একাকিত্ব বোধ তীব্র হয়ে উঠেছে; ওর যে পিতৃগৃহে স্থান নেই তা হয়তো ওখানে ওকে বার বার শোনান হয়েছে। তাই কি এই পিতৃগৃহে আসার প্রস্তাব? তনিমা ওদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায় যে তার অতীত মুছে যায় নি, জীবন্ত সত্য হয়েই তার জীবনে টিকে আছে; এই আসার প্রস্তাব, হঠাৎ করে উত্থাপন করে এবং স্বামীকে শুনিয়ে, টেলিফোনে, তনিমা হাতে নাতে প্রমাণ করে দিতে চায়, "তোমাদের ধারণা ভুল, বাপি আমাকে এখনও সাদরে গ্রহণ করতে প্রস্তুত!"

পঞ্চম সম্ভাবনা: শচীনের সঙ্গে তার জামাতার বিরোধকে মীমাংসার, স্বাভাবিক সম্পর্কের পত্তনের জন্যে এই আগমন।

এবারে অপনয়নের নীতি প্রয়োগ করে সম্ভাবনাগুলোকে যাচাই করে নিল শচীন।

দাদার সংসার ভাঙ্গার সম্ভাবনা ধোপে টিকবে না কারণ অনিমা ব্যক্তি-গতভাবে এধরণের প্রচেষ্টাকে ঘৃণ্য, অবমাননাকর এবং অন্যায় বলে মনে করবে। তার মূল্যবোধের সঙ্গে এই প্রকল্প সামঞ্জস্যহীন। তনিমার একার পক্ষে, দেড় বছরের ইতিহাস এবং প্রায় পাঁচ বছরের ঘটনা স্মরণ করে, এতদিন পরে পিতৃগৃহে এসে সংসারে ভাঙ্গন ধরানোর চেষ্টা বাস্তব সম্মত নয়।

অর্থসম্পত্তির সম্ভাবনাও অবাস্তব। কারো কাছ থেকেই জোর করে কিছু আদায় করা যায় না, সম্পত্তির অংশ তো নয়ই, তার জন্যে আদালতই উপযুক্ত স্থান, পিতৃগৃহ নয়। তাছাড়া অনিমা এ-ব্যাপারে তনিমাকে সঙ্গ দেবে না,

বিরোধ করবে। দুজনের অবস্থান এবং জীবন যাপন সম্পূর্ণ আলাদাও বটে। পঞ্চম সম্ভাবনা বাতিল কারণ জামাতা বাবাজীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এ-ধরনের কোনও বিশিষ্টতার উপস্থিতি একেবারেই নেই। অন্তরে সে অক্ষম এবং ভীত তাই সে কথাবার্তায় এবং ব্যবহারে সক্ষমতা আর নির্ভীকতার ঘোষণা করে।

বাকি রইল প্রথম ও চতুর্থ সম্ভাবনা। এ-দুটো একই সঙ্গে বা আলাদা ভাবে সত্য হয়ে দেখা দিতে পারে। অনুশোচনা অথবা শান্তি কামনায়, বিশ্রাম বা 'রিলিফ্'-আশায় পিতৃগৃহ সব মেয়েরই কাম্য। আবার প্রমাণ করাও যায় যে বাপির কাছে তার স্থান চিরনিশ্চয়। জটিল মনের গভীরে কি আছে তা এক্ষুনি জানা যাবে কি করে?

শচীনের ভাবনার শেষ নেই। মেয়ে তার সঙ্গে সব সম্পর্ক 'ইতি' করে দিয়েছে বলেই কি সম্পর্কের ইতি হয়ে যেতে পারে? তাহলে? এই 'তাহলে'র উত্তর এখন কে দেবে শচীনকে?

সেই ইতির পরে এই পুনশ্চ কি স্থায়ী হবে?

ওরা দুজনে একমনে শুনছিল। জ্যোতিষবাবুর চোখে বিস্ময়, নয়নতারার দৃষ্টি বিস্ফারিত। জ্যোতিষবাবুই প্রথম কথা বললেন, "অবিশ্বাস্য রকমের জটিল অবস্থা, সমাধানের কোনো পথ আদৌ আছে কিনা কে জানে!" নয়নতারা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষের, এটাই যদি শুরু হয়, তাহলে না জানি এই নাটকের মধ্য অংক এবং শেষ দৃশ্যে কি আছে! আগ্রহ বেড়েই গেল।" একটু থেমে কিছু একটা ভেবে আবার বলল, "এখুনি মনে হয় শচীনবাবুর জন্যে আগাম দুঃখ প্রকাশ ক'রে রাখা যায়।" জ্যোতিষবাবু জানালেন, "শুধু শচীনবাবু কেন, আমার তো মনে হয় সবাই মিলে একটা ভরাডুবির দিকে চলেছে। সকলের জীবনে—বিশেষ করে দুই কন্যা ও তাদের পিতার জীবনে ট্রাজেডি ওত পেতে বসে আছে।" নয়নতারা চেয়ারে গুছিয়ে বসতে বসতে বলল, "দ্বিতীয় অংক প্রথমদৃশ্যে নিয়ে চল, দেখা যাক ঘটনা কোন্‌দিকে মোড় নেয়।"

দ্বিতীয় অঙ্ক : ইতির পর ইত্যাদি

তনিমার আগমন বার্তাটি ঘোষণা করার অবকাশ পেলেন না শচীনবাবু। টেলিফোনে কথাবার্তা চলার সময় বিমল কাছেই ছিল। উৎকর্ণ হয়ে শচীন-

বাবুর কথাবার্তা শুনলো, প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করল। শান্তভাবে সমস্ত কিছু বুঝে নেবার আগেই উত্তেজনা বোধ করা তার স্বভাব। এ-বারেও তার ব্যতিক্রম হল না। বিব্রত শচীনবাবু চেয়ারেই বসেছিলেন। বিমল সামনে এসে উত্তেজিত কণ্ঠে বললো—তনিমার ফোন নিশ্চয়ই, কি বলতে চায় সে ?

শচীনবাবু তনিমার বক্তব্য বলতে গেলেন। কিছুটা বলতে পারলেন, বাকিটা বলার মাঝখানেই বিমল বাধা দিয়ে তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে বসলো—এখানে সে আসছে গোছানোর জন্যে, ঘোঁট পাকানোর জন্যে। বলতে বলতেই বিমল দপ দপ করে পা ফেলে নিজের ঘরের দিকে চলে গেল।

একদিকে মেয়ের, তনিমার, উদ্দেশ্য বিষয়ে দুশ্চিন্তা অন্যদিকে ছেলের তীব্র বিরূপ প্রতিক্রিয়া —দুইয়ে মিলে যেন শচীনের তাৎক্ষণিক মানসিক দ্বন্দ্বকে প্রায় একটা সংকটের চেহারা দিয়ে ফেলল। শচীন কোনও কাজ করতে গেলে তিন ধরনের ভুলের সম্ভাবনাকে সামনে রাখে—ভুল দিকে ভুল করা, সঠিক দিকে ভুল করা এবং অবিমিশ্র ভুল করা। সে সবসময়েই চেষ্টা করে সঠিক দিকে ভুলটি করতে, যদি ভুল করতেই হয় এবং যদি ভুল ছাড়া কোনও বিকল্পই না থাকে। এ-ক্ষেত্রেও সে সেই বিব্রত অবস্থাতেও ভেবে নিয়েছিল যদি মেয়ে অনুশোচনায় পড়ে থাকে, যদি পিতৃগৃহ কিছুদিনের জন্যেও অনিবার্য বলে মনে করে থাকে, যদি এমন হয় যে তনিমার আসার প্রস্তাব নাকচ করে দিলে বা বিলম্বিত করে দিলে—'পরে জানাব' বললে—আর একটা অপঘাতের সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেওয়া হয় ? শত হলেও তো তনিমা শচীনেরই কন্যা, এবং মাতৃহীনা! তাই যদি ক্ষতি করার বাসনাতেই তার এই এখন আসার মনটি তৈরি হয়ে থাকে, যদি অশান্তির বীজ উপ্ত করাই তার ইচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলেও শচীনের সামনেই ঘটবে; সে অন্তত প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারবে। দুদিন, দুবছরের জন্যে সম্পর্ক ছেদ হয়ে থাকাটা তো আর চিরদিনের ব্যাপার নয়। একটা জীবন কতো দীর্ঘ, কতো বাঁক. কতো মোড়, কতো উত্থান-পতনের সে প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে সামনের পথ করে নেয়। তাই শচীন বাধা দেয় নি; চলে আসায় সম্মতি দিয়েছিল।

কিন্তু ক'দিনের মধ্যেই সেই টেলিফোন খবর বিমলের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে দাবানলের আকার নিল। তনিমার আর একটা চিঠি ইতি মধ্যে শচীনের হাতে এলো। বিমলকে সেই চিঠিখানাও শচীন দেখাল। সেই চিঠির সুরে নরম, স্নেহভরা অপেক্ষিত একটা মনের প্রকাশ আগাগোড়া ছড়িয়ে ছিল।

শচীন মনে করেছিল এই চিঠির প্রভাবে বিমলের মনের আগুন কিঞ্চিৎ হলেও প্রশমিত হবে। কিন্তু দেখা গেল সিদ্ধান্ত ওরা করেই ফেলেছিল। বিমল বেশ পরিষ্কার করে, একেবারে অঙ্কের ধাপের মতো ঝরঝরে করে ওদের সিদ্ধান্তের কথা শচীনকে জানিয়ে দিল।

এক, আমরা (বিমল, বিমলা এবং তংকা (—ওদের এক বছরের ছেলে) রবিবার ভোরেই (তনিমা আসার আগেই) মেদিনীপুরে চলে যাবো, বিমলার বোনের বাড়িতে।

দুই, রাধুনী মেয়েটিকে আমাদের চাই না। যদি অনিমা রাখে তো রাখতে পারে। (অনিমা শচীনের বড় মেয়ে। এই মেয়ের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক ওরা এখন আর স্বীকার করে না)। আমরা আলাদা হয়ে যাবো।

তিন, তুমি (শচীন) ইচ্ছে করলে আমাদের অংশে থাকতে পারো।

চার, —বাড়ির ঝি আমাদের থাকবে ; অনিমার ব্যবস্থা অনিমাকে করে নিতে হবে।

পাঁচ, তনিমাকে অবশ্যই চৌদ্দ দিনের মধ্যে বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে কারণ তখন আমরা গৃহে ফিরবো। ইত্যবসরে বিমলা তার কাকিমা ও মায়ের ওখানে কাটাবে, আমি কাকার বাড়িতে এবং অন্যান্য স্থানে থাকবো—এখানে থাকবো না কারণ তনিমা এখানে থাকবে।

ছয়, আমার অংশে তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করে রেখে যাবো, স্বতন্ত্র রান্নার যাবতীয় বন্দোবস্ত সেরে রেখে যাবো। সংসারের টাকার অবশিষ্ট অংশ তোমাকে (শচীনকে) দিয়ে যাবো।

শচীন অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় ছেলের কথাগুলো উপলব্ধি করার চেষ্টা করছিল। সে ছেলেকে বলেছিল ঃ এক, যা স্বাভাবিক এবং উচিত বলে মনে করবে শচীন তাই করবে। দুই, অনুরোধ করেছিল দ্বিতীয় চিন্তা দিয়ে অন্তত তনিমার ব্যাপারটা ভেবে দেখতে। কেন সে আসছে সেটা জানার পরে যে কোনও সিদ্ধান্তই বাস্তব হত, অনুমানের উপর ভিত্তি করে আগে থেকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সঠিক হয় না। তিন, জানতে চেয়েছিল বিমলের সকল চিন্তা-বিশ্লেষণ-সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিমলা একমত কিনা, এবং চার, সব ইতিহাস স্মরণ করেও, বিবাহিতা কন্যার পিতৃগৃহে আসার বাসনায়, দাদার কাছে কটা দিন থাকার ইচ্ছাটায় এতটা রূঢ় ভাবে আঘাত দেওয়াটা নিতান্তই সমীচীন কিনা। বিমল এক কথায় সব শেষ করে দিয়েছিল ঃ অপ্রত্যাবর্তনীয় বিন্দু ; ভাবনার

কিছুই নেই, দ্বিতীয় চিন্তার কোনও অবকাশ নেই, কোনও প্রয়োজন নেই কারণ সে অত্যন্ত বাস্তব, শচীনের মতো যুক্তির দ্বারা অথবা দার্শনিক বিচারের দ্বারা সিদ্ধান্ত করে না ; ঘটনাই তার পথ প্রদর্শক ! নিজের পরিবারের স্বার্থই তার লক্ষ্য ।

শচীন অনেক চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণের প্রয়োগ করে পুত্র বধূ নির্বাচন করেছিল । মনে তার দৃঢ় আশা ছিল বিমলা তার আশা পূরণে সক্ষম এবং যোগ্য । ধীর শান্ত এবং চিন্তাশীল ব'লে মনে করেছিল বিমলাকে । বিমলার পরিবার, পরিবারের বন্ধন, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সবই বিচার করেছিল । বিমলকে মানসিক সমতায় স্থিত করতে পারবে বলে বিমলার উপর অসীম আশা ছিল শচীনের ।

বিমলার শাশুড়ি নেই ; তাই শচীন বিমলার সেই অভাবটুকু সহনীয় করার চেষ্টার ত্রুটি করে নি । সঙ্গ দিয়ে, উপহারের যোগান দিয়ে, টুকটাক্ কাজে সহায়তা করে এবং গল্প আর আড্ডায় একদিকে বিমলার একাকিত্বকে মুছে দিতে চেয়েছে অন্যদিকে সংসারকে সুন্দর এবং আনন্দময় করে গড়ে নিতে সময় দিয়েছে । বিমলা যে একমাত্র তার পুত্রের স্ত্রীই নয়, এই গৃহের গৃহিনীও বটে সে বিষয়ে বিমলাকে অবহিত করেছে, সেই অধিকারকে আত্মস্থ করে নেবার অনুরোধ জানিয়েছে ।

কিন্তু আজ যখন সময় এলো সেই গৃহিনী হবার, বিমলকে ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করার তখনই বিমলা হেরে গেল ; অথবা সে নিজেকে অযোগ্য বলে প্রমাণ করে ফেলল ; অথবা সে সেই চেষ্টা করল না । তার এই অক্ষমতা এই নীরবতা যা বিমলের হঠকারিতাকে সমর্থন করারই নামান্তর তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক । হেরে যাবার তার কোনও কারণ ছিল না ; কিন্তু সে হেরে গেল । শচীনের মনে অসীম দুঃখ জমে উঠলো । সে কি নির্বাচনে ভুল করেছিল ? বিমলা কি স্বামীর মনের স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের স্বার্থটুকুর ক্ষতির সম্ভাবনাকে প্রধান বলে ভেবেছিল ? সে কি চেষ্টা করেছিল ? সে কি চেষ্টাই করে নি ? প্রায় তিন বছর পরে এই যে গৃহ-কেন্দ্র থেকে প্রস্থান, এই বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে যাবার প্রবণতা এটা কি ভবিষ্যতের পদধ্বনির সূচনা মুহূর্ত নয় ? শচীন আজ এই যে ভাঙ্গনের কর্কশ পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছে সে কি অনিবার্য ছিল ? ভাঙ্গন অনেক গভীর হবে কারণ এখানে ভাঙ্গন পিতা-পুত্রের মধ্যে, ভ্রাতা-ভগ্নীর মধ্যে, সংসারের

একেবারে কেন্দ্র বরাবর এই ফ্যাটলটিও তৈরি হয়ে গেল প্রধানত বিমলার অনবধানতায়, অযোগ্যতায়। শচীনের সামনে সময় নেই, বার্ধক্যের শ্বারে দাঁড়িয়ে অবসর জীবনের অবশিষ্ট সময় টুকুকে পার করা এখন শচীনের উদ্দেশ্য; সেই সময়টুকু যদি শান্তিতে কাটান যায় তাহলেই আর কোনও অভিযোগ থাকে না। কিন্তু বিমল- বিমলার এখন জীবনের শুরু; এখন যদি ওরা সময়কে কাজে না লাগায় তাহলে সময় ওদের ক্ষমা নাও করতে পারে; ওদের সামনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে বসে আছে। যে বীজ ওরা উপ্ত করছে, করবে, সময় ঠিক সময় মতো তার ফসলটুকু ওদের হাতে অনিবার্য তুলে দেবে। শচীনের দুঃখ, এবং ভয়ও, ঠিক সেখানেই।

বোনের সঙ্গে ওরা এক সঙ্গে থাকবে না, পাশাপাশি থাকতে চায় না এবং মুখদর্শনও করতে অনিচ্ছুক! এটা কি পলায়ন? এটা কি এড়িয়ে যাওয়া? এটা কি নিজেদের মূল্যে শচীনকে শাস্তি দেওয়া? মেদিনীপুরে বোনের বাড়িতে যাওয়াটা অনিবার্য ছিল না; কিন্তু গেল ওরা স্বগৃহ থেকে সরে যাবার সমূহ বাহানা হিসেবে। স্বামীর বোন থেকে দূরে সরতে স্ত্রী গেল নিজের বোনের শ্বশুরবাড়ি!

অনিমার শত অপরাধ, সহস্র অন্যায়; অনিমা ওদের চক্ষুশূল; বিমলার বাপের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে নাকি সম্ভ্রম আব সম্প্রীতি রাখে নি। খুনীর শাস্তি বিধানের আগে বিচারক খুনীকেও তার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ দিয়ে থাকেন। তনিমা খুন করে নি; একটি হুমকি দিয়েছিল মাত্র। সেতো হল প্রায় দেড় বছর। তনিমা সংগ্রহের বাসনায় বাবার কাছে আসে; এবং এবারেও আসছে। যদি তাইই হয় তাহলেও তো সে সমস্যা বাবার; দাদার বা বৌদির নয়! বাবার ক্ষমতা থাকলে দেবে, সে তো ছেলের অংশ থেকে কেটে নিয়ে মেয়েকে দেবে না। এ-কথাটা শচীনের ভাই একদিন শান্ত অবকাশে বিমলকে বোঝাতে চেয়েছিল—যদি অনিমা গুছিয়ে নিতেই আসে এবং পায়, তাহলে তাতে তোমাদের কি যায় আসে? সে আরও বলেছিল—পুরো ব্যাপারটাতে তোমাদের দ্বিতীয় চিন্তা দেওয়া উচিত, মনে হয় বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়াটা সঠিক হবে না। ওরা শোনেনি। চলেই গেল। বলে গেল—দ্বিতীয় চিন্তার কোনও অবকাশই নেই।

রবিবার ভোর পৌনে পাঁচটায় ওরা চলে গেল। শচীন বলে রেখেছিল ঘুম থেকে তুলে দিতে। সে তাংকাকে কোলে করে নিচে পর্যন্ত দিয়ে এলো।

দরজায় তালা লাগিয়ে গেছে ওদের অংশে। এবং চাবিটা সঙ্গে করে নিয়ে গেল! পরে ঘরে এসে শচীন দেখল টি. ভি ক্যাবিনেট থেকে ভি. সি. পি. টাও বিমল সরিয়ে ঘরে রেখে গেছে! চাবিটা শচীনের কাছে রেখে যেতে পারে নি। কেন? বিশ্বাসের অভাব? সুরক্ষিত হবে না ওদের সম্পদ? চাবি রেখে যাওয়া একটা সম্মান দেওয়া নয়? সেই সম্মানটুকু থেকে বঞ্চিত করার সচেতন ইচ্ছা? অবচেতন বাসনা? শচীন বুঝতে পারে না কেন এমন হয়। কেন এমন হল!

শচীনের জীবনে এখন বিকেল। এই বিকেলের সংসার আকাশে এটা কি সিঁদুরে মেঘের ইঙ্গিত নয়? ঝড়ের লক্ষণ? ধ্বংসের পূর্বাভাষ? এখুনি ওরা ফিরে এলে যে তাণ্ডবের আভাস বিমল দিয়ে গেছে, যদি তনিমা তখনও এ-বাড়িতে থাকে তা স্মরণ করে সাতদিনের মাথায় তনিমাকে শ্বশুরবাড়ি চলে যেতে বলেছে শচীন। ব্যবস্থাও সেই মতো করে দিয়েছে। তনিমা এই সংসারের সদস্য নয় আর, যদিও সে শচীনের মেয়ে। অনিমার স্বতন্ত্র কোনও সংসার নেই; সে বিবাহিত সংসারের বিরোধী। তাই সে থেকেই যাবে। বিমলের ঘোষণা মতে সে আলাদা থাকবে। শচীন যে কোনও সংসারেই থাকতে পারে।

তনিমার আসার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে যে বিস্ফোরণ ঘটে গেল, বা ঘটার উপক্রম হল তা কি অনিবার্য ছিল? বৃহৎ জীবনের প্রেক্ষিতে এই সাত-আটটা দিন, বা যদি এক মাসই হত, কতটা মূল্য ধরে, কতটা মূল্য এর প্রাপ্য ছিল? আর ঘটনার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় কী অসীম মূল্যেই না ধরতে চলেছে! শচীন কি করতে পারতো? সে তার চিন্তা ভাবনা এবং মানসিকতাকে অনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করে বিমলকে বলেছে। কাজ হয় নি বিন্দুমাত্র। বিমলাকে, বিমলের সামনেই, দ্বিতীয় চিন্তা দিতে অনুরোধ করেছে, গৃহিনীর ভূমিকার দায় পালন করতে বলেছে, কিন্তু সবই বিফল হয়ে গেছে। জীবনটাই যেখানে একটা মানিয়ে চলার দীর্ঘ ইতিহাস, সেখানে এই ক্রান্তিয় সিদ্ধান্ত কতোটা স্বাভাবিক, কতোটা কাঙ্ক্ষিত, কতোটা প্রার্থিত?

শচীনের গৃহে, তার সর্বসত্ত্ব বর্তমানেই, যদি বিমল এতোখানি স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারে, নিজের অংশে তালাদিয়ে চাবিশুদ্ধ চলে যেতে পারে, এবং শচীনের মেয়ে কদিন থাকতে পারবে সে বিষয়ে নির্দেশ জারি করে যেতে পারে—'আল্টিমেটাম' দিতে পারে—তাহলে সে কি শচীনের ব্যক্তিত্বকেই

অস্বীকারের মতো হয় না, তার অধিকারকে পদদলিত করার সামিল গণ্য হয় না ? বিমল-বিমলার চিন্তার দিক্-নির্ণয়-কাটাটি কোন্ দিক্ নির্দেশ করছে ? বাবা যদি কন্যাকে, কন্যাদ্বয়কে ত্যাগ না করে তাহলে বাবাই ত্যাজ্য—এটাই নির্দেশ করছে না কি ?

এই পুত্রকে শচীন কি দেয় নি ? এই পুত্র বধূকে অর্থে-সমাজে-মনে অঢেল দিয়েছে এই স্বল্পসময়ে। কিন্তু এতো মাৎসর্য কেন ? এই অসহ্য মন ওদের তৈরি হবে কেন ? এই স্বল্প তিন বছরের বিবাহিত জীবনে ওদের কোনও ঝড়ঝাপটা পোহাতে হয় নি, সর্বপ্রকারে ওদের দ্বৈত জীবনকে সুস্থ এবং প্রাণময় রাখার জন্যে শচীন সর্বপ্রযত্ন করেছে। এমন কি অনিমাকে অনেক কষ্ট এবং যন্ত্রণা পর্যন্ত সে দিয়েছে । সে সব অনিমা নিজের ব্যবহারের জন্যে, চিন্তাভাবনা এবং তার প্রকাশের দৈন্যে বা ধৃষ্টতায়, অর্জন করেই নিয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু তো অন্যরকম হতেই পারতো। তা হয়নি।

এবারে শচীনকে যে দ্বিতীয় চিন্তা দিতে ওরাই বাধ্য করল ; সব কিছুকেই আবার নোতুন করে ভাবতে বাধ্য করে দিল। ওদের জীবনের প্রবেশ সময়ে আর শচীনের বিদায়ের পর্ব শুরুর সময়ে এই যে দ্বন্দ্বটি সমূহ হয়ে উঠলো এর তাৎক্ষণিক এবং সুদূরপ্রসারী ফলাফলগুলির দায় দায়িত্ব কে বহন করবে ? সেই শক্তি কি শচীনের আছে ? অন্যথা শচীনকে এতো আগে থেকেই নিজের শবদেহ বহন করতে শুরু করে দিতে হয় যে !

এই অবস্থানে দাঁড়িয়ে শচীনের সামনে কি কি বিকল্প খোলা ছিল ? কিছু করতে গেলেই, সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই, শচীনকে ভুল করতে হবে, এবং মজা এখানেই, কোনও সিদ্ধান্ত না নিলেও ভুল করতে হবে। সিদ্ধান্তহীন অলস নির্জীব মেনে নেওয়া শচীনের পক্ষে মৃত্যুর সমান হবে ; কারণ সে ক্ষেত্রে ঔচিত্য মার খাবে, ব্যক্তিত্ব বধ্বস্ত হবে এবং অবশিষ্ট জীবন নিজের ক্রমশ-জীর্ণ দেহখানি এবং ক্রমশ দুর্বল মনটিকে 'কাঁধ' দিয়ে ফিরতে হবে। অন্যায়ের সঙ্গে আপস করতে গেলে অন্যায় বেড়েই চলে, মর্মবেদনা গাঢ় হতে থাকে এবং জীবনে নির্ভর করার মতো কোনও সত্যই আর হাতড়িয়ে পাওয়া যায় না। তাই উদ্ভিদ-জীবন যাপন কোনও জীবনই নয়, পরাভবমাত্র। ব্যক্তিত্বের অপঘাত, চিন্তার অপমৃত্যু এবং উপলব্ধির উদ্বন্ধন ; শচীন সেই ভুল যা অবিমিশ্র তা থেকে বিরত থাকবে।

এ-ছাড়া আর বিকল্প ? পুত্র-পুত্রবধূর সঙ্গে থাকা এবং মেয়েদের চিরতরে

অস্বীকার করা। পুত্র হিসেবে সামাজিক-মানসিক যে অধিকার—পুরুষ শাসিত সমাজের প্রদত্ত যে অধিকার—সেই অধিকার ঐতিহাসিক সত্য হলেও জাগ্রত চেতনার কাছে, যুক্তির কাছে অসত্য ; ছেলে মেয়ে সমান এটাকে শচীন কোনও স্লোগানের জন্যে মান্য করে না ; সমান তারা স্ব স্ব যোগ্যতার জন্যেই। এটা একটা সার্বিক তত্ত্ব ; তথ্যের, ঘটনার বা ইতিহাসের জীবন্ত প্রেক্ষিতে প্রতিটি সন্তান নিজ নিজ গতি পথ এঁকে দেয় পিতার-মাতার সংসারের বুকের উপর, বুকের অভ্যন্তরে।

এখন শচীনের বিচার্য হল এই পুত্র-সঙ্গ-কন্যা-বিসর্জন ব্যবস্থাটি কতটা ভ্রান্ত হবে ; এবং সেই ভ্রান্তি কোন প্রকারের ভুল বলে মান্য হবে ? পুত্রকে শচীন কখনও আঘাত দেয় নি, কখনও বিমল বিমলার ইচ্ছাকে অসম্মান করে নি, সর্বদাই সচেষ্ট থেকেছে যাতে ওদের জীবন সুন্দর আর সহজ হয়ে ওঠে। অনেকখানি এগিয়ে গিয়েও এ-কাজ শচীন গত তিনবছর ধরে করেছে। এই করতে গিযে সাধারণ, গতানুগতিক দৃষ্টিতে হয়ত অনেক বেশি বেশিই করা হয়ে গেছে, তা সত্ত্বেও আজ বিমল বিমলা এক লহমায় শচীনকে অস্বীকার করতে পারল, শচীনের মনের অনুভবকে কোন মূল্যেই দিলনা, শচীনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা গভীর চিন্তাশক্তি এবং ন্যায়ের অনুভব এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, বলা যায়, ওদের জীবন থেকে একেবারে বাতিল বলে ঘোষণা করে গেল। পিতার অনুরোধ পুত্র এবং পুত্রবধূকে এতটুকু নম্র নত অনুভবে স্নাত করতে পারল না। এই বিকল্পে যে ভুল হবে তা আত্মহত্যার মতো।

অন্য বিকল্পটি অনিমার সঙ্গে থাকা। এখানে অবশ্যই একজন রাঁধুনী অনিবার্য হবে। সুতরাং খরচা বাড়বে। বিমল-বিমলার সঙ্গে 'টেনশন' বাড়বে, অনিমার জীবনে নোতুন প্রাণের সঞ্চার হবে, তনিমা জানতে পারলে একধরনের ঈর্ষা মিশ্রিত তৃপ্তিব রোদে স্নান করতে সুযোগ পাবে! পুত্র এখানে তার অংশে থেকে অশান্তির চেষ্টা করতে অথবা গৃহত্যাগ করে কলকাতা বা অন্যত্র চলে যেতে পারে। একই মেঝেতে দুটি সংসার—একটি পিতার অন্যটি পুত্রের—এ বড়ো বিষম ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াবে। অনিমা হাতে স্বর্গ পাবে, বিমল গৃহকে নরক করে তুলতে চাইবে। বিমলার রূপটি কি হবে তা শচীনের কল্পনায় ধরা দিতে পারছে না। যেটুকু দেখা গেল এই তনিমাকে কেন্দ্র করে তাতে মনে হয় গতানুগতিক স্ত্রী হয়েই প্রকাশ পেতে থাকবে সে। এবং রোজ রাত্রে এবং সব রবিবার গুলোতেই দিনান্ত ও সপ্তাহান্ত 'রিপোর্টিং'

পর্যান্তে সাংসারিক কলহ-কোন্দল উত্তরোত্তর তীক্ষ্ণ হতে হতে ঝালায় এবং জ্বালায় পৌঁছবে ! গোটা সংসারটাই কাকের বাসা হয়ে দাঁড়াবে ; শচীন তখন সরে গিয়ে, দূরে গিয়ে শান্তির অন্বেষণে সময় কাটাবে। কখনও সাময়িক, কখনও দীর্ঘমেয়াদী। এই করতে করতে হয় বিমল-বিমলা দূরে স্বতন্ত্র গৃহে চলে যাবে, নয়তো শচীন গৃহত্যাগ করবে। স্বার্থ বড় বালাই ; অর্থ সব অনর্থের মূলে। এই সত্যের দিকনির্দেশে পুত্র এবং কন্যা উভয়েই যদি পিতৃ সম্পদের অংশের তাড়নায় শিকড় গেড়ে বসে যায় তাহলে উকিলেমোক্তারে ওদের চুষে ভূষি করে, ছিবড়ে করে ছেড়ে দেবে। লাভের মধ্যে হবে অশান্তি, নিঃস্বতা !

তৃতীয় বিকল্প ? শচীন এখুনি গৃহত্যাগ করবে ? সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারা করে দেবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ? তাহলে তো বিক্রি করে দিয়ে চলে যাবে যে যার পথে। শচীন থাকবে কোথায় ? রসদ পাবে কোত্থেকে ? তার চাইতে বড় কথা সারাজীবনের সংগ্রহকে, সেই সতেরো আঠেরো বছর বয়স থেকে শচীনের দেহ-রক্ত জল করা সংগ্রামের সংগ্রহকে এমনি করে সন্তানদের লোলুপতার শিকার করে ছেড়ে দেওয়াটা কি শচীনের পক্ষে সম্ভব ? এবং, এ-ছাড়া শচীনের এখনও অনেক কাজ বাকি। সেই সব করতে হলে তার এখনও বার্ধক্যের পুরো প্রথম পর্বটি সম্পূর্ণভাবেই কাজে লাগাতে হবে। এবং সে কাজ স্বগৃহেই সম্ভব হবে ; অন্যত্র গিয়ে নয়, সন্ন্যাস নিয়েও নয়।

সুতরাং শচীন যেটাই করবে সেটাই ভুল হবে ; এই ভুলের কারণ তার সন্তানদের মনোভাব, স্বার্থবোধ, ব্যক্তিত্ব। শচীনের পক্ষে কোন্ বিকল্পটি সঠিক দিকে ভুল করা হবে ? কে বলে দেবে ? শচীন ঝুঁকে আছে দ্বিতীয় বিকল্পের দিকে ; মনে মনে সে এই বিকল্পকেই 'সঠিক দিকে ভুল' বলে মনে করছে এখন। এক ধরণের অবস্থা এবং ঘটনা পরম্পরা এই মানসিক পট-পরিবর্তনকে সম্ভব করে তুলেছে ; এখন ওরা, বিমল বিমলা—যখন ফিরে আসবে এবং আরও ঘটনা ঘটতে থাকবে তখনই একমাত্র জানা যাবে কি কি ভুল শচীন ঠিক ঠিক ভাবে করতে পারে। সব কিছু এখন 'মেল্টিং পটে', টগবগ ফুটছে। ভৌত রাসায়নিক এবং মানসিক রং-রূপ-প্রকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কি ঘটবে আর কি ঘটবে না তা শচীন তো দূরের কথা দেবতারাও জানেন কিনা তা সন্দেহের !

তাহলে? তনিমার ইতি-ঘোষণার পরে বিমলের 'ইত্যাদি'র চাবুক পড়েছে। ভবিষ্যৎ কোন 'পুনশ্চ' বয়ে আনবে কে জানে? সুতরাং পরবর্তী আকর্ষণ 'পুনশ্চ'-এর জন্যে শচীন অধীর অপেক্ষায় সময় কাটাতে বাধ্য!

এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলে আমি মনে মনে এক কাপ চায়ের কথা ভাবছি আর তখনই অমি ট্রে হাতে কাছে এলো। নয়নতারা বলল, "একটু গলা ভিজিয়ে নাও।" জ্যোতিষবাবু বললেন, "শচীনবাবুর সংসার যে একেবারে ভার্টিক্যালি চৌচির হতে চলল।" আমি বললাম, "এহ বাহ্য; অপেক্ষা করুন। ঘটনাকে আরও আগে যেতে দিন।" সকলেই আপন মনে চায়ে মন দিল। চা পান শেষ হল। একটা সিগারেট ধরালাম। তার পরে বললাম—

তৃতীয় অঙ্ক ঃ পুনশ্চ ঃ

কথায় বলে 'যেখানে ভূতের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়!' শচীনের সংসার জীবনে সেই রাত সমাসন্ন। স্মরণযোগ্য চল্লিশ-একচল্লিশ বছরের মধ্যে এমন রাত শচীনের জীবনে বহুবারই এসেছে এবং পার হয়ে গেছে। ভূতের ভয়, ভূত বা অতীত হয়ে যাবার ভয়, বার বারই রক্ত চক্ষু হয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে; কিন্তু শচীনের ভবিষ্যৎ-কে তারা বার বার ঝাঁকুনি দিলেও ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারে নি; বরং সেই সব ভূতের ভয়গুলোই অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। আকাশের তারারা শচীনের রাত্রিকে দৃশ্যমান রেখেছে, চাঁদের স্নিগ্ধ আলো মৃদুহাস্যে তাকে সঙ্গ দিয়েছে, আর দিনের আকাশে নোতুন করে সূর্যকে শচীন খুঁজে পেয়েছে। অন্তরাত্মার গভীর থেকে শচীন বার বার খুঁজে পেয়েছে সামনে চলার পথে পথ দেখানোর আলোর প্রদীপখানি। তার মা শচীনের সমগ্র দেহ-মনের প্রসার মঞ্চে প্রদীপ হয়ে অবস্থান করেছেন, স্মৃতি-হয়ে-যাওয়া তার পিতার চেতনা সেই প্রদীপে প্রাণের সম্ভাবনাকে সজীব রেখেছে আর সর্বংসহা স্ত্রী সর্বদাই যুগিয়েছেন আলোর শিখাটি। তারা সকলেই আজ চলে গেছেন, চলে যেতে যেতে তাঁরা স্মৃতির ভাণ্ডারটিকে সম্পন্ন করে গেছেন, বর্তমানকে শূন্য করে গেছেন আর ভবিষ্যতের জন্যে আলো-আঁধারের আনাগোনার স্থান করে দিয়ে গেছেন।

কিন্তু যে অন্ধকার শচীনের জীবনে সমূহ হয়ে দেখা দিয়েছে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার স্বাভাবিক ছিল না, অনিবার্য তো নয়ই। কারণ এটা

প্রকৃতি-নির্দেশিত নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। আলোকে নিজে নিজে নিভিয়ে দিয়ে অন্ধকার তৈরি করে তার পর তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আমরা অনেকেই অদৃষ্টের উপর দায় চাপিয়ে দিয়ে থাকি। এটা যেমন সত্য তেমনি অন্ধকারের মধ্যে আলো জেবলে দিয়ে স্বচ্ছ-দৃষ্টি হয়ে উঠতেও তো পারি। সাত্ত্বিকগুণ আলোর পথিক ; তামসিক গুণ তমস-এর আসুরিক আহবান ঘটায়। শচীনের পরিবারে বর্তমানের পুত্র-প্রধান অবস্থানে, সেই তামসিক গুণের আবাহন চলছে। তাই অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তরই হয়ে উঠছে। বল্গাহীন যৌবন, সীমাহীন স্বাধীনতা আর আত্মউপলব্ধিহীন জেদ-অহংকার যৌবনকে বন্য আর হিংস্র করে তোলে। এমতাবস্থায় শচীনের পুত্র বিমল-এর জীবনে যে ভবিষ্যৎ সমূহ এ যেমন বেদনাদায়ক তেমনই ভয়াবহ : ভূত নয়, বিমলের ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকার রাত্রে শ্বাপদ-হিংস্র অ-দৃষ্ট ভয় ওত পেতে অপেক্ষা করে আছে। পিতার প্রতি শ্রদ্ধাহীন, মাতার স্মৃতিতে দীপান্বিত নয় আর স্ত্রী, বিমলা, স্বামীর চঞ্চলমতি ঘুড়িতে সর্বস্ব-নিয়োজিত নিবেদিত প্রাণ। তাই বিমল বল্গাহীন, সীমার বাঁধন হীন, দিশাহীন। ছন্নছাড়া অতিবাস্তবের তাড়নায় দিক্‌ভ্রষ্ট, দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানহীন। বিমল-বিমলা তাই শিবের অসাধ্য রোগে আক্রান্ত। মনের বাঘ ওদের জেদ মাৎসর্য আর অহংকারের জঙ্গলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে আর যাচ্ছে। রাতের তারা আকাশের চাঁদ আর দিনের সূর্য ওদের মিথ্যা হয়ে গেছে।

চার আগস্ট ভোর বেলায়, তনিমাদের আসার আগেই, বিমল তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে মেদিনীপুর চলে গেছিল। এটা আমাদের আগেই জানা হয়ে গেছে। কিন্তু জানা হয় নি সেই চার থেকে দশ আগস্ট ব্যাপী সাতটা দিনের যন্ত্রণা কান্না নির্যাতন আর নিষ্ঠুরতার কাহিনী! তনিমা আর্থিক কষ্ট, মানসিক একাকিত্ব আর প্রিয়জন অদর্শনের দীর্ঘ বেদনাবোধ থেকে মুক্তি পেতে মাস-খানেকের জন্যে পিতার কাছে, দাদা-বৌদির সান্নিধ্যে আর দিদির নৈকট্যে কাটানোর মানসে পিতৃগৃহে এসেছিল। পরিবারের বৃহত্তর স্বার্থে বিমল-বিমলার মানসিক শান্তি আর অকারণ জেদের পূরণে শচীন তার কন্যাকে সাতদিনের মাথায় স্বামীগৃহে ফেরত পাঠিয়েছিল। চোখের অনেক জল ঝরিয়ে, বুকের অনেক দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিশিয়ে অবশ নিঃস্ব দেহ মন নিয়ে তনিমা এ-যাত্রায় বিদায় নিল ; শচীন সংসারের সমূহ ভাঙন এড়াতে সময়ের সাহায্য নিতে চাইল। সময় তো সময় মতোই সব ঠিক করে দেয়, সকল বেদনার ক্ষত

ভরাট করে দেয় এই বিশ্বাসে।

বিমল ফিরে এলো। সাফল্যের পদভারে নোতুন 'টালি-বসানো' মেঝে ঝংকৃত হতে লাগল, সগৌরব উন্নত বক্ষে জয়ের মুকুট-শীর্ষ দেহভার শচীনের সামনে টানটান ধরে রেখে অনিমাকে আলাদা করে দেবার ঘোষিত ব্যবস্থার কতদূর কি হল জানতে চাইল বিমল। বিমল-বিমলা যখন ফিরে এলো তখন অনিমা বাড়িতে নেই, তনিমাকে শ্বশুর বাড়িতে রেখে আসতে গেছে।

শচীন শান্ত কণ্ঠে বিমলকে জানাল যে বিষয় এবং সমস্যা যেখানে রেখে তারা চলে গেছিল গৃহছেড়ে তা আর সেখানে নেই। ইত্যবসরে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, চিন্তা ভাবনায় অনেক আলোড়ন ঘটে গেছে, প্রত্যক্ষ আমূল পরিবর্তিত হয়েছে এবং সুতরাং সিদ্ধান্তে পরিবর্তন ঘটে গেছে। তাই বিমলকে শচীন জানিয়েছিল যে পৃথকান্ন হয়ে যাওয়াটা তো যে কোনও সময়েই বা দিনে ঘটানো যায় ; তাকে কিছুদিনের জন্যে স্থগিত রেখে একান্ন-বর্তী থাকা যায় কিনা তার জন্যে একটা শেষ চেষ্টা দিলে কেমন হয়। বিমল রাজি হতে চায় না ; শচীন সম্ভাব্য নববিন্যাসের ইঙ্গিত দিয়ে জানিয়ে দিল যে তার নিজের মনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং যাচ্ছে। শচীন কি করবে-না-করবে তা অনিশ্চিত, একমাত্র যা নিশ্চিত তা হল যা উচিত এবং স্বাভাবিক তাই সে করবে।

কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই বিমল আবার চেপে ধরল শচীনকে। "কি ঠিক করলে ?" শচীন মনে মনে ঠিক করেই রেখেছিল। কোনও পিতাই তার কন্যাকে ভাসিয়ে দিতে পারে না, অস্বীকার করতে পারে না, বিশেষতঃ সে যখন মাতৃহীনা অবিবাহিতা, পিতৃনির্ভরশীলা। পুত্র প্রথমত পুরুষ এবং দ্বিতীয়ত স্ত্রীপুত্র সহ সংসারী।তার জগত সেই আপনগণ্ডিতে সম্পূর্ণ। পিতা সেখানে অধিকন্তু উপস্থিতি মাত্র—আজ না হলেও কাল তা অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে। সবিশেষ, পুত্রের যে মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে এবং পাচ্ছে, সেই টেলিফোন পর্বের পর থেকে তাতে তার বিষয়ে দ্বিতীয় চিন্তা অনিবার্যই হয়ে পড়েছে শচীনের জীবনে। তাই অতীত-বর্তমান ভেবে, আর ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বিমলকে শচীন সিদ্ধান্ত জানাল :

এক, শচীন অনিমার সঙ্গে থাকবে, রাধুনী থাকছে (অনুসিদ্ধান্ত, বিমল বিমলা স্বতন্ত্র থাকবে)

দুই, এই ব্যবস্থায় বিমলের যদি কোনও প্রস্তাব থাকে তা সে দিতে পারে।

(অনুসিদ্ধান্ত, কলকাতায় চলে গেলে বা অন্যত্র স্থান মিলে বিমল কি চায়, কতো চায় তা জানানো ।)

তিন, কিছুদিন আবও সময় দিয়ে একান্ন থাকা যায় কিনা তা আর একবার পরীক্ষা করে দেখা । (অনুসিদ্ধান্ত, বিমল অনিমা নিজেদের মধ্যে কথা বলে, আলোচনা করে এ-ক্ষেত্রে ইতি-কর্তব্য স্থির করে নেবে । শচীন শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারে) ।

বিমল শচীনের এই পট-পরিবর্তনকে একটা সুকৌশল চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়া বলে ঘোষণা করল । একটা অন্যায় চাপ । প্রত্যক্ষভাবেই সে উত্তেজিত হল, ক্রোধ চেপে রাখল না এবং বারে বারেই 'আমরা-তোমরা' বিভেদ রেখাটি সোচ্চারে প্রকাশ করে ফেলতে দ্বিধা করল না । তারপর তিনবার নিজের শোবার ঘরে গেল এবং বেরিয়ে এসে একটার পর একটা প্রস্তাব দিতে লাগল । প্রস্তাবের উৎস বুঝতে শচীনের আর অসুবিধা রইল না ।

প্রথম বার : অনেক হয়েছে আর না ; তোমরা তোমাদের মতো আলাদা হয়ে যাও আমরা আলাদা থাকব । Partition করে দাও ।

দ্বিতীয়বার : তুমি সংসার চালাও, আমরা তোমার সংসারে থাকব ।

তৃতীয়বার : ছুটি ছাটা, শ্বশুর বাড়ি বেড়াতে যাওয়া ইত্যাদি আছে তাই পুজোর পরে যা হয় হবে । ততদিন যেমন চলছে তেমন চলুক ।

শচীন প্রত্যেকবারই বিমলের প্রস্তাব শুনছিল এবং তদনুযায়ী স্বীকৃতি জানাচ্ছিল । বিমল যে প্রকৃতিস্থ নয়, বিমলাব মতামতের জন্যে বার বার দিক্ পরিবর্তন করছিল তা বুঝতে পেরে কোনও প্রস্তাবেই বাধা দেয় নি । একটা থমথমে কালো মেঘ পরিবারটিকে চারদিক থেকেই ঘিরে ফেলল । সময় হলে মেঘ কেটে যাবে, যেতে পারে ভেবে শচীন সময়কেই খুঁজতে লাগল । সময় দিন-সপ্তাহ হয়ে সরে সরে গেল কিন্তু 'সময়ের' আর দেখা মিলল না ।

নিজের বলতে যা কিছু ছিল তার প্রায় সবই বিমল তার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলল, অপরের বলতে যা ছিল—অনিমার জন্যে তৈরি করা খাট—তা, বার করে শচীনের বেডরুমে জমা করে গেল, বিচ্ছিন্ন হবার সব ব্যবস্থা পাকা করে রেখাটিকে মোটা দাগে এঁকে দিল । প্রতিবার অনুপস্থিতির সময়ে ঘরে তালা ঝুলিয়ে চাবি নিয়ে চলে যায় । ওরা যেদিন সিমলার পথে বেড়াতে গেল সেদিন সকালে ওর পিসিমা এসেছিলেন । বাইরের ঘরে তাঁর শোবার ব্যবস্থা

হয় ; কিন্তু এবারেও ঘরে তালা দিয়ে ওরা চলে গেল ! কোথায় শোবেন ওদের পিসিমণি ? বাইরের ঘরটি খোলা রেখেও ওদের ঘর তালা দেওয়া যায় । কিন্তু না ! তা করে নি ।

খাবারের মেনুতে ক্রমশই টান পড়তে লাগল । যদি বিমলা একা পেরে ওঠে না বলে এমন হয়ে থাকে তাহলে শচীনের কিছুই বলার থাকে না । কিন্তু না । বিমল অতীতের কথা তুলেছে । সে বলেছে—শচীন যখন সংসার করেছে তখন বিমল আধখানা ডিম, একটা কলার চারভাগের একভাগ খেয়ে বড় হয়েছে এমনকি হলুদ দিয়ে মেখে ভাত খেয়েছে...তাহলে ? এখন শচীন তা পারবে না কেন ? বিমল তো তার নিজের আয়ের সীমায় খাদ্যের ব্যবস্থা করবে, অন্য কারো ভালো লাগা মন্দ লাগার নিরিখে নয় ।—এবং এ-সব কথা সে অবলীলায় বিমলার কাছে বিমলার সামনেই বলেছে শচীনকে । শচীন শুনেছে, সহ্য করেছে । কোনও প্রতিবাদ করে নি, কারণ তরে মনে হয়েছ এ-ধরনের ডাহা মিথ্যে বলার একটিই মাত্র কারণ থাকতে পারে । শচীনকে উত্তেজিত করে তোলা, তর্কে নামানো এবং তখন সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক দায় ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়বে বাড়ি থেকে । অর্থাৎ বাহানা বানানো !

বিমল যখন এই পৃথিবীর আলো দেখেছে তখন সে গেজেটেড্ পদমর্যাদা বিশিষ্ট অধ্যাপকের পুত্র । সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের চাইতেও তার আদর আপ্যায়ন স্বভাবতই বেশি ; কারণ মাইনের সঙ্গে বাড়ি ভাড়া বাবদ মাইনের প্রায় দ্বিগুণ পায় তখন । সে কলকাতার ঢাকুরিয়া-বালিগঞ্জ-নিউমার্কেটের জামাকাপড় প'রে অভ্যস্ত, সে 'ডনবস্কো' স্কুলে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে স্কুলের গাড়িতে যাতায়াত করেছে, তখনও 'butter' বলে খ্যাতি না পেলেও ডিম-মাখন-রুটি কলা সন্দেশ (ঘরে বানানো) তার tiffin-এ-গেছে, সুতির জামা সে পরেছে কম, পরলেও two-by-two ! এবং ইত্যাদি ! তাই কারো যদি ডাহা মিথ্যের আগ্রহ থাকে তাহলে বুঝতে হবে কারণ অন্যত্র লুকিয়ে আছে । প্রতিবাদ বিড়ম্বনা মাত্র ।

তবে বিমলের জন্মের আগেও শচীনের, স্বভাবতই, দীর্ঘজীবন অতীত হয়েছে । সেই জীবন সুখে-দুঃখে সংগ্রামে-সংঘর্ষে, প্রাপ্তিতে বেদনায় ছড়া-ছড়ি । কিন্তু তার সঙ্গে বিমলের যোগ কোথায় ? ইতিহাস মানুষকে জীবনের ভিত গড়তে সাহায্য করে ; বিকৃত ইতিহাসের উপর সুস্থ ভিত দাঁড়ায় না ।

যৌথ পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথম সন্তান বিমল। অফুরন্ত পেয়ে পেয়ে পাওয়াটাকে অত্যন্ত সহজ এবং স্বাভাবিক বলে মনে করে এসেছে। অধিকারের মধ্যে পড়ে বলে ধরে নিয়েছে। ঘি মাখন দুধের সর, পায়েস-নারু-ঘরের ছানা-সন্দেশ, ধবধবে পরিচ্ছন্ন জুতো জামা মোজা আর সকলকে ছাপিয়ে ঠাকুমার স্নেহ, মায়ের ভালবাসা, বাবা-কাকাদের হৃদয়-স্রোতের অঢেল আদর-নৈকট্য অনায়াস ঝরে পড়েছে বিমলকে ঘিরে। তাই প্রত্যেক পাওয়ার পিছনে যে একটা অর্জনের ব্যাপার থাকে, প্রত্যেক অধিকারের পিছনে যে একটা কর্তব্যের বোধ ওতপ্রোত মিশে থাকে তা বোধহয় ওর জানাই হয়ে ওঠে নি। কিন্তু কৈশোর পার হয়ে যৌবনে কলেজ জীবন শেষ করে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবন এবং পাড়া-পরিবেশ ছেড়ে অফিস-দপ্তরের প্রসারিত ক্ষেত্রে গিয়ে কি ও নিজের বলে কোনও অর্জন, কোনও অভিজ্ঞতা কোনও কর্ত্তব্যকে খুঁজেই পেল না? কে জানে!

বিমলের মধ্যে কিছুদিন যাবত একটা দ্বন্দ্ব চলছে। Western style এবং Eastern Culture-এর দ্বন্দ্ব। হাজার হাজার স্বামীস্ত্রী, বিমলের ভাষায়, যারা ওর মতোই মাইনে পায় তারা একাএকা স্ত্রীপুত্র নিয়ে সংসার করছে—বিমল পারবে না কেন? এখানে অ-প্রত্যক্ষও আছে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষও আছে; অবৈধ সামান্যীকরণ এবং hasty সিদ্ধান্ত আছে। সে থাক, দ্বন্দ্বের কথায় আসা যাক্। স্বামী-স্ত্রী, সন্তান নিয়ে মুক্ত-পরিবার পশ্চিমী আদর্শ; স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাস সেই সমাজে ঐ রকম একটা বাতাবরণ তৈরি করে রেখেছে। Dating-selection-marriage এর শেষ পর্বের আগেই পাখিদের মতো বাসা বাঁধা সেই সমাজে সবিশেষ স্বীকৃত। তাই সেখানে এটা আলো-বাতাসের মতোই স্বাভাবিক। ছেলের অভিভাবকের মনে কোনও প্রত্যাশার সুতো ছেঁড়ে না, মেয়ের অভিভাবকদের বিচার-বিবেচনায় কোনও ভবিষ্যৎ হাতছানি দেয় না। তাই সেখানে হারানোও নেই প্রাপ্তিও নেই।

কিন্তু আমাদের সমাজে ঘরের সঙ্গে বর, কনের সঙ্গে খানদান সবিশেষ জড়িত। পিতামাতা, সম্মান-সম্পত্তি, বর্তমানের সুরক্ষা আর ভবিষ্যতের সুস্থিতি আমাদের অস্থিমজ্জায় মিশে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক হবার সময় থেকে আর্থিক স্বাধীনতা ভোগের সময় পর্যন্ত এবং তার পরে বিবাহ-পূর্ব সময় ব্যাপী যে life-style তৈরি হয় তার পিছনে অভিভাবকদের ভূমিকা সদা স্বীকৃত, মান্য এবং সহজেই স্বভাবের গভীরে ব্যাপ্ত হয়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে

থেকে ব্যক্তি যখন নিজেকে ছিন্ন ক'রে Western style এর হাতছানি অনুভব করে তখন সেই সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জীবনে না থাকবে সুন্দর হয়ে ফুটে ওঠার মতো কোনও পটভূমি, না থাকবে প্রাতিনিয়তর আঘাত-সংঘাতের bad-blood শোষণকারী কোনও buffer ; তখন দিন যাপনের গ্লানি মন্থনের শেষে হলাহল হয়ে জমা হতে থাকবে কিন্তু নীলকণ্ঠের বিদায় তার অনেক আগেই জেদের ঢাক বাজিয়ে ঘটে গেছে ! দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তিতে বিড়ম্বনার পাহাড় জমে উঠবে। শচীনের ভয় এখানেই।

শচীনের দ্বিতীয় ভয় বিমলাকে নিয়ে। বিমলাকে বেছে আনার কারণ তার মধ্যে শচীন যোগ্য এবং উপযুক্ত একটি সম্পূর্ণ রমণীকে দেখতে পেয়েছিল। তার বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, সহ্য-স্থৈর্য্য আছে শিক্ষা-দীক্ষা আছে এবং আছে মানিয়ে নেবার এবং মানিয়ে চলার অসীম ক্ষমতা। এ-সব সত্ত্বেও সে তার potential গুণকে manifest করল না ; কারণ সে 'স্ত্রী' হয়ে থাকাটাই সহজ —line of least resistance বলে মনে করল, গৃহিনী হতে গেলে স্বামী-স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হয় বলে সে পথ সে ত্যাগ করল , নিজের যোগ্যতা আর ক্ষমতাকে সে নির্ভর করার মতো মনে করল না। তার এই পলায়নী মনোভাবের জন্যে, তার শান্তিতে শুধুমাত্র স্ত্রী হয়ে থাকার জন্যে সে নিজের, বিমলের এবং দুটি পরিবারের অশেষ ক্ষতি করে ফেলল, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতেরও।

আব বিমল বড়ই অভাগা ; এমন স্ত্রী পেয়েও সে সেই স্ত্রীকে সম্পূর্ণ করে তৈরি করে নিল না। তাকে খণ্ড-ছিন্ন করে নিজের জেদের মাপে কেটে-ছেঁটে পঙ্গু করে ফেলল। যে কাপড়ে কোট তৈরি হবার কথা বিমল-দরজী তাকে দিয়ে ফতুয়া বানিয়ে ফেলল ! ক্ষমাহীন অপচয়। সময় এবং ভবিষ্যৎ, বিমল এবং ওদের জীবন, বিমলকে ক্ষমা কবতে পারবে বলে মনে হয় না। সব কাজই তার মূল্য আদায় করে নেয়—সে ভাল কাজই হোক আর মন্দ কাজই হোক। বিমলকে তেমনি মূল্য চুকিয়ে দিতে হবে, দিতে হবে বিমলাকেও। এবং শচীনও বাদ যাবে কি ?

শচীনকে শেষ আঘাত হানার আগে বিমল-বিমলা আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে অত্যন্ত আপন জনেদের কাছে তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরেছে, ব্যাখ্যা করেছে এবং কোথয়ও বা মতামত নিয়েছে। বিমল তার শ্বশুর-শাশুড়িকে বাদ দিয়ে এতো বড় সিদ্ধান্ত নেবে না কারণ বিমলা সে-

ক্ষেত্রে অবশ্যই বাধা দেবে। বিমলার মা-বাবা দু'টি কারণে ব্যর্থ হবে ঃ এক, একপক্ষের বক্তব্য শুনেই তারা 'সত্য'-কে জেনে ফেলবে এবং দুই, স্বার্থচেতনায় তাদের পরামর্শ বিপথগামী হবে।

বিমল তাকেই প্রতিপক্ষ করে বসে আছে যে তাকে সঠিক পথের ঠিকানা দিতে পারত, তারই সঙ্গে আত্মসম্মানের প্রশ্নে 'যুদ্ধে' প্রবৃত্ত যে তার আত্মসম্মানের উৎস। আর তাছাড়া বিমল জানে যে শচীনই সমস্যা সমাধানে সক্ষম। জানে কারণ তার জানার হেতু আছে। কিন্তু সেই শচীনকেই সে যুদ্ধে আহ্বান করে বসে আছে। ব্যক্তিত্বের লড়াই ? ওদের বিয়ের পর থেকে দু-তিন বছর ওরা বলেছে—শচীনের মতো মানুষ হয় না, পিতা হয় না, অভিভাবক হয় না। আর তার পরেই ক্রমশ ধাপে ধাপে সেই শচীন 'লোকটা' হয়ে গেল, একপেশে অভিভাবক হয়ে গেল। কেন ? কিসের তাড়নায় ? Personality clash ? জেদ ? মাৎসর্য ? না-কি undivided ভালবাসার দাবি ? Sense of possession ? "বাবা আমার, তাতে বোনেদের, অন্যদের, কোনও ভাগ চলবে না !"—এই বোধ অবচেতন মন এবং তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা মানুষকে ভিতর থেকে তাড়িত করে অজ্ঞাতসারে অগ্নিসম্ভব দুর্যোগকে ভূমিকম্পের তীব্র লাভা নিঃসরণে পর্যুদস্ত করে দেয়। বিমল সেই অবচেতনের আগ্নেয়গিরির শীর্ষে অবস্থান করছে ; ভিতরের গুরু-গুরু ধ্বনি অপরে শুনতে পাচ্ছে, একমাত্র বিমল নিজে ধ্বংসের কিনারায় বসে বসে আত্মতৃপ্তির তপ্ত হাওয়ায় অহংকারকে তুষ্ট করে চলেছে ! অজ্ঞতা কেবলমাত্র ব্রহ্ম থেকেই ব্যক্তিকে দূরে রাখে না, সত্যকেই শুধুমাত্র অদৃশ্য করে রাখে না, অজ্ঞতা ব্যক্তিকে অন্ধ করে দেয়, নিজের কাছেই নিজেকে অস্পষ্ট করে তোলে। আত্মসর্বস্ব অহংকার এই অজ্ঞতার প্রধান বাহন ; বাহিত ব্যক্তি যন্ত্রণার রাজ্যে দুঃখের জঙ্গলে আর অন্ধকার ভবিষ্যতে headlong ধেয়ে চলে। শিবের অসাধ্য সেই গতি এবং গন্তব্য !

চতুর্থ অঙ্ক ঃ ভাঙনের শেষ ধাপে ঃ

রাস্তার আলো অনেকক্ষণই জ্বলে গেছে। আমরা তিনজনে একমনে শচীনের সংসারে বিমল বিমলাকে নিয়ে স্থানকাল প্রায় ভুলেই গেছি। এক ফাঁকে সুপ্রিয়া এসে সুইচ টিপে অন্ধকার থেকে আমাদের আলোয় এনে দিয়ে গেছে।

নয়নতারা বলেছে—"টিউব নয়, জিরো-টা অন করে দাও।" জ্যোতিষবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, "পিতাপুত্রের সংঘাতের কারণটা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার হল না এখনও।" নয়নতারা বলেছে, "শচীনবাবু এক দিকে মেয়েদের নিয়ে, আর অন্যদিকে ছেলেকে নিয়ে মহা মুশকিলে পড়ে গেছেন। ভাঙন যে অনিবার্য তা আর বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু যেটা বুঝতে পারলাম না তা এই যে বিমলা কি করল, কতটা করল।" আমি বলেছি, "শচীনও তো সেই প্রশ্ন করেছিলো আমাকে, বলেছিলো—'বলতো তপেন বিমলার রোলটা কি এবং কতখানি গভীর?' তা, আমার মাথায় অতশত ঢোকে না। বলেছিলাম, শ্লোকে যেমন স্ত্রী চরিত্র বিষয়ে দেবতাদের অজ্ঞতার কথা বলা আছে আর মানুষ কোন্ ছার বলে মত প্রকাশ করা আছে আমি সেই 'কোন্ ছারের' দলে। তবে শুনেটুনে যা মনে হয় তাতে বিমলার দশ আঙুলের সুতোয় ব্যাপারটা ঘটেছে বলে মনে হয় নি। মনে হয়েছে অন্য কোনও দশভুজার যোগ আছে।" জ্যোতিষবাবু জানতে চাইলেন, "আপনি কি বিমলার মার দিকে ইঙ্গিত করতে চান?" নয়নতারা বলেছিল, "এটা বুঝতে আবার প্রশ্ন করতে হয় নাকি?"

অনেকক্ষণই আমরা কোনও কথা বলছি না, এ-ঘর ও-ঘর থেকে টুকিটাকি শব্দ ভেসে আসছে। দুই বোনে মিলে যে রাত্রের রান্নাঘর সামলাচ্ছে তা বুঝতে বাকি রইল না। রাস্তায় দু'একটা রিক্সার প্যাঁক-প্যাঁক, পথচারীদের টুকরো টুকরো কথা ভেসে আসছে। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের একটানা সপরিবার সঙ্গীতের একঘেয়েমিতে তরুণ রাত্রিটুকু কেমন যেন আনমনা করে তুলেছে। নয়নতারাই প্রথম কথা বলে উঠলো। বলল, "কিন্তু কেন? বিমলা কেন এমন একটা নির্ঝঞ্ঝাট সংসার ছেড়ে চলে যেতে চাইল? সে কি শুধু অনিমার জন্যে? অনিমা চাকরি করে, ওদের ঘাড়ে বোঝা নয়। সকালে বেরিয়ে যায় রাত্রে ফেরে। নিজেকে নিয়েই তো ব্যস্ত। স্বাধীনতা? সে তো প্রথম থেকেই বিমলা পেয়ে গেল। বলা যায় শাশুড়িহীন শচীনের সংসার না বলে বিমল-বিমলার সংসারই ছিল। আর্থিক কারণেও তো নয় কারণ সেখানে তো শচীনের কোন অনটন ছিল না। ঘরের অভাব বা একান্ত জীবনের সুযোগের অভাবও তো ছিল না। নিজেদের স্বতন্ত্র অংশ ছিল এবং সেখানে তালা দিয়ে আলাদা করার ব্যবস্থাও ছিল।" নয়নতারার কথা বলার ধরন দেখে মনে হল সে নিজের মনেই কথা বলে বলে চিন্তাকে সাজিয়ে নিচ্ছিল। জ্যোতিষ-

বাবু বললেন, "তাছাড়া বিমলার বাপের বাড়ির লোকজন তো তেমন বেশি বেশি আসা যাওয়া করতো না বা থাকতো না যে বিমলা তাদের কথা ভেবে আলাদা হয়ে তাদের স্বাধীনতাকে বাড়িয়ে দেবার জন্যে এমন করবে।"

আমি বললাম, "ওদের শেষ অংকের দৃশ্যগুলো একবার দেখে নিলে হয় না ?" জ্যোতিষবাবু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন, "তাই বলুন, আগে সবটা শুনে নেওয়া যাক।" নয়নতারা একটু ইতিউতি তাকিয়ে অমিকে ডাকল। বলল, "আর একটু চা হলে কেমন হয়, ভাল হয় না ?" অমি এসে বলে গেল, "দিদি জল চাপিয়ে দিয়েছে আগেই। আমি নিয়ে আসছি।"

ওরা দুজনেই আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। আমি চায়ের কাপে শেষবার চুমুক দিয়ে কাপটা প্লেটে রেখে দিতে দিতে বললাম, "বিমল-বিমলা দশমীর দিন রাত্রে ফিরল। ওরা পুজোয় সিমলা বেড়াতে গেছিল, যাবার সময় ওরা ফেরার দিনটির কথা বলে গেল কিন্তু ট্রেন বা সময় বলে গেল না। শচীনকেও নয়, শচীনের ভাই, মেয়ে বা অন্য কাউকেই নয়, টেনশন অত্যন্ত তুঙ্গে তুলে ফেলেছিল বলে কেউই আর আগ বাড়িয়ে বিমল-বিমলাকে কোন কিছুই জিজ্ঞাসা করে নি—কি বলতে কি বলবে তার তো কোনও স্থিরতা নেই, অন্তত বিমলের পক্ষে !

সকালে আসবে, দশটা এগারোটার মধ্যে, এমনি একটা ধারণার উপর নির্ভর করে শচীনের ভাই সকলকেই তার ওখানে দুপুরে খাবার ব্যবস্থা করেছিল। বিমল-বিমলা ফিরে এলে তারাও দশমীর দিন একই সঙ্গে খাবে এমন ব্যবস্থা ছিল।

ওরা ফিরে এলো রাত তখন প্রায় দশটা। ঘরে দুধ থাকা সত্ত্বেও বাচ্চাকে জলে গুলে cornflakes খাওয়ালো ; হতে পারে অন্য কোনও কারণ ছিল। শচীনের মেয়ে অনিমা ওদের জন্যে খাবার রান্না করেছিল। শচীন সিঁড়ির শেষ ধাপে বাচ্চাটাকে বিমলার কোল থেকে তুলে নিয়েছিল। বিমল জানাল যে হয়তো একটু বাথরুম করিয়ে নিতে হবে। শচীন তাই গেল। প্রায় কুড়ি দিন তালা বন্ধ ঘরের গভীরে সেই যে বাচ্চাটাকে নিয়ে গেল আর বার করল না। পর দিন সকালে নাক দিয়ে জল গড়াতে লাগল। বাচ্চার কথা পরে বলা যাবে ; কিন্তু ওদের নির্বাক নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে সর্বক্ষণ থাকাটা স্বাভাবিক ছিল না। এতোদিন পরে এলো দু-দশ মিনিট এক সঙ্গে বসার ঘরে বসবে এটাই শচীন ভেবে ছিল। কিন্তু সে হয়নি।

খাবার টেবিলে শচীন সার্বিক মৌন ভঙ্গ করার আশায় আর যাকে বলে ice break করতে প্রথম কথা বলল : "তোমরা কাল কখন ট্রেনে চাপলে ?" বিমলাকে প্রশ্ন করল। বিমলা স্বাভাবিক কণ্ঠে উত্তর দিল : "প্রায় সাড়ে পাঁচটায়।" অনিমা জানতে চাইল "ডিলাক্স ট্রেনে এলে না কেন ?" বিমলা বলল, "ভীষণ ভিড় হয় ঐ গাড়িতে।" অনিমা তখন সকলের অপেক্ষার কথা জানাল, জানাল যে তারা সকলেই সকালের ট্রেনে আসবে ভেবেছিল, কাকার ওখানে দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল ইত্যাদি। এতক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ অত্যন্ত কর্কশ কণ্ঠে বিমল বলে উঠলো : "ভাবতে গেলে কেন ? জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতে !" বিমলের কর্কশ কণ্ঠে সকলেই চুপ করে গেল। একটা মৃদু হাওয়া বইয়ে দেবার চেষ্টাকে যেন গলা টিপে হত্যা করা হল। যে যার কাজে নির্বাক মন দিল, যান্ত্রিক হয়ে গেল বাকি সময়টুকু, উপস্থিতিগুলো, টুকটাক কাজগুলো। সবাই যেন অপঘাতে মৃত সময়টুকুর মৃতদেহ মৌন আত্মকেন্দ্রিকতায় বহনকরে চলল। বিমলের কোনও অনুতাপ দেখা গেল না, বিমলার থাকল না কোনও প্রকাশ। যে-যার ঘরে চলে গেল। শচীন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মন নিয়ে অধিক রাত কাটাল না ঘুমিয়ে, একটা সমূহ অস্বস্তির অনুভব নিয়ে।

পরদিন, শনিবার, অনিমা চলে গেল অফিসে, নিজের রান্নার অংশ সমাপন করে ; বিমলও গেল অফিসে। সারাদিন স্বাভাবিক থাকার অস্বাভাবিক চেষ্টা চালাল একদিকে শচীন অন্যদিকে বিমলা। শনিবার শচীন প্রায়ই দেরি করে খায় দুপুরে, কারণ বিমল আসে প্রায় দু'টো নাগাদ। স্বাভাবিক থাকতে সেদিনও তাই করল। একসঙ্গে তিনজনে খাবে বলে। কিন্তু খাবার টেবিলে সেই থমথমে ভাব বিমলের চেষ্টায় সর্বক্ষণই ঝুলে রইল। শচীন আর বরফ গলানোর চেষ্টা করল না সেদিন কারণ শুভের চাইতে অশুভের সম্ভাবনা বেশি ছিল।

বিকেলে বিমল-বিমলা বিজয়া দশমী করতে বেরিয়ে গেল। ছোটকাকুর ওখানে যাবে আর যাবে মাসিদের ওখানে। ঘোষণাটি সকালেই করেছিল বিমল এবং অনিমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে নিজেদের রান্না করতে বলেছিল, কারণ ওরা সেদিন রাতে কিছুই খাবে না, প্রয়োজন হলে বাইরেই খেয়ে আসবে জানিয়েছিল। শচীনের কাছে কার্যকারণ পরিষ্কার ছিল না, তাই সে শুনল কিন্তু কিছুই বলল না।

সন্ধ্যায় কাজের মেয়েটি থালাবাসন মাজতে এলো। সে গত দু'দিন কামাই করেছিল। শচীনের নির্দেশের কথা ভুলে গিয়ে অনিমা কাজের মেয়েটির দুদিন না-আসার কারণ জানতে চাইল। শচীন বসার ঘরে ইজি-চেয়ারে বসে T.V. দেখছিল, ঝি-এর কর্কশ কণ্ঠ, অসংলগ্ন উত্তরএবং অনিমাকে অসম্মান করে যা-তা বলায় শচীন বাধা দিল ওদের তর্ক-বিতর্কে, উত্তর-প্রত্যুত্তরে। "একটা খবর দিলেই জানা যেতো, আর জানতে পারলে কাজ ফেলে না রেখে শেষ করে রাখতে পারত," শচীন ব্যাপারটাকে ইতি করে দিতে চাইল। কিন্তু 'ঝি' এর মুখ একবার খুললে এবং একটা মিথ্যা কথা বললে—উভয় ক্ষেত্রেই শত-বক্তব্য নির্ঝর হতে বাধ্য। তাই হল! অনিমা বহুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের ঘরে চলে গেল। "আমি কাজ করব না, কাল থেকে আসব না, ও বাড়িতেও কাজ করব না। আপনাকেই বলে গেলাম বৌদিকে বলে দেবেন।" সে চলে গেল। শচীন অবাক বিস্ময়ে টিভির দিকেই চোখ রেখে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল! তাহলে 'ঝি' মহাশয়াও কি tuned হয়েই ছিল? আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিশ্চয় করা ছিল? কামাই করার ব্যাপারটা 'ঘটানো-সাজানো'? গট-আপ কেস? কে জানে?

ঘণ্টা দু'একের মধ্যেই শচীন জেনে গেল যে সেই কাজের মেয়েটি, ঝুনুর মা, এ-বাড়ি থেকে ছুটে গেছে ছোট ভাইয়ের বাড়িতে। তখনও ওখানে বিমল-বিমলার উপস্থিত থাকার কথা। [কিন্তু বিমল ছিল না! কোথায় ছিল বিমল সেই স্বল্পক্ষণ সময়? জানা নেই কারোই।] ঝুনুর মা ওখানে গিয়েই 'ডাক্'-ছেড়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিল বিমলার কাছে। জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলঃ "বড়বাবু আমাকে তেড়ে ফুঁড়ে মারতে এসেছে, আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছে, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।" কান্না আর কান্না! বিমল তখন "সব কিছুর একটা সীমা আছে" বলে ঘোষণা করেছিল, "আমরা ফিরে আসি! তুমি আমাদের কাছেই থাকবে। আর একেবারেই সম্ভব নয়!"

সেখান থেকে বিমল-বিমলা সপুত্র মাসিদের ওখানে গেল, ফিরল রাত দশটা নাগাদ। এসেই ঘরের মধ্যে এবং দরজা বন্ধ। পরদিন সকালেই বিমল গেল শ্বশুর বাড়ি। কলকাতায়। একটি কথাও বলল না শচীনকে। শচীন দরজার কাছেই ইজি চেয়ারে বসে ছিল। হাতে কাগজখানা। বিমলা যাবার সময় বলে গেল, "বুধবার ফিরব, সব বাড়িতে ৺বিজয়া সেরে একবারেই ফিরব। তাই দেরি হবে।" এটা ছিল রবিবার। মঙ্গলবার ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী

পূজো। গৃহবধূ শ্বশুর গৃহ ছেড়ে, পতি সহ, মা-এর ঘরে যাচ্ছে সেখানে লক্ষ্মী পূজোয় অংশ নেবে বলে!

ওদের ছোটমাসির কাছ থেকে অনিমা অনেক কথা জেনে এলো ৺বিজয়ার প্রণাম করতে গিয়ে। মায়ের কাছে মাসির গল্প না হয়ে ওরা বিপরীত ক্রমে মাসির কাছে মায়ের গল্প বলে এসেছে! বিমলা বলতে পেরেছে এ-বাড়িতে লক্ষ্মীপূজো হয় না! এবং তা বিমলের সামনেই! ডাহা মিথ্যা আর কাঁচা অসত্য যে এমন নির্দ্বিধায় উজাড় করে দেওয়া যায় তা চিন্তার বাইরে। তাছাড়া বিমল বলেছে, তার মা [সেদিন শচীনের মনে হয়েছিল যে তিনি মারা গিয়ে বেঁচে গেছেন!] কেমন করে এমন একটা 'লোকের' সঙ্গে [বিমল এখানে তার পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে!] জীবন কাটাতে পারল? ছেলেমেয়ের হাত ধরে লোকটাকে ছেড়ে গেলো না কেন? [এতো বড়ো অসম্মান কোন ত্রিশোর্ধ্ব পুত্র তার মাকে করতে পারে, মৃত্যুর চার বছর পরে, তা অচিন্তনীয়। সেই অসম্মান অনূর্ধ্ব তিন বছরের গৃহবধূর সামনে!] এবং বলে এসেছে, বিমলই বলেছে, যে হঠাৎ যদি মাসি শোনে যে বিমল বাবাকে ছেড়ে, গৃহ ছেড়ে চলে গেছে তাহলে যেন বিমলার নামে দোষ না দেয়! এত কষ্টেও শচীন নন্দলালকে স্মরণ করেছে ঃ বাহ্‌বা, বাহবা, বাহবা, বিমল লাল! পুত্র-কন্যা কু হয়ে জন্মায় না, বড় হয়ে তারা কুপুত্র-কুকন্যা হয়ে বেড়ে ওঠে মাত্র!

সেদিন রাতে যখন বিমল-বিমলা তার মাসির কাছে এসব কথা বলছিল তখন যদি তার মা কবরে শায়িত থাকতেন তা হলে অস্বস্তিতে অবশ্যই নড়ে-চড়ে পাশ ফিরতেন; তিনি হিন্দু-ব্রাহ্মণ তাই তার দাহ হয়েছিল। আত্মা যদি অবিনশ্বর হয় তাহলে কোথায়ও কোনও অনির্দেশ্য জগতে সেই বিদেহী আত্মা অবশ্যই অব্যক্ত যন্ত্রণায় দ্বিতীয়বার মৃত্যুবরণ করে থাকবে। একটি হাসপাতাল থেকে অন্য একটি শ্রেষ্ঠতম হাসপাতালে তার মায়ের শেষ জীবন সংগ্রামের যাত্রাপথের সবটুকুই অজ্ঞান-অচৈতন্য অবস্থায় কেটেছে। সেই পথের ঘণ্টাধিক কাল সময় সেই মৃতপ্রায় রমণীর অস্ফুটকণ্ঠে একটিই মাত্র শব্দ ঘড়ির শব্দের মতো অনিবার্য ধ্বনিত হয়ে চলেছিল। 'বিমল, বিমল' হাসপাতালের নার্স-ডাক্তার এমনকি অন্যান্যরাও 'বিমল' বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন ঃ কিন্তু বিমল, এতোদিনে, সেই মাতৃঋণ পরিশোধের সুযোগ পেল! একই সঙ্গে বিমল পিতৃ-ঋণ মাতৃ-ঋণ পিতৃ-তর্পণ মাতৃ-তর্পণ সমাপন করে এলো সবথেকে আপন জনের কাছে, তার মাসির কাছে। তোমরা

যে সবাই দিবস রজনী সুপুত্র-সুপুত্র বল, সুপুত্র কাহারে কয় ?

বুধবার ওরা এলো না, টেলিফোনে খবর এলো আসতে পারবে না। ছেলের জ্বর। পরে জানাল বিমলার জ্বর। ওরা ফিরল একেবারে পরের রবিবার সন্ধ্যায়। বিমল ঘরে ঢুকেই তালা খুলতে গেল, শচীনের পাশ দিয়েই গেল, কিন্তু কোনও কথা বলল না। বিমলা সন্তান কোলে, ঢুকে শচীনের পাশে দাঁড়াল, তাংকা দাদুনের দিকে হাত বাড়াল। বিমল, ঘরের ও-প্রান্ত থেকে তাড়া দিল, "ঘরে এসো"! বিমলা ত্বরিত পদে সরে গেল, নিজেদের ঘরে পর্দার আড়ালে ওরা হারিয়ে গেল।

সন্তানসহ বিমলা হারিয়ে গেলেও বিমল দশ মিনিটের মধ্যে হাজির হল শচীনের কাছে। রবিবারের সিনেমা চলছে T.V.-তে। অনিমা ডিভানে, শচীন বেতের আরাম-কেদারায়। ডিভানের এক প্রান্তে বসে বিমল শচীনকে প্রশ্ন করল, "দিদি, মানে ঝুনুর মা এসেছিল?" শচীন বলল, "না"। "কোনও খবর দিয়েছ?" "না"। একটুক্ষণ থেমে বিমল বলেছিল, "তুমিই তো তাকে তাড়িয়েছো, কিছু ব্যবস্থা করলে?" শচীন কিছুক্ষণ বিমলের মুখে তাকাল, ভাবল যে পুত্র ঝি-এর বক্তব্যকে ব্রহ্ম-সত্য বলে মেনে নেয়, যে পুত্র সত্যকে জানার আগ্রহ রাখে না এবং যে পুত্র পিতার বিষয়ে, পিতার চিন্তা-ভাবনা-প্রতিক্রিয়া বিষয়ে অন্ধ-বিদ্বেষ পোষণ করে তাকে সত্য জানানোয় বিড়ম্বনাই বাড়বে। তাই প্রতি প্রশ্ন করল, "কি বিষয়ে ব্যবস্থার কথা বলছ?" "সাতদিন সময় পেলে, চিন্তা ভাবনার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছো, তাই কি স্থির করলে তাই জানতে চাই।"

বিমলের সেই সময়ের অহংকারী, মাতব্বর-মাতব্বর ভাবভঙ্গি আর গৃহ-কর্তা সুলভ আচরণ সামঞ্জস্যহীন মনে হলেও অকারণ বিতণ্ডা এড়াতে শচীন বলেছিল, "ব্যবস্থা সুচিন্তিত ভাবেই করা আছে তবে তা মুখে মুখে বলব না, লেখা থেকে পড়ব। কারণ ভবিষ্যতে তুমি ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমার কথাকে বিকৃত করে তুলতে পার। তাই যে তিন-চারটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে তা তোমাকে পড়ে শোনাবো। তুমি তার যেকোনওটি বেছে নিতে পার।" বিমল বিকল্প বিষয়ে জানতে চাইল।

শচীন পড়ল,

(১) সংসার আমার; I take it over from you আমার সংসারে থাকতে পার; আমাকে মেনে নিয়ে।

(২) তুমি স্বাধীন, তাই স্বাধীনভাবে থাকতে পার। যদি আমার বাড়িতে থাক, তাহলে, এবং যতদিন থাকবে ততদিন পশ্চিমদিকের ফ্ল্যাটে থাকবে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিমল দ্বিতীয় বিকল্প মেনে নিল। বলল, "আমরা আলাদাই থাকব।" বলেই চলে গেল নিজের ঘরে।

বিভেদ-রেখাটি টানা হয়ে গেল। ফ্রিজ খালি করিয়ে সেটি বিমল-বিমলা টেনে টেনে ঘরে নিয়ে গেল। রান্নাঘর থেকে ওদের প্রয়োজন মতো জিনিসপত্র একে একে চলে গেল হাতে হাতে। গেল ডাইনিং টেবল এবং একটা মিট্‌-সেফ্‌। ফলে অনিমাকে দিয়ে পরদিনই, সাঁড়াশি, বটি, চা-ছাঁকনি, খুন্তি ইত্যাদি কিনে আনাতে হল শচীনের সংসারের জন্যে।

পরদিন দুপুরে, অনুমানমতোই, বিমলার ভাই এসেছিল, বিকালেই চলে গেল। Protocol মেনে শচীনকে প্রণাম করল এবং যাবার সময় বলে গেল। মাঝখানের দীর্ঘসময় সে দিদির সঙ্গে ঘরের মধ্যেই কাটাল। যা জানার ছিল তা জেনে গেল। শচীন বুঝেছিল যে ছেলেটি এসেছিল রিপোর্ট সংগ্রহে।

"তিন চার দিন পার হয়ে গেল ওরা ভিন্ন হয়ে গেছে।" শচীন বলেছিল। "এর মধ্যে বিমলা এবং নাতিটি একবারের জন্যেও দেখা করে নি। কারণ ওরা বাইরেই আসেনি।" বলেছিল, "আমিও ওদের ঘরে যাই নি, ওরাও আমার সামনে আসে নি। একটা সমকক্ষতার বোধ ওদের তাড়া করে ফিরছিল। অথবা ওরা নিজেদের অনেক বড় বলে মনে করছিল।"

পঞ্চম অংক ঃ স্বক্ষেত্রে শচীন

শচীনের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল—এখানে বড়-ছোটর দ্বন্দ্ব। বিমল তার পুত্রকে দ্রব্যের মতো মনে করে, দ্রব্য যা তার নিজের। ওর sense of possession অত্যন্ত দৃঢ়। সে অত্যন্ত বালখিল্যের মতো পুত্রকে ব্যবহার করে মানসিক যুদ্ধে। অনিমা, অনিমা কেন, বেশির ভাগ লোকই শিশু পছন্দ করে; অনিমা অত্যন্ত বেশি পছন্দ করে। তাই অনিমাকে বিমল তার সন্তানকে ছুঁতেই দেয় না তা নয়, দৃষ্টির মধ্যেও আনে না, আনতে বা আসতেও দেয় না। অন্য কারণও আছে; বিমল-বিমলার বিশ্বাস অনিমার নজর লাগে, ওদের শিশুসন্তানের প্রতি। ওরা তুক-তাকে বিশ্বাস করে এবং

অনেক অনুষ্ঠানও করে সন্তানের অসুখ সারাতে। ওদের এই মানসিকতা স্মরণ রেখে শচীনকে হুঁশিয়ার হতে হয়। বিশেষ করে বেড়িয়ে আসার পর থেকেই বাচ্চাটা ভুগছে; সর্দি, জ্বর, পেটখারাপ এবং ইত্যাদি। ওজন কমে গেছে, বর্ণ জ্বলে গেছে, সদাহাস্যময় সানন্দ মুখখানি শুকিয়ে ছোট হয়ে গেছে। এখন যদি শচীনের 'নজর' লেগে যায়!

এক বছরের শিশুকে নিয়ে ওরা কুলু-মানালি, সিমলা-দিল্লি করে বাড়ি ফিরল। কোথায়ও দশ ডিগ্রী, কোথাও বা সতেরো আবার গৃহে এসেই পঁচিশ। তার পরেই কার্ত্তিকের সন্ধ্যায় এবং রাতে পর পর দু'দিন স্কুটারে এবাড়ি থেকে ওবাড়ি, ও বাড়ি থেকে সে-বাড়ি। এবং পরদিন সকালেই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার স্কুটার যাত্রা। মামা বাড়ি। তাপের হেরফের, পরিবেশ দূষণের আক্রমণ, শিশিরের জলীয় বাতাস, ঠাণ্ডার আঘাত আর সর্বোপরি বিভিন্ন জায়গার জল এবং খাদ্য! একটা একবছরের শিশু কতোটা ঘাতসহ হয়ে থাকে, কতোটা immune? কিন্তু ওরা 'নজর' লাগায় বিশ্বাস করে বলে হয়তো শেষ পর্যন্ত ওদের প্রিয় ঝি ঝুনুর মায়ের পরামর্শে 'ঝাড়-ফুঁকে' গড়াবে। এর মধ্যেও শচীনের নাক গলানোর অবকাশ কোথায়?

আঘাত না পেয়ে পেয়ে আঘাতের বেদনাবোধ ওদের গজায়ই নি। ছোটবেলা থেকেই বিমল যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। তাই ও আঘাত দিতেই জানে, নিতে নয়। অনায়াসেই তাই ফটো খুলে নিয়ে যেতে পারে দেয়াল থেকে, অনায়াসেই তাই শচীনের দেওয়া উপহারের দু'শ টাকা ফেরত দেবার মতো ধৃষ্টতা ঘোষণা করতে পারে। আঘাত দিলে ব্যথা লাগে এটা ওদের তাত্ত্বিক জ্ঞান; শচীনের উপর, অনিমার উপর প্রয়োগ করে বলেই জানতে পাবে নি ব্যথা কাকে কয়! আগুনে হাত দিলে যে হাত পোড়ে সে হাত অন্যের বলে পোড়ার জ্বলুনি ওদের অনুভবে-অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে নি। তাই শচীন স্থির করে নিল ওদের নিজেদের হাত আগুনে প্রবেশ করিয়ে ব্যথা আর জ্বলুনির বোধটাকে তাত্ত্বিক জ্ঞান থেকে বাস্তবে সত্য করে তুলবে। পরদিন রাতে তাই বিমলকে ডেকে শচীন বলল, "তোমাদের আরও কিছু জিনিস এখানে রয়ে গেছে, নিয়ে যাবে, যেমন সোফা, ঘড়ি, রিস্টওয়াচ। তোমার জন্মদিনে তনিমার দেওয়া table top, দু'একটা Presentation এবং যদি আরও কিছু থেকে থাকে তা-সবই নিয়ে যাবে।" বিমল যেন একটু হকচকিয়ে গেল, এ-রকম প্রতি আক্রমণ সে আশা করে নি। তাই বলল, "সময় হলেই নিয়ে যাব! শচীন তাড়া দিয়ে

বলল, "অকারণ তোমার জিনিস আমার কাছে থাকবেই বা কেন ?" বিমলের ঘরে এ-সবের প্রয়োজন নেই স্থানাভাবও বটে। কিন্তু মা-নামুনের ফটো ছিল আঘাত হানাব, অসম্মান করার উপায়। তাই সেই ব্যাপারে ত্বরা ছিল এ সকল জিনিসে তা নেই। একটু সময় নিয়ে শচীন বলল, "তোমার ঘরে আমার কেনা সিলিং ফ্যান এবং টেবিল ফ্যানগুলো রয়ে গেছে, ওগুলো যথা-সম্ভব তাড়াতাড়ি ফেরত দেবে অথবা বললে খুলে আনতে পারি" এবারে বিমল দৃশ্যতই বিস্মিত হল, "তা কেমন করে হবে ? এখনও গরম যায় নি, ওগুলো আমি ব্যবহার করছি তো !" শচীন প্রতি আক্রমণে দৃঢ় হল, "তা বললে তো হবে না। তুমি তোমার হাতে তোলা বলে ফটোগুলো খুলে নিয়ে গেলে, আমি **fan** গুলো চাইতেই পারি এবং নৈতিক ভাবে তুমি তা দিয়ে দিতে বাধ্য।" পলায়নের ফাঁক খুঁজতে বিমল বলল, সময় হলেই দেবো, হুট বলতেই তো আর **fan** কেনা যায় না !" শচীন বলল, "ফটো **reprint** করতে অবশ্যই সময় লাগে, টাকা ফেললেই তা সম্ভব নয় ; কিন্তু কাল বললে কালই দোকান থেকে তুমি যতখুশি **fan** কিনে আনতে পার !" বিমল জানাল, "আমার টাকা নেই, সময় হলেই ফেরত দেব !" এর পরে শচীন সেই মোক্ষম জিনিসটি চেয়ে বসল, বলল, "তোমাদের অধিকারে আমার আর এক-টি জিনিসও আছে, আমার ঘরগুলো যা তোমরা দখল করে আছ। সেটিও যথাসত্বর ফেরত দেবে।" বিমল উত্তেজিত হয়ে অনেক আবোল তাবোল বকে গেল। কিন্তু শচীন পেরেকের মাথায় খাড়া-হাতুড়ি চালাতে চেয়েছিল তা হয়ে গেল। হাত পুড়লে কেমন বোধ হয় তা বোধহয় বিমলের জানা হল। সবশেষে শচীন সাইকেলের চাবিটি নিয়ে জানিয়ে দিল, "সাইকেল আমার, তাই ওটা আমারই অধিকারে থাকবে। তুমি ব্যবহার করতে পারবে না !" "আমি বাজার করব কি করে ?" "কেন বহুলোকই তো পায়ে হেঁটে বাজার করে, তুমিও তাই করবে !" প্রায় অসহায়ের মতো বিমল প্রশ্ন করল, "তুমি যা যা করছ তা ভেবেচিন্তে করছ ? ভাল করছ ?" শচীন একটু হেসে জবাব দিয়েছিল "কোনও কিছুই আমি অনেক না ভেবে করি না, ভাল ছাড়া মন্দে আমার আগ্রহ নেই, তাছাড়া একই ভুল তোমাকে দুবার করতে দেওয়া উচিত নয় বলেও আমি মনে করি। তাই এবারে তোমার ফিরে আসার পথ বন্ধ করে দেবো।" উত্তেজিত বিমল ঘরে ঢুকেই দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিল।

ধ্বংস কতো সহজে কতো স্বল্প সময়েই না ঘটে যায়। সময় লাগে গড়ে

তুলতে, ভাঙতে সময় লাগে ক্ষণমাত্র। শচীন-বিমলের পিতা-পুত্র যুদ্ধে বিমলা নেপথ্যে Prompter বা director. দীর্ঘদিন সে একটা front face এবং একটা rear face ধরে রেখেছে। কুশলী বলতেই হবে। protocol এর অভাব ঘটেনি যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। বিমল অনায়াসেই শচীনের সংসারে থাকতে পারত শচীনের বিকল্পসমূহের মধ্যে প্রথমটি মেনে নিয়ে। তা যে নিতে পারবে না তা জানাই ছিল। জানা ছিল কারণ ওরা দু'মাস যাবত স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র হবার সকল ব্যবস্থা ধীরে ধীরে ভিতরে ভিতরে করে রেখেছিল। তাই বলা যায় যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল আগস্টের চার তারিখেই যেদিন তনিমা এসেছিল আর ওরা ঘর ছেড়ে মেদিনীপুর গেছিল। সেই যুদ্ধে বারুদ সংযোগ ঘটল পরে। এবং তার পরেই বিমল-বিমলা যুদ্ধকে মানসিক পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে চাইল : Photo episode দিয়ে এবং পুজোর সময়ে দেওয়া উপহারের টাকা ফেরত দেবার প্রস্তাব দিয়ে।

কোনও প্রয়োজন ছিল কি ? ছেলেরা বড় হলে বাবার থেকে দূরে বা আলাদা হয়ে থাকতেই পারে। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র একক হওয়ার দাবি রাখে। তার মধ্যে কোনও অ-ন্যায় নেই। সেই স্বতন্ত্র হওয়াটা gracefully হতে পারতো ; সেটা ওরা হতে দিল না, ওরা disgrace-এর মধ্যে তাকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানেই শেষ হতে পারল না ; শুরু করল Psychological war. এ-যুদ্ধ শচীনকে আর বিমল-বিমলাকে কোথায় নিয়ে যাবে তা ওরা কেউই জানে না। জানে কি ?

এই সাইকোলজিক্যাল ওয়ার করতে গিয়েই ওরা দূরবর্তীকে সমূহ করে ফেলল। অনিবার্যকে তাৎক্ষণিকের মধ্যে টেনে আনল। জ্যোতিষবাবু জানতে চাইলেন, "ব্যাপারটা কেমন একটু খুলে বলুন।" নয়নতারা বলল, " শচীনবাবু তো বেশ শক্ত লোক, কঠিন ধাতুর লোক বলে মনে হচ্ছে। প্রথম প্রথম যা মনে করেছিলাম তা একেবারেই নয়।" আমি বললাম, "কিন্তু বিমলের পক্ষে শচীনবাবুকে না বোঝাটা বেশই আশ্চর্যের। বিমল জানে এবং বিমলা জেনেছে যে শচীনবাবু স্বপ্রতিষ্ঠ, 'সেলফ্ মেইড'—ম্যান। জানে এবং জেনেছে যে মানসিক দৃঢ়তার উদাহরণ হিসেবে শচীনবাবু এলাকায় বিদিত ব্যাক্তি। সংগ্রাম-সংঘর্ষ তার জীবনে নোতুন নয়। জয় পরাজয় তার কাছে সমান মূল্যের। কিন্তু সকলেই জানে, বিমল তো অবশ্যই জানে, যে যে-কোনও যুদ্ধেই শচীন ফ্রন্টাল এ্যাটাককেই বেশি পছন্দ করে, এ্যাটাকই যে

বেস্ট ডিফেন্স তা অনুসরণ করে এবং সুনিপুণ অস্ত্রব্যবহারে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। সে অস্ত্র কখনও তার বাকচাতুর্য, কখনও মনোবৈজ্ঞানিক সুতো টানাটানি। উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য স্থির করে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় বলে ফলাফল বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকে প্রথম থেকে।"

জ্যোতিষবাবু আবার বললেন, "সেই দূরবর্তীকে সমূহ করার ব্যাপারটা এখনও বুঝি নি।" বললাম, "শচীন তার নাতিকে প্রাণাধিক ভালবাসে, নাতিটিও দাদুন ছাড়া চলতে পারে না। শচীনের চেয়ার টেবিল এবং টেবিলের উপর যাবতীয় জিনিসপত্র তাংকার না শচীনের তা নিয়ে দাদু-নাতিতে নিরন্তর টানাহ্যাঁচড়া চলত। দাদুনের সঙ্গ যেমন নাতির চাইই চাই, দাদুনেরও তেমনি মাঝে মাঝেই নাতি না হলে চলতো না। এই ব্যাপার-টাকে বিমল-বিমলা কাজে লাগাতে চাইল। ওরা দরজা বন্ধ করে তাংকাকে অদৃশ্য করে ফেলল। শচীনের মনের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইল!"

নয়নতারা বেশ আতঙ্কিত বোধ করে বলে উঠল, "এ তো দেখছি একেবারে অন্যায় যুদ্ধ, একটি শিশুকে ব্যবহার করতে ওদের মনে কোনও বাধা এলো না? এবারে তো ব্যাপারটা শচীনবাবুর পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে গেল মনে হচ্ছে।" আমি বললাম, "সে কথাই তো শচীন আমাকে বলেছিল। বলেছিল—'যা সহজে হতে পারত তা কঠিন পথে ওরা করল। করল করুক। ওদের মনে হয়েছে বাবাকে শাস্তি দিলে এই বুড়ো বয়সে সে ভেঙে পড়বে। তখন মেয়েকে ত্যাগ করবে ছেলের, বিশেষ করে নাতির টানে। অথবা, কে জানে কি ভেবেছিল ওরা।' শচীন আমাকে বলেছিল কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। ভাবছিলাম এই মানসিক যুদ্ধের প্ল্যানটা কে ঠিক করেছিল? বিমল না বিমলা? না-কি অন্য কেউ এর পিছনে ছিল?"

জ্যোতিষবাবু বলে উঠলেন, "ঠিক, এটাতো জানা দরকার। আমার তো শুনে টুনে যা মনে হচ্ছে তাতে বিমলার দিকেই সন্দেহের কাঁটাটা ঝুঁকে পড়ছে।" নয়নতারা বোধহয় একটু হাসি ঠোঁটের কোণে ধরে রেখেই বলে ছিল—আলো কম থাকায় দেখতে পাই নি, কিন্তু গলার গিটকারিতে তেমনই মনে হয়েছিল —সে বলেছিল, "মা বেঁচে থাকলে কোনো মেয়েই মায়ের পরামর্শ ছাড়া প্রথম প্রথম এ-রকমের একটা কাণ্ড করতে পারে না, তোমরা মেয়ে হলে বুঝতে।" অনেকক্ষণ বাদে একটু সুযোগ পেয়ে বলেছিলাম, "আমরা মেয়ে হলে নয়নতারা হতাম না সুনীতি হতাম, কৃষ্ণা হতাম না বিমলা তা আমাদের

কারোই জানা নেই। তবে এটা জানি যে শচীন অত্যন্ত বিবেচনা করে, নাতির বিষয় স্মরণ রেখেই সিদ্ধান্ত করেছিল।” “কি সিদ্ধান্ত নিলেন শচীনবাবু?”—জ্যোতিষবাবু সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন।

রাত বেশ বেড়ে যাচ্ছিল। ঘরে ফেরার ব্যাপারটা ক্রমশই আমাকে ভাবিয়ে তুলছিল। সেই ভাবনার কথা ওদের বললাম। হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললাম, “সংক্ষেপেই শেষ করতে হবে। অন্যথা বাকি অংশ ডিউ রেখে উঠতে হবে।” আমি সিগারেটে আগুন ধরালাম। জ্যোতিষবাবু বললেন, “ডিউ-ফিউ চলবে না। শেষ করে তবে ছুটি।” নয়নতারা হেসে উঠে বলেছিল, “জ্যোতিষ বোধহয় ভয় পেয়েছে। ভবিষ্যতের ভয়।”

ওদের দাম্পত্য কলহের উতোর-চাপান বন্ধ করার জন্যে বলে উঠলাম, “শচীন বাবু বিমলের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুকে যোগাযোগ করলো। সব তাকে জানাল। তার সাহায্য চাইল,—একসঙ্গে আর থাকা যখন সম্ভব নয় তখন দুটি মাত্র বিকল্প খোলা আছে যদিও করণীয় একটাই। বিমলদের শচীনের বাড়িতে থাকা আর সম্ভব নয়, উচিতও নয়। ওদের স্বাধীন স্বতন্ত্র বাসস্থানে চলে যাওয়া অনিবার্য হয়ে গেছে। এই চলে যাওয়াটা অনায়াস হতে পারে যদি তারা নিজেরা চলে যায়। দ্বিতীয় বিকল্প ওদের চলে যেতে বাধ্য করা—টু মেক দেম গো। এই রকম কঠিন অবস্থার কথা শুনে বিমলের বন্ধু বেশ মুষড়ে পড়েছিল। তাই শচীন তাকে বুঝিয়ে বলেছিল,—‘তুমি ট্যাক্টফুলি ওদের অন্যত্র চলে যেতে বল, ব্যবস্থা করে দাও। আর আমি প্রয়োজন মতো আটশো-হাজার টাকা মতো ঘরভাড়া যদি দরকার হয় তাহলে যতদিন চাইবে ততোদিনই তা দিয়ে যাবো—যদি অবশ্য বিমলের আত্মসম্মানে না বাধে।’ বন্ধু বলেছিল—‘যতদূর জানি ওকে মানানো যাবে বলে মনে হয় না।’ সে কথায় শচীন বলেছিল—‘মানা ওর উচিত, তাংকার জন্যে, নিজেদের জন্যে এবং আমার বয়সের কথা ভেবে।’ আরও অনেক কথা বলে শচীন দিন পনেরোর মধ্যে বিমলের মতামত জানাতে বলেছিল—হ্যাঁ-না যেটাই হোক সেটাই জানাতে বলে দিয়েছিল।”

“নিশ্চয়ই যেতে রাজি হয়নি ছেলেবৌ?” জ্যোতিষবাবুর প্রশ্ন। বললাম, “রাজি তো হয়ই নি বরং বাড়িতে তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছিল। এই প্রথম বিমলা তার লুকোনো মুখটা প্রকাশ করে ফেলল। সেই যে ঘণ্টা-খানেক চেঁচালো, যা নয় তাই বলে চ্যালেঞ্জ জানাল, এবং ওদের তিন ঘরের

মেঝেতে দাপাদাপি করে বাড়ি মাথায় করে নিল তা যেমন অভূতপূর্ব তেমনি কুরুচির ছেঁড়া কাঁথা! সেই প্রথম আশপাশের লোকেরাও জেনে গেল বিমলার প্রকৃত চেহারা। নয়নতারা প্রশ্ন করল, "তা, বিমল নিজে ব্যাপারটা নিয়ে শচীনের সঙ্গে কথা বলল না কেন? বৌকে এগিয়ে দিল কেন?" জ্যোতিষবাবু বললেন, "ঠিকই তো, যদি ঝগড়াই করতে হয় তাহলে ছেলে না করে বৌ কেন?"

"এই কেনর উত্তর শচীন দিতে পারে নি? অনুমান করেছে মাত্র। প্রথমদিন যা ছিল অনুমান পরে তাই স্থির জেনেছে। কারণ প্রথম দিনের পরে আর বিমলার মুখের বাঁধন বলে কিছু ছিল না। শচীন তাই ব্যাপার-টাকে তাড়াতাড়ি চুকিয়ে দিতে ছক অনুযায়ী দান ফেলল। শচীন নিজে একটি কথাও ওদের সঙ্গে বলেনি, একটি প্রতিক্রিয়া করে নি ওদের শত শত উত্তেজক কথায়, অভিযোগে অথবা চ্যালেঞ্জে। ওদের মানে অবশ্য বিমলার— ছেলে সেই যে স্ত্রীর হাতে সব ছেড়ে দিয়ে তাংকাকে কোলে নিয়ে বসল. আর একবারও মাঠে নামে নি।

জ্যোতিষবাবু বললেন, "আমি আগেই অনুমান করেছিলাম।" নয়নতারা বলে উঠলো, "তুমি আগে আদৌ অনুমান কর নি, এখন ভাবছ যে আগেই অনুমান করেছিলে।" আমি ওদের আর বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ার সুযোগ দিতে চাই না। বললাম, "দীর্ঘ ঘটনাকে ছোট করে বললে দাঁড়ায় যে এই অবস্থা মাস দেড়েক চলল। তার পরে একদিন ওরা কোথায় যেন অনেক বেশি টাকাতেই ঘর ঠিক করে ঘর ছেড়ে গেল।" "যাবার সময় শচীনকে কিছু বলে গেল না?"—জ্যোতিষবাবুর প্রশ্ন। বললাম, "না। একটি কথাও নয়। শচীন বলেছিল—জান তপেন ভাড়াটে হলেও হয়তো বা ভদ্রতা করে যাচ্ছি-টা ছুঁড়ে দিত। এতো ছিল সন্তান তাই।—শচীনের সেদিনের মনের অবস্থার কথা চিন্তা করে আমি তাকে কিছুই বলিনি।"

নয়নতারা বলল, "আমার প্রশ্ন সেই একই জায়গায় রয়ে গেল ঃ বিমলা কেন এটা করতে গেল? এমনিতে সে যা পেয়েছিল, পাচ্ছিল তাতে তার মন উঠলো না কেন? সে কি অন্য কিছু চেয়েছিল? এবং সেই অন্যকিছু গোপন কিছু?" জ্যোতিষবাবু বললেন, "আমার প্রশ্ন কিন্তু একটা নয়, দুটো। প্রথম, বিমলার মা এমন একটা ভাঙনে সাহায্য করলেন কেন? তাঁর স্বার্থের বিন্দুটি কোথায়? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন বিমলার

মা-বাবা একবারও এই ভাঙনের প্রচেষ্টায় বাধা দিলেন না কেন? এলেন না কেন শচীনবাবুর সঙ্গে কথা বলতে? এই ব্যাপারটা আমার একেবারেই বোধগম্য হচ্ছে না।"

আমি বললাম, "প্রশ্ন যখন উঠেছে উত্তর খোঁজাটাও তখন চলতে থাকবে। তবে আমাকে এখন উঠতেই হবে কারণ আর দেরি করলে অনেক দেরি হয়ে যাবে।" ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ফেলে উঠে দাঁড়ালাম। জ্যোতিষবাবু গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। 'আবার এসো'—বলে নয়নতারা তুলসীমঞ্চ পর্যন্ত এসে থেমে গেল। জ্যোতিষবাবু অনুনয় মতো করে বললেন, "দেখবেন যেন আমাকে আবার পেয়াদা হয়ে যেতে না হয়, একটু তাড়াতাড়িই চলে আসবেন।" তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আমিও হাসতে হাসতে বিদায় নিলাম।

বেশ রাত হয়ে গেছে। পথেঘাটে লোকজন কম। ট্রেন বেশ ফাঁকা ছিল। কিন্তু আমার মাথার সব ফাঁকা জায়গায় জ্যোতিষবাবুর আর নয়নতারার প্রশ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছিল। তার সঙ্গে আমার নিজের মনের চিন্তা ভাবনা আর প্রশ্নগুলো মিলেমিশে তালগোল পাকিয়ে তুলেছিল। সিটের এক কোণে একেবারে একা একা বসে তাই ভাবনা চিন্তার জটগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম। শচীনকে আমি প্রশ্ন করেছিলাম, সেও তেমন কোন উত্তর দিতে পারে নি। আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। মনে পড়ল শচীন বলেছিল—"জান তপেন বিমলের অতীত তেমন স্বচ্ছ বা পরিষ্কার ছিল না। তাই কি সে তার ভবিষ্যৎ বাঁচাতে বর্তমান থেকে বিমলাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল? মনের ভয়ে যে সেই অতীত একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়বে। বিশেষ করে বোনেদের ভয়ে, যারা সবই জানত?' আমি বলেছিলাম, 'সে তো তোমাদের পারিবারিক বিষয়, আমার পক্ষে জানাও সম্ভব নয়, বোঝাও সম্ভব নয়।' তারপরে শচীন নিজেই যোগ করেছিল, 'কিন্তু বিমলা যে জানতো তা আমার জানার কারণ ছিল। কি জানত, কতোটা জানতো তা অনুমান করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না বটে তবে বিমলের যে লুকোনোর মতো কোনও অতীত আছে, এবং সেই অতীত যে ওদের হণ্ট করছিল তা ওরা গোপন রাখে নি। তাহলে?'

এই 'তাহলে' টা যে আমাকে প্রশ্ন ছিল না তা আমি বুঝেছিলাম, শচীন নিজের মনের কাছেই প্রশ্ন করেছিল। উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না বলেই প্রশ্নটা জোরালো করে তুলছিল মাত্র। আমি তাই চুপ করেই ছিলাম। 'তাহলে

কি বিমলার কোনও বিশেষ আকর্ষণ কেন্দ্র ছিল অন্য কোথায়ও, অন্য কোন খানে ?' শচীন উত্তর হাতড়ে ফিরছিল মনে মনেই। 'স্বামী স্ত্রীর একা সংসারে স্বামী অফিস চলে গেলে অফুরন্ত অবকাশের সুযোগ থাকে স্ত্রীদের স্বাধীন এবং পূর্বসিদ্ধ জীবন যাপনের অগাধ সুযোগ পাওয়া যায় বলেই কি বিমলা শ্বশুর বাড়ির আওতা ছেড়ে নিজের চারদেয়ালের মুক্তি খুঁজছিল?' এমন বেদনার্ত কণ্ঠে শচীন কথাগুলো বলেছিল যে ওর জন্যে আমারও কষ্ট হচ্ছিল সেদিন। ওর কষ্টের কথা ভেবে আমি সেদিন বলেছিলাম, 'তুমি শুধুমাত্র বিমল আর বিমলার অতীতের মধ্যেই ওদের তখনকার মনোভাবের কারণ খুঁজছ কেন ? এমনও তো হতে পারে যে ব্যাপারটার মধ্যে অন্য কোন পাকা মাথা কাজ করেছিল। শচীন উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করেছিল—'যেমন ?'

আমি ধীরে ধীরে আমার বক্তব্য রেখেছিলাম সেদিন। বেশ সন্তর্পণেই বলা যায়। বলেছিলাম, "তোমার কাছে বিভিন্ন সময়ে শোনা তথ্যকেই আমি নোতুন এক ভাবে সাজাতে চাই। তুমি বলেছো বিমলার মা-বাবা প্রথম থেকেই জেনে গেছেন যে তুমি পুত্র অন্ত প্রাণ পিতা, বিমলের মা নেই তাই তুমি বিমলের প্রতি অত্যন্ত কোমল, বিমলের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে তুমি কখনও অন্যথা করবে না। বিমল তোমার একমাত্র পুত্রসন্তান, এবং তোমার ধনসম্পত্তির পরিমাণ অনেকের ঈর্ষার কারণ। তাঁরা এ-ও জেনে-গেছেন যে তুমি তোমার বড় মেয়ের প্রতি যথেষ্ট রুষ্ট, কারণ সে বিয়ে করেনি, সে তোমার কথা শোনে না, সে স্বাধীন চেতা এবং ঘরের চাইতে বাইরেটাকেই বেশি পছন্দ করে। এ-সবের উপরে যখন তোমার ছেলের ঘরে নাতি এলো তখন তুমি তোমার দিলদরাজ মানসিকতাকে তো গোপন করনি। আমরা পর্যন্ত জানি যে তুমি ছেলে বৌয়ের জন্যে যদি কোমর জলে নামতে রাজি ছিলে তবে এখন নাতির জন্যে গলা জলে নেমে যেতে প্রস্তুত। এ-সবই তো ওঁরা জানতেন।" শচীন মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেছিল, "তা এসবে দোষের কি দেখলে তোমরা ? এ-সবই স্বাভাবিক নয় ?" আমি বলেছি, "দোষের কথা হচ্ছে না, এ-সব স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক তাও আমার প্রশ্ন নয়। আমি বলতে চাই......" একটু থেমে বলব কি বলব না, অথবা বললে ঠিক কেমন করে বলা ঠিক হবে তা একটু ভাবছিলাম, শচীন অধৈর্য হয়ে উঠেছিল. "বল, কি বলতে চাও ?" বলেই আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে ছিল।

"যদি ধরে নেওয়া যায় যে তুমি কোনো অবস্থাতেই তোমার পুত্র, পুত্রবধূ

এবং নাতিকে ত্যাগ করবে না, যে-কোনও অবস্থাতেই তা করতে পার না, এবং যদি তোমার অগাধ ভূসম্পত্তি এবং অর্থসম্পন্নতা থাকে যা আইনত তিন সন্তানের প্রাপ্য তাহলে সেই তিন সন্তানের মধ্যে যে কোনও একজন, যদি সে পুত্র হয় অন্য দুজন কন্যা হয়, তাহলে সেই পুত্র-জন এক তৃতীয়াংশের বদলে সম্পূর্ণের জন্য লালায়িত হতে পারে।" একটুক্ষণ শচীনকে অনুভব করে বলেছিলাম, "বলা হয় অর্থ অনর্থের মূল, বলা হয় বিয়ের পর মেয়ের মা মেয়ের স্বার্থ দেখতে জামাই-কে জঠরের বদলে একটা মানসিক 'কোকুন'-এ উষ্ণ রাখতে চায় এবং মেয়েকে নির্বাধ এবং নিশ্চিত সম্পন্নতায় প্রতিষ্ঠা করে দিতে চায়। বিমলের ক্ষেত্রে নিজের মা না থাকাটা স্ত্রীর মা থাকাটাকে অনেক বেশি খেলোয়াড়ি করে দিতেই পারে।" শচীন অসহায়ের মতো বলেছিল, "তা অবশ্যই পারে, পারে কেন বলছি সে-রকমই তো হয়েছিল। বাড়ির চাইতে বিমলের শ্বশুর বাড়ি আপন হয়ে উঠেছিল।"

"তাহলে" আমি বলেছি, "তাহলে একটা মাস্টার প্ল্যান তো বিমলার মায়ের হাতে ছকা হতেই পারে। তোমার উপরে চাপ সৃষ্টি করলে তুমি ছেলে এবং নাতি ত্যাগ করতে পারবে না, তাই বাধ্য হয়েই মেয়ে ত্যাগ করবে। একই সঙ্গে তোমাকে এবং তোমার সম্পত্তিকে একেবারে নিজস্ব করে বিমলা পেয়ে যাবে তখন—হতে পারে না এমন একটা প্ল্যান?"

"কিন্তু" শচীন বলেছিল, "কিন্তু বিমল তো জানে, অন্তত জানার কথা যে অন্যায় চাপের সামনে পড়লে আমার প্রতিরোধ ক্ষমতা কি ধরনের পথ বেছে নেয়।" আমি বলেছি, "অন্যদিকে যদি স্ত্রীর মাতা ঠাকুরানী থাকেন তাহলে কোনো জানাই আর জামাই বাবাজীর পক্ষে শেষ জানা হয় কি? এবং আশা যে কুহকিনী তা কে না জানে? এবং মায়াবিনী? স্বর্ণ হরিণের জন্যে কি কি যে হল আর হল না তা কি নোতুন করে বলতে হবে?" চিন্তায় বাধা পড়ল। স্টেশন এসে গেল। ঘরে ফিরে এলাম।

নারী, নীড় ও সময়

এখন মাঝে মাঝেই ভাবি নয়নতারার সঙ্গে দেখা না হলেই বোধহয় ভাল হত। বেশ ছিলাম অলস জীবন নিয়ে। ভাবনা ছিল না চিন্তার দায় ছিল নেই। আপন কেউ নেই, পরও নেই। দুঃখ তেমন কিছু নেই বলেই বোধহয়

নেই। আপন কেউ নেই, পরও নেই। দুঃখ তেমন কিছু নেই বলেই বোধহয় সুখের অনুভবটাও তেমন বড় নয়। চারদিকের জীবনকে দেখতে পেতাম নিজের অলস ভাসমান দৃষ্টিতে। তাদের সকলের জীবনেই চাওয়া পাওয়ার তাড়না আছে। তারা সকলেই কেমন ছুটোছুটি ক'রে হুড়োহুড়ি ক'রে সংসারকে সংগ্রহের পীঠস্থান করে তুলছে। আর এই করতে গিয়ে সকলেই কেমন সুখের খোঁজে দুঃখকে তুলে আনছে নিজ নিজ জীবনে, সংসারে। নয়নতারার সঙ্গে দেখা হতেই মনে হয়েছিল ওর সংসারে কোন দুঃখ নেই, শুধুই সুখ আছে। ওর সংসারের মধ্যে গিয়ে মনে হয়েছে নয়নতারা পেরেছে। দুঃখ নেই এমন কি হতে পারে? পারে না বলেই তো জানি। তবে মনে হয় দুঃখকে বোধহয় কোনভাবে নিজের করে নেওয়া যায়, আপন করে আত্মস্থ করা যায়, জয় করা যায়। নয়নতারা বোধহয় তাই পেরেছে। দুঃখকে যদি দহন করার সুযোগ না দেওয়া যায়, বেদনাকে যদি বন্দনা করে বাড়িয়ে না তোলা যায় আর কষ্ট যন্ত্রণাকে যদি বিব্রত করার অবকাশ না দেওয়া যায় তাহলে হয়তো বা তারা জোর হারিয়ে ফেলে। নয়নতারা কি তাই করে, তাই পারে? কে জানে।

নয়নতারা আমাকে টানছে বলেই মনে মনে কটা দিন বাইরে চলে যেতে মন চাইল। দূরে গেলেই নাকি প্রকৃত নৈকট্য টের পাওয়া যায়। তাই দু'চার-খানা বই-এর খোঁজে কলেজ স্ট্রিট ঘোরাঘুরি করলাম এক দুপুরে। কাজ শেষ করে কফি হাউসে একটা কোণ বেছে নিয়ে ফুটন্ত জীবন থেকে একটু দূরে গিয়ে বসলাম। জলের গ্লাসটা টেবিলে অর্ধেক পূর্ণ অবস্থায় অপেক্ষা করে আছে। সদ্য কেনা বই-গুলো নিয়ে একটু উল্টে পাল্টে দেখছি। আপন মনে আনমনা ভাবে। হঠাৎই সচকিত বোধ করলাম। "আরে, তপু মামা? তুমি?" চোখ তুলেই সুপ্রিয়াকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমাকে অবাক হতে দেখে সুপ্রিয়া ঝরঝর করে বলে উঠলো, "একি? তুমি অবাক হচ্ছ কেন? অবাক হবার অধিকার তো আমার, আমাদের।" সামলে নিয়ে বললাম, "বস,বস। ভারি আনন্দ হল তোমাকে দেখে।" সুপ্রিয়া তার পাশে একটু পিছনে দাঁড়ানো ছেলেটির দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, "তুমিও বস, ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস।" বলেই আমার দিকে তাকিয়ে পরিচয় করিয়ে দিতে বলল, "ওর নাম সর্বেশ। আমার বন্ধু। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি রত্ন

বিশেষ। আর এই আমার তপুমামা, শুধু আমার নয় আমাদের তপুমামা।" বলে এমন করে আমার দিকে তাকাল যেন আমার বিষয়ে ঐ এক কথাতেই সকল কথা বলা হয়ে গেল।

সর্বেশকে আমার বেশ ভাল লাগল। বড় বড় দুটো চোখে বেশ বুদ্ধি-দীপ্ত চাহনি। মৃদু হাসিতে স্থির উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। দুজনকে পাশাপাশি দেখে পরিষ্কার বুঝে গেলাম ওরা বেশ কাছাকাছিই। সুপ্রিয়া আমার দেখাটাকে আরও সহজ করে দিতে বলল, "স্যোশিওলজি। বেসরকারী একটা কলেজে। দূরে নয়।" আমি ওর বলার ধরনে হেসে ফেললাম, বললাম, "দূরে যে নয় তা তোমাদের দেখেই বুঝেছি। সোজা করে বললে বলা যায় বেশ কাছেই—কি বল সর্বেশ ?" হঠাৎ আমি যে সর্বেশকেই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেবো তা হয়তো সে আশাই করে নি। তাই বেশ একটু চমকে গিয়ে বলেছিল, "হ্যাঁ, তা অবশ্যই। তবে সোশ্যালি নয় এখনও, সাইকোলজিক্যালি।"

টেবিলে কফি এসে গেল, ছাড়াছাড়া দুচারটে কথাবার্তাও চলল। সুপ্রিয়া নিজেকে একটু গুছিয়ে নিয়ে বলল, "জান সর্বেশ, তপুমামা সদ্যবিবাহিত ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক সংসার সমস্যা নিয়ে বেশ ভাবছেন আজকাল। ঝুলিতে অনেক তথ্যের সংগ্রহ আছে। তা, তোমার মগজের তত্ত্ব দিয়ে এই নোতুন বৌ নোতুন বর আর পুরোনো শাশুড়িদের সমস্যা নিয়ে কিছু বল না ?" সর্বেশ একবার আমার দিকে একবার সুপ্রিয়ার দিকে তাকালো। বলল, "সমস্যা নিয়ে ভাবার দায় বড়দের, আমাদের কাজ তো সমস্যা তৈরি করে দেওয়া। তা তো আমরা প্রত্যেকেই, এবং সকলেই করছি!" আমি শব্দ করেই একটুকরো হেসে উঠলাম। বললাম, "একশোর মধ্যে একশো ঠিক। আর ঠিক বলেই তো আমার ঝোলা পূর্ণ।"

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ তীক্ষ্ন তাকিয়ে থেকে সর্বেশকে বিদ্ধ করে রাখল। তারপর বলল, "তবে যে সেদিন বলেছিলে সংসারের ভাঙনের উৎসেও যে সে নারী। নারী এবং সময় মিলে প্রতিনিয়তই নাকি এই গড়া-ভাঙা আর ভাঙা-গড়া চলছে।" সর্বেশ বেশ চট পট উত্তর দিল। বলল, "সেদিন যা বলেছি আর আজ যা বললাম তার মধ্যে তো কোনও তফাত নেই—একই কথা।" "কি করে এক কথা হয় ?" সুপ্রিয়া যেন আমাকে সাক্ষী মানতেই যোগ করল, "তুমিই বল তপুমামা, দুটো কি এক ?" আমি কিছু বলার আগেই সর্বেশ বলে উঠলো, "বৌকে সময় দিয়ে গুণ করলে শাশুড়ি হয় কিনা বল ?"

ব্যাপারটা নিয়ে সুপ্রিয়া যখন ভাবছে তখন ভাবার সময় না দিতেই যেন বলে গেল, "ছোটবেলায় আমরা সংসারের মধ্যে থাকি কিন্তু সংসারকে বুঝিনা, যৌবনকালে অর্থাৎ সময়ের গুণেকে একসময় সংসারের বাইরে থেকে, বাইরে চলে গিয়ে আবার সংসারের ভিতরে প্রবেশের ছাড়পত্র জোগাড় করি। আবার একদিন, সেই সময়ের হাত ধরেই, সংসারের বাইরে চলে যেতে গিয়েও সংসারের ঠিক মাঝখানটিতে থেকে যাই। এই জীবন পরিক্রমায় ছেলেদের কাজ কিছু নেই, তারা নিমিত্ত মাত্র, তারা অনেকটা সাংখ্যের পুরুষের মত। সময় তাদের মধ্যে বেশি ক্রিয়া করার সময় পায় না, কারণ প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার প্রথা প্রকরণের টানাপোড়েনে যে সংসারের বুনোট তাতে সে থাকে স্থির অচঞ্চল। ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি নারীকে নিয়েই বহুগুণাত্মক ক্ষেত্র-কর্ম বিধি বিধানে জড়িয়ে ফেলে।"

আমি মনে মনে যা ভাবছিলাম তাকে ঠিক কেমন করে বলব ঠিক করতে করতেই সুপ্রিয়া বলে উঠল, "তুমি আজ অকারণেই সহজ কথাকে জটিল করে তুলছো, সেকি তপু মামা আছেন বলে?" সর্বেশ যেন একটু বিব্রত বোধ করল, বলল, "না-না, সে জন্যে কেন হবে? আসলে নারী আর সময়ে মিলে যে দৃশ্য অদৃশ্য পরিবর্তন ঘটে সে তো সকলেরই জানা। এবং এটাও জানা যে নতুন বউ হয়ে এসে যে নারী সংসারে ভোগে এবং ভোগায় সেই নারী চরিত্রই পর্বে-পর্বে, সময়ের জন্যেই, সারাজীবনই ভোগে এবং ভোগায়।" আমি বললাম, "সে-কি পুরুষ প্রধান সমাজ আর নারী প্রধান সংসার বলে?" সর্বেশ বলল, "আমার তো মনে হয় ল' অব কমপেনসেশন এই জন্যেই বেশি করে কাজ করে। আর তাই নিজের সংসারের অভ্যন্তরে অধিকার কম পায় বলে পুরুষ বাইরের জগতে বেশি অধিকার চাইতে থাকে, অন্য দিকে, বাইরের জগতে খণ্ডিত বলেই নারী তার অধিকারকে সংসারের চার দেওয়ালে দৃঢ় করে আঁকড়ে ধরতে চায়। এটাকেই আমি ল' অব কমপেনসেশন বলছি।"

"তার মানে," সুপ্রিয়া বলে উঠলো," তার মানে তুমি বলতে চাও যে নারী মাত্রেই এই আইনের বা ল' এর তাড়নায় সংসারে নিজের অধিকার কায়েম করতে চায় বলেই দুই প্রান্তীয় নারীর মধ্যে একই সংসারে অধিকারের লড়াই অনিবার্য হয়?" "অনেকটাই তাই।" সর্বেশ বলল, "একপ্রান্তে প্রবেশমান তরুণী-যুবতী নারী যিনি স্ত্রীর পাসপোর্ট নিয়ে সংসারে প্রবেশ করছেন, করলেন, আর অন্য প্রান্তে বয়স্ক-প্রৌঢ়া নারী যিনি গৃহিনীর পাসপোর্টখানা

সদম্ভে আন্দোলিত ক'রে নিজের স্থানটি সুরক্ষিত রাখতে বদ্ধ পরিকর। একই খণ্ড সংসার, তার অস্থি-মজ্জা নিয়ে দুই নারীর প্রান্তীয় নখদন্ত উন্মীলন বললে রুচিহীন একটা ইমেজ মনে আসতে পারে, কিন্তু বাস্তবের বেশ কাছাকাছি হবে বলেই আমার মনে হয়।" বললাম, "সকল নারী বিষয়ে একথাটা বোধহয় খাটে না।" সঙ্গে সঙ্গে সর্বেশ বলল, "তাইতো বলেছি অনেকটা তাই, সবটা নয়, সবক্ষেত্রে নয়। নারী মাত্রেই এটা ঠিক—এমন অশ্রদ্ধেয় কথা বলাটা আমার উদ্দেশ্যও নয়, সত্যও নয়।"

"যে সকল ক্ষেত্রে এটা সত্য নয় সেখানে কেন সত্য হয় না?" সুপ্রিয়া সর্বেশকে তাড়া করে জানতে চাইল। সর্বেশ এমন করে বলল—সে তো অত্যন্ত সোজা কথা—যে আমি পর্যন্ত অবাক হয়ে গেলাম। এমন একটা কঠিন প্রশ্নের এমন একটা 'অত্যন্ত সোজা' উত্তর? "সেই সোজা কথাটাই বল না, শুনি।" সুপ্রিয়া ছাড়ার পাত্রী নয়। সর্বেশ বলল, "সেই সব নারীরা সময়কে সঠিক মেপে নিতে পারে, সময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে জানে আর সময় হলে ত্যাগ করে অর্থাৎ সময় যে নেই, চলে গেছে, সেই বোধে নিজেদের স্থির রাখে। রাখতে জানে।" সুপ্রিয়া বলল, "বুঝিয়ে বল, বুঝিনি।" "তুমি কলেজে ভর্তি হয়ে ছ'মাসের মাথায় বলতে পার—'আমার পরীক্ষা নেওয়া হোক এবং পাশ করলে সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হোক?' পার না। কেন পার না? কারণ প্রতিষ্ঠান, বিষয়, পাঠ্যতালিকা শিক্ষাপদ্ধতি—সব-মিলে একটা সিস্টেম, একটা সময়। সুতরাং প্রস্তুতি এবং প্রাপ্তির ব্যবস্থায় সময় অসীম মূল্য ধরে। আবার তুমি স্বাস্থ্যবান কর্মক্ষম হলেই কি বলতে পার—আমি অবসর নেবো না, কারণ আমার অর্থের প্রয়োজন, কাজের প্রয়োজন এবং আরও শত শত প্রয়োজন বা কারণ আছে? পার না। সেখানেও ঐ সিস্টেম এবং সময়।" মাঝখানে বাধা দিয়ে সুপ্রিয়া বলল, "মনে হয় বুঝেছি।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বেশ বলল, "তুমি বাঁচালে। না হলে মামার সামনে যে যুদ্ধং দেহি মূর্তি ক্রমশই প্রকাশ পাচ্ছিল তাতে আবহাওয়া যে কোন্‌দিকে তা বুঝতে পারছিলাম না।"

'আবহাওয়া' কথাটা সর্বেশের মুখে শুনেই আমি সুপ্রিয়ার মুখে শোনা এ্যাক্লেমেটাইজেশন কথাটা ভাবতে লাগলাম। নিমতার বাড়িতে রত্নার পরিচয় দিতে সুপ্রিয়া বলেছিল। ব্যাপারটা নিয়ে নয়নতারার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা রয়েছে। সময় হলে জেনে নিতে হবে। আমাকে অন্যমনস্ক দেখেই বোধহয়

সুপ্রিয়া বলে উঠলো, "কি ভাবছ তপুমামা ?" "না, তেমন কিছু না।" বলেই প্রশ্ন করলাম, "তুমি সর্বেশদের বাড়িতে গেছ কখনও ?" "অনেকদিন গেছি" বলল সুপ্রিয়া, "মাঝে মাঝে তো সারাদিনই ওদের বাড়িতে কাটিয়ে এসেছি।" আমি বলেছি, "সর্বেশের মা-বাবা কিছু বলেন না ?" সুপ্রিয়া মিষ্টি করে একটু হেসে সর্বেশের দিকে তাকাল। তার পরে বলল, "হ্যাঁ, বলেন। তবে বলার চাইতে আমার হাত দেখেন বেশি।" আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বলি, "ওরা দুজনেই, সর্বেশের মা-বাবা বুঝি হাত দেখতে জানেন ?" সুপ্রিয়া খিল খিল করে হেসে ওঠে। সর্বেশ বলে, "না মামা, ওঁরা কেউই হাত দেখতে জানেন না। হাতের গুণ বিচার করে দেখতে চান।" বলেই একবার সুপ্রিয়াকে চোখে বকুনি দিয়ে বলল, "কেন মামাকে জ্বালাচ্ছ ? সরল লোক দেখলেই তোমার কুটিল মনটা আঁকুপাঁকু করতে থাকে বুঝি ?" "বাঃ রে ! মজা করে মামাকে একটা কথা বলা কি কুটিল করে বলা ?" "আচ্ছা কুটিল না বলে জটিল বললে তুমি খুশি তো ?" আমি ততক্ষণ মজাটা বুঝে গেছি। বলেছি "বিশেষণ অবস্থায় সুপ্রিয়ার বেশি আনন্দ পাবার কারণ এই পরিবর্তনেও যথেষ্ট হবে না—প্রথম তো কুটিল, এবারে করলে জটিল—উন্নতি কতোটা হল বলতে পারি না।" সুপ্রিয়া কিছু একটা বলতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সর্বেশ তার দু'টি হাত জোড় করে বলে উঠলো—"ওই অর্থআরোপ শ্রোতার মাহাত্ম্যে, বক্তা অবধ্য !"

এই জটিলা-কুটিলা সংবাদে বা বিবাদে আমার কোনও বিশেষ টান ছিল না। তাই বলেছি, "সেই হাতের গুণ বিচারের ব্যাপারটা কি রকম ? একটু খুলে বল।" এবারে দেখলাম ওরা দুজনে একে-অন্যের ঘাড়ে দায় চাপাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল : তুমি বল, তুমি বল,—তুমি বল না! আমি বললাম, "সর্বেশের মা-বাবার ব্যাপার, তাই সর্বেশই বলবে।" সর্বেশ আমার দিকে না তাকিয়ে সুপ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো, "বিচারেব 'রায়' কতোটা সম্পর্কের ধারে-ভারে আর কতোটা পুরোনো-নোতুনে প্রভাবিত সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন না তুলে মেনে নিলাম।" তার পরে আমার দিকে মুখ করে বলল, "জানেন মামা, এখন সুপ্রিয়ার উপর মায়ের নির্দেশ আছে যে দিন আমাদের বাড়িতে যাবে সেদিন মা শুধু সকালের জলখাবার তৈরি করার দায়-টাই বহন করবেন। অন্যথা সুপ্রিয়ার প্রবেশ নিষেধ! আর বাবা বলেন বিকেলের চা নাকি ফ্লেবার হারায় যদি সুপ্রিয়া তৈরি না করে এবং না পরি-

বেশন করে।" আমি বলি, "তা, এই পক্ষপাতে তোমার মা কোনও অভিযোগ করেন না তোমার বাবার বিরুদ্ধে?" এবারে সুপ্রিয়া বলে ওঠে, "অভিযোগ কি বলছ তপুমামা, দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের পরে তিনি চা করার চাইতে তৈরি চায়ে চুমুক দিতে পারলে নাকি স্বর্গের স্বাদ পান।" "সে চা খাদ্য হোক অথবা অখাদ্য—কি বল সুপ্রিয়া?" সর্বেশ টিপ্পনী কাটল। সুপ্রিয়া ঝিলিক দিয়ে উঠল, "আমার তৈরি চা খাদ্যও হয় না অখাদ্যও হয় না, সে হয় পানীয়, বুঝেছ উপেন এ-যুদ্ধ লইব জিনে!" দুজনেই হেসে উঠল।

ওদের দেখে আর শুনে আমার খুবই ভাল লাগল। ওরা যথারীতি বিদায় নিতে আমিও উঠে পড়লাম। ওদের কথা, ওদের ভালবাসা ওদের পরস্পরের জন্যে অপেক্ষা আমার বেশ ভাল লেগেছিল। অনেকক্ষণই মন জুড়ে ছিল। আমি এক ফাঁকে যখন সর্বেশকে প্রশ্ন করেছিলাম, "তা শুভ কাজে আর দেরি কেন?" উত্তর দিয়েছিল সুপ্রিয়া, বলেছিল, "এই প্রশ্ন করলে সর্বেশ অসন্তুষ্ট হয়। ওর মা-বাবা আগ্রহ দেখিয়ে এ প্রশ্ন করে যা উত্তর পেয়েছেন আর আমি পীড়াপীড়ি করে যে জবাব আদায় করেছি তার কোনটাই প্রকৃত কথা নয়। তাই আর এ প্রশ্ন এখন করি না আমরা।" আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, "এমন একটা সাদাসিধে স্বাভাবিক প্রশ্নে অসন্তোষের কি থাকতে পারে সর্বেশ?" সর্বেশ একটুখানি হেসে বলেছিল, "আসলে অসন্তোষটা ওদের মনে জমা হয়ে আছে। আমার আঁকা-বাঁকা উত্তরে ওদের আগ্রহ বাধা পেয়েছে। তাই ওরা অসন্তুষ্ট। কিন্তু বলে এবং প্রায় পাচার করার মতো করে ঘোষণা করে যে সেই অসন্তোষটা আমার মনে জমা হয়ে আছে।" "তাহলে তুমি সোজাসুজি উত্তরটা দাও না কেন?" সুপ্রিয়ার ভুরু কি একটু কুঁচকেছিল? সর্বেশ বলেছিল, "শুভ কাজকে একটা দিনক্ষণের ছাপ মেরে দিলেই কি কাজটা শুভ হয়? সময় একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকে প্রত্যেক শুভ কাজের বেলায়। বিশেষ করে মামা যে শুভ কাজের কথায় দেরির প্রশ্ন তুলেছেন সেই বিয়ে ব্যাপারটা আদৌ কোন শুভ কাজ নয়. সে শুভ-কাজের গর্ভধারিনী জননী মাত্র। অথবা বলা উচিত. শুভ বা অশুভ জীবনের জননী। সেই কাজটি তাই প্রি-ম্যাচিওর হলেও বিপদের, পোষ্ট-ম্যাচিওর হলেও দুঃখের। আমি সেই সঠিক সময়ের অপেক্ষায় আছি।"

মনে মনে সর্বেশের কথার মূলে পেঁছোনোর চেষ্টা করছি, সুপ্রিয়া বলে বসল, "দেখলে তো তপুমামা? পুরো ব্যাপারটা কেমন জটিল করে ফেলল

এবং তা কতোই না সহজে ?" সঠিক সময় বলতে সর্বেশ ঠিক কি বোঝে বা বোঝাতে চায়—সেই বিষয়েই আমি ওকে প্রশ্ন করব ভাবছিলাম, তা আর করা হল না। সর্বেশ সুপ্রিয়াকেই জবাবে বলল, "দেখ সুপ্রিয়া, জীবনটা নামতার নিশ্চয়তায় চলে না, সে নিজেই বেশ জটিল। তাই তাকে, সেই জীবনকে সরল অঙ্কের মতো সোজা করে বলতে গিয়ে সিমপ্লিস্টিক বলে আক্রান্ত হতে চাই না, সত্যেরও হানি ঘটাতে চাই না।" সুপ্রিয়ার কথায় সর্বেশ বেশ খানিকটা থমকে গেছিল। সুপ্রিয়া বলেছিল, "ভূমিকা অংশ একটু কমিয়ে মূল বক্তব্যটাকে বলে ফেল দেখি, দেখি যার ভূমিকা তাকে বুঝতে পারি কিনা ?"

বেশ ভেবে চিন্তে সর্বেশ বলেছিল, "সঠিক সময় বলতে শ্রেষ্ঠতম সময় বোঝায় না কারণ বাস্তব জীবনে কোনও কাজের জন্যেই কোন শ্রেষ্ঠতম—ইংরেজিতে যাকে বলি বেস্ট বা পারফেক্ট—সময় নেই, থাকতে পারে না। থাকে শ্রেয় সময় বা গুড টাইম। এটা একক ব্যক্তির জন্যে, তার একার অর্জনের জন্যে ঠিক। আবার যে কাজে বা অর্জনে একাধিক ব্যক্তি সমানভাবে বা প্রায় সমানভাবে যুক্ত সেখানে এই শ্রেয় সময় সেই সকল ব্যক্তিদের নির্ধারিত শ্রেয় সময় হওয়া চাই।" "এবারে বুঝতে পারছি" সুপ্রিয়া বলল, "আরও বল।" সর্বেশ বলল, "ছেলে পড়াশুনা ক'রে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই মা-বাবা মনে করেন শুভ কাজের সময় এলো। ছেলে মনে না-ও করতে পারে। তার সময় অন্য এক বা একাধিক মূল্যবোধের টানে আগে পিছে সরে নড়ে যেতে পারে। তেমনি মেয়ের বেলায়ও এই ব্যাপারটা সত্যি। এবারে আর একটা দিক দেখ। ছেলের মেয়ের বিয়ে দিয়ে মা বাবা যা যা চান, ছেলে-মেয়েরা ঠিক তাই তাই চায় না, অন্য কিছু, অন্যতর কিছু চায়। ঠিক কিনা বল ?" সুপ্রিয়া বলেছিল, "অবশ্যই ঠিক।" আমি বলেছিলাম, "তা, এ-সব ঠিক হলেও শ্রেয় সময় স্থির করতে বাধা কোথায় ? মা-বাবা আর সন্তানরা বিষয়টা নিয়ে কথা বলে নিলেই তো মিটে যায়।" "বাধা আসছে দ্বিতীয় ব্যাপারটার অনুসিদ্ধান্তে আর তার পরে একটা যে তৃতীয় বিষয় আসছে তাতে।"

এমন করে সর্বেশ একবার সুপ্রিয়ার দিকে, একবার আমার দিকে দেখছিল যেন প্রশ্ন না করলে সে আর একটি কথাও বলবে না। আমি বলেছি, "সেই অনুসিদ্ধান্তটি কি ?" বেশ বোঝা গেছিল যে প্রশ্ন পেয়ে সর্বেশ প্রীত বোধ

করেছে। বলেছিল, "অনেকগুলোর মধ্যে একটা বলি, বাকিগুলো আপনারা বুঝে যাবেন। একটা এই যে শুভ-কাজের দুই কুশীলবকে জানতে হবে—এবং পরস্পরের জ্ঞাতসারেই জানতে হবে—তারা সনাতন সংসার চায় না আধুনিক জীবন, ঘরের মধ্যে ঘর চায় না ঘরের বাইরে, তারা সামঞ্জস্যের সুখকে চায় না স্বাধীন জীবনের গতির মধ্যে ভোগকে চায়—এমতো আরও। এটা জানার জন্যে সময় চাই না ?"

"তা, এবারে তোমার তৃতীয় বিষয়টা একটু শুনি ?" সুপ্রিয়া বলেছিল। "সেটা সব থেকে সোজা বিষয়। মেয়ের চোখে ছেলেটি এবং ছেলের চোখে মেয়েটি যোগ্য কিনা তা যথাযথ ভাবে নিশ্চয় হয়ে নেওয়া। মেয়েরাই জানবে ছেলেরা যোগ্য কিনা। কিন্তু ক'জন মেয়ে ছেলেদের যোগ্যাযোগ্যতা ঠিক ঠিক দেখে নেয়, নিতে পারে ? ব্যক্তিগত কারণে, সামাজিক অবস্থার চাপে আর প্রভাবিত চিন্তাভাবনার হেতুতে তারা সমূহ সময়কেই সঠিক সময় মনে করতে পারে। ছেলেরা ? প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার আইন কানুন রীতি-নীতি আচার-বিচার—সবই তো তাদের হাতের পাইক-পেয়াদা-বরকন্দাজ। মাভৈঃ। ভবিষ্যতের জন্যে প্রস্তুত হবার মধ্যে যে সভ্যতা, প্রস্তুত থাকার জন্যে যে প্রয়োজনীয় আত্মিক-মানসিক-সামাজিক সংগ্রহ আর অর্জন তার কথা ছেলে-দের ভাবার কথা। সেই ভেবেই তো সঠিক সময় স্থির করতে হবে।"

আমি বলেছিলাম, "তোমার চোখে কি সুপ্রিয়া যোগ্য নয় ?" সর্বেশ পরিষ্কার জবাব দিয়েছিল, "না, এখনও ও যোগ্য হয় নি।" সুপ্রিয়ার নাক-ফুলে ছিল কিনা তা সঠিক না বুঝলেও তার প্রশ্ন উচ্চারণে কণ্ঠের ধার টের পেয়েছিলাম।" "কিসে অযোগ্য বলে মনে করলে ?"

একটা থমথমে ভাব জমাট বেঁধে ছিল। বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বেশ বলেছিল, "জানেন মামা, সিরিয়াস কথা বললে সুপ্রিয়া আরও সিরিয়াস হয়ে যায়! এই জন্যেই এতোদিন এই কথাটা বলিনি। আপনাকে পেয়ে আজ অকপটে বলেছি। পড়াশুনো করার ইচ্ছে থাকলে তা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করাতেই শ্রেয় আছে। ওর এখনও ছাত্রজীবনই শেষ হল না যে!" এমন করে বলল যে আমি কেন সুপ্রিয়া পর্যন্ত হেসে ফেলল. বলল, "বিয়ের পরে কি পড়াশুনো শেষ করা যায় না ?" সর্বেশের উত্তর যেন ঠোঁটের ডগায়ই ছিল। বলেছিল, "তুমি হয়তো শিক্ষক বিয়ে করতে রাজি আছ, গড়রাজি হবার কোন কারণ নেই। আমি কিন্তু ছাত্রী বিয়ে করতে

রাজি নই! আমি বৌ বিয়ে করতে আগ্রহী।" সুপ্রিয়া বলেছিল, "মানে?" সর্বেশ উত্তর দিয়েছিল, "বিয়ের পরে শিব-চারিনী হওয়া অনুচিত। কারণ তাতে বৌ-অবস্থাটা মার খায় আবার ছাত্রী অবস্থানটারও ভরাডুবির সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আর যদি একাচারি হয়ে দাঁড়ায় তাহলে অযোগ্যতার আর অপূর্ণতার দায় ঘাড়ে পড়েই। এবারে বল?" "বলব আবার কি?" কৃত্রিম ফুঁসে উঠে সুপ্রিয়া বলেছিল, "তুমি একটি দুরাচারি তত্ত্বজ্ঞ মাত্র। তাই তুমি আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার আচার-বিচার নিয়ে সময় কাটাচ্ছ। রবিবার দিনই যথাস্থানে রিপোর্টিং করবো। তখন দেখবো তুমি কি বল?"

ওদের কথা ভাবতে ভাবতেই আমার ফেরার পথটা শেষ হয়ে গেল।

অনেকটা রাত পর্যন্ত সুপ্রিয়া-সর্বেশেব কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছিল। সর্বেশের কথার তোড়ে সব কথা জেনে নেবার মতো সুযোগ হয় নি। সর্বেশ সনাতন সংসার আর আধুনিক জীবনের মধ্যে সব জীবনকেই—বিবাহিত জীবনকে—দুভাগে ভাগ করে দেখিয়েছিল। এখন নিজে নিজে সেই কথা ভেবে মনে হল অন্য কোনও বিকল্প বিষয়ে সর্বেশকে প্রশ্ন করা উচিত ছিল। অন্য কোন বিকল্প কি নেই? সনাতন ব্যাপারটাও বেশ পরিষ্কার করে নেওয়া হয় নি। সনাতন সংসার বলতে সর্বেশ কি যৌথ পরিবার বুঝিয়েছিল? যৌথ হলে তা কি বহু-যৌথ না পিতাপুত্র-যৌথ? এটা যেমন জানা হয় নি তেমনি জানা হয় নি আধুনিক জীবন বলতে কি বলতে চেয়েছিল সর্বেশ। সে কি ছিল মা-বাবা থেকে বিচ্ছিন্ন আধুনিক ফ্ল্যাট জীবন না-কি মা-বাবা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে স্বাধীন জীবন? অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে না-কি অতীতের সঙ্গে সম্পর্ককে নোতুন করে বিন্যাস করে নিয়ে? এমন বহু প্রশ্ন তখন মনে আসে নি। কিন্তু এখন আমাকে একা পেয়ে আমার অলস মাথাটাও যেন কেমন সচল হয়ে উঠেছে। চলমান জীবনের ধারায় প্রতিটি দুই পুরুষের মধ্যে—পিতা-পুত্রের সংসার জীবনের মধ্যে সামঞ্জস্যের সূত্রটি কোথায় আছে? বিচ্ছিন্নতা অথবা স্বতন্ত্র জীবন—এর যে কোনও একটা কি অনিবার্য? হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই প্রশ্নটাই তো প্রিয়তোষ আমাকে করে ছিল। আর তখনই আমার মন সর্বেশ থেকে সরে গেল প্রিয়তোষের দিকে।

অপ্রিয় আবর্তে প্রিয়তোষ ঃ

প্রিয়তোষ আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। স্বামী-স্ত্রী এবং এক ছেলে এক মেয়ের সংসার। শান্ত, ভরপুর, মিষ্টি। ছাত্রজীবনের শেষ দিকে প্রিয়তোষ আর রমলার পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়ে চাকরি জীবনের প্রথম দিকে পরস্পরের যৌথজীবন শুরু হয়। প্রিয়তোষ সরকারী চাকরি ক'রে স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে ঘুরে একদিন অবসর নিয়ে নিজের তৈরি গৃহে থিতু হয়। রমলা বেসরকারী স্কুলে শিক্ষিকার কাজ ক'রে ঘরের শ্রী আর শান্তিকে ধরে রাখে। ছেলে মেয়েরা বড় হয়, লেখাপড়া শেষ করে এবং জীবনের যাত্রাপথে পা বাড়াতে প্রস্তুত হয়। মেয়ের বিয়ে দিয়ে অত্যন্ত খুশি মনে প্রিয়তোষ ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে। রমলা পুত্রবধূর বিষয়ে তার নিজের মনোভাবকে প্রিয়-তোষের মনে একে একে সঞ্চারিত করে দিতে থাকে। দুজনে একাএকা অতীতের অনেক স্মৃতিকে অধিকতর মধুর করে স্মরণ করে, আর ভবিষ্যতের সম্ভাব্য জীবনকে রমণীয় করে কল্পনা করে। বরুণ ওদের একমাত্র ছেলে। শান্ত, মাতৃমুখী, বিনয়ী। মা বলে, "হবে না ? ছেলে কার দেখতে হবে তো ? প্রিয়তোষ মৃদু মৃদু হেসে উত্তর দেয়, "তাতো বটেই, তাতো বটেই। আমি তো বাইরে বাইরেই কাটিয়েছি। তুমিই তো ওদের মানুষ করে তুলেছ।" "মনে থাকে যেন" বলেছিল রমলা, "মনে থাকে যেন কথাটা ছেলের বৌ আনার সময় ?" প্রিয়তোষ তেমনিই হাসতে হাসতে তৃপ্তির আকণ্ঠ পানে নিজেকে আন্দোলিত হতে দিয়ে বলেছিল, "পুত্রবধূ নির্বাচন থেকে বরণ পর্যন্ত সব তোমার আর কার্ড ছাপা থেকে পাতা ফেলা পর্যন্ত সব আমার—তাহলে নিশ্চয় ঠিক হবে ?"

এই তো সেদিনের কথা কিন্তু সেই সেদিন আর আজকের দিনের মধ্যে কতোই না প্রভেদ ঘটে গেল। ঝড়ের মতো ঘটনার পর ঘটনা ঘটে গেল, বন্যার মতো চোখের জল সকাল দুপুর রাত্রিকে বিবশ করে তুলল, তর্ক-বিতর্ক কণ্ঠকে কর্কশ করে ফেলল আর মান-অভিমান ফল্গুপথে মনের অতীত বর্ত-মানকে যেন ক্ষয় করে পলকা করে দিল। রমলা তীব্র তীক্ষ্ন এবং প্রায়ই উত্তেজিত। প্রিয়তোষ অকারণ সমস্যায় জর্জরিত। সেই সব কথা বলতে বলতে প্রিয়তোষ প্রশ্ন করেছিল, "এ-সব কি অনিবার্য ছিল ?"

আমি বলেছিলাম, "অনিবার্য ছিল কিনা তা বলতে পারব না, তবে অনি-

বার্য যে করে তোলা হয়েছিল তা বুঝতে পারছি।" প্রিয়তোষ কিছুক্ষণ আমার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে বলেছিল "যা ঘটে তা অনিবার্য বলেই ঘটে? নাকি ঘটে বলেই অনিবার্য বলি?" এত জটিল প্রশ্ন আমার মাথায় বেশ তাড়াতাড়ি উত্তর খুঁজে পায় না। তাই হয়তো মনে মনেই প্রিয়তোষের কথাগুলো নাড়াচাড়া করছিলাম, সময় নিয়ে ভাবনাকেও ভাবতে সময় দিচ্ছিলাম। প্রিয়তোষ বলে উঠেছিল, "কিছু একটা বল তপেন, আমার যে সবই গোলমাল হয়ে গেছে, যাচ্ছে!"

সেদিন প্রিয়তোষকে বিশেষ কিছু বলতে পারিনি। বলতে পারিনি কারণ নিজে আমি ভেবে কিছুই পাই নি। আজ মনে হল প্রিয়তোষের প্রশ্নটা নয়নতারাকে করলে হয়তো বা কোনও সুরাহা হতে পারে। মনে মনে ঠিক করলাম ফিরে এসে তাকেই প্রিয়তোষের সব কথা বলে জেনে নিতে হবে যা অনিবার্য তাই ঘটে, না, যা আমরা ঘটিয়ে তুলি তাকেই পরে অনিবার্য বলি।

ঘুম আসছিল না! প্রিয়তোষ আর রমলা সব চেতনাকে আটকে রেখেছিল। স্কুল থেকে রমলা ফিরে এসে প্রিয়তোষকে বলেছিল, "তোমার ছেলের জন্যে মেয়ে ঠিক করে ফেলেছি।" চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে প্রিয়তোষ বিস্ফারিত চোখে প্রশ্ন করেছিল, "একেবারে ঠিক করে ফেলেছো?" রমলা বেশ জোর দিয়ে জানিয়েছিল "একরকম ঠিকই। আমার এক সহকর্মী শিক্ষিকার মেয়ে। মেয়েটি ভারি মিষ্টি স্বভাবের। বহুবারই তাকে দেখেছি। খুব সুন্দরী নয় তবে বেশ ফরশা এবং স্বাস্থ্যটি সুডোল। উচ্চমাধ্যমিক পাশ। আমার খুব পছন্দ।" প্রিয়তোষ বলেছিল, "সে তো খুব ভাল কথা। তোমার পুত্রবধূ অবশ্যই তোমার পছন্দের হবে, আমি সেখানে কিছুই বলব না। তবে তোমার ছেলে বড় হয়েছে, তার একটা মতামত…' রমলা প্রিয়তোষকে কথা শেষ করতে দেয় নি। মাঝপথে বাধা দিয়ে বলেছিল, "ছেলের আবার মতামত কি? ও বোঝে কি? আমরা যা ঠিক করে দেবো তাই ওর পছন্দ হবে।" এ প্রসঙ্গে যে আর কোন কথা থাকতে পারে অন্যকোন বিচার্য থাকতে পারে তা যেন উড়িয়ে দিতেই রমলা আঁচল গুছিয়ে চায়ের ট্রে হাতে চলে গিয়ে বুঝিয়ে দিল।

প্রিয়তোষ অনেকক্ষণ একা একা বসে ছেলের বিষয় রমলার মনোভাব এবং উচিত অনুচিত নিয়ে ভেবেছিল। ওর মন সায় দিচ্ছিল না। বার বারই

যেন বলে চলেছিল—এ ঠিক নয়, এ ঠিক নয়। ছেলে বড় হয়েছে কম্পিউটার টেকনলজিতে ডিপ্লোমা করে একটা বেসরকারী সংস্থায় বেশ কিছুদিন কাজ করছে। মাইনে এমন কিছু নয় এখন তবে ভবিষ্যতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে। পাশের ঘরে রমলার সাড়া পেয়ে প্রিয়তোষ বলেছিল, "শোন, একবার সময় পেলে এখানে আসবে কিন্তু, কথা আছে।" কথা যে ছিল তা প্রিয়তোষের মন বার বারই বলে উঠতে চাইছিল। কিন্তু রমলার তখন অনেক কাজ বাকি পড়ে ছিল বলে এক ফাঁকে কাছে এসে বলেছিল, "নাও কি কথা আছে তা তাড়াতাড়ি সেরে নাও। আমার সময় নেই।" প্রিয়তোষ রমলার চোখের ছটফটানি লক্ষ্য করে বেশ একটু বেদনা মিশিয়েই বলেছিল, "দেখ রমলা, আমার মনে হয় কোন কোন সময়ে সময় একটু বেশি দিতে পারলে পরে হয়তো অনেক অসময়কে এড়িয়ে যাওয়া যায়।" রমলা বেশ একটু রাগ ভাবেই বলেছিল, "তোমার হেঁয়ালি ছেড়ে একটু সোজা করে আসল কথাটা বলে ফেল দিকি!"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে প্রিয়তোষ বলেছিল, "বস বলছি।" রমলা চেয়ারে বসেছিল। একটু আড় হয়ে বসে প্রিয়তোষের দিকে চোখ নিয়ে বলেছিল "এই তো বসেছি, বল।"

বিষয়ের গভীরতা বোঝাতে প্রিয়তোষ বেশ ধীরে ধীরে বলেছিল, "দেখ রমলা, ছেলেমেয়েরা বড় হলে তাঁদের একটা নিজস্ব জীবন তৈরি হয়ে ওঠে। তোমার ছেলে এখন তো আর ছোটটি নয়। কারো প্রতি তার ভাব ভালবাসাও তো থাকতে পারে....' রমলা প্রায় থামিয়ে দিল। বলল, "প্রেম? আমার ছেলে? ককখনো না! তুমি তাহলে বরুণকে চেনই না। আমাকে ছাড়া সে কিছুই চেনে না।" বলে সে প্রায় উঠেই যাচ্ছিল। প্রিয়তোষ বলেছিল, "তাছাড়া···" রমলা ভুরু তুলে জানতে চেয়েছিল, "তাছাড়া?" প্রিয়তোষ রমলাকে চেয়ারে আটকে দিতে পেরে মনে মনে খুশি হয়েছিল, "তাছাড়া বিয়েটা তো সে নিজে করবে? করবে কিনা বল? তার আর্থিক দায় আছে, সামাজিক দিক আছে, মনের একটা প্রস্তুতি বলে কথা আছে। এসব ভাবতে হবে না?" "ভাবতে হয় তুমি ভাব। আমার অত ভাবনা চিন্তার সময় নেই। ছেলে বড় হয়েছে, আমার বয়স হয়েছে তুমি অবসর নিয়ে ঘরে একা একা থাকছ তাই একজন বৌ ঘরে এখন অত্যন্ত দরকার। মনে মনে ভাবছিলামই; তা এই মেয়েটিকে দেখা মাত্রই আমার মনে হল এই তো পেয়ে গেছি। আর যেই

ভাবা অমনি কথা বলেছি। আজ-না-হয়-কাল ছেলে তো বিয়ে করবেই। তা এ-মেয়ে আমার পছন্দ। তাই একেই করে ফেলবে। এতে এতো ভাবনার কি আছে ?" রমলা আর তখন অপেক্ষা করে নি, বলে উঠে গেছিল।

ফাঁকা বারান্দায় একা চেয়ারে বসে প্রিয়তোষ সেদিন অনেক কথাই ভেবেছিল, মায়েদের এই যে অন্ধ দাবি এই যে অধিকার বোধ এই যে নিশ্চয় করে সন্তানের ভবিষ্যৎ স্থির করে দেখার বাসনা এ সবই তো ছোটবেলায় বাস্তব। বাস্তব এবং গ্রাহ্যও। কিন্তু সন্তানরা যখন বড় হয়ে যায়, ব্যক্তিমনের মালিক হয়ে নিজেরাই নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করে তখন মায়েরা কেন নিজেদের গুটিয়ে নিতে পারে না, একটা সীমার মধ্যে অধিকারকে একটা সময়ের দাবিকে আটকে রাখতে পারে না ? মায়েদের জঠর থেকে মুক্তির পথ আছে কারণ সেখানে প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে। কিন্তু মনের জঠর থেকে মুক্তির বা ভূমিষ্ঠ হবার সুযোগ কেন থাকেনা ? সে কি মায়ের মনের প্রকৃতির জন্যেই ? এখানেও তো সেই প্রি ম্যাচিওর মুক্তি আর পোস্ট ম্যাচিওর ছাড়পত্রের ব্যাপারটা সমান ভাবেই কাজ করতে পারে ? আগে মুক্তি দিলে যেমন বিপদের সম্ভাবনা, দেরি করে ধরে রাখতে গেলেও তো তেমনি সর্বনাশের ডংকা বেজে উঠতে পারে ?

রাত্রে যখন রমলাকে ফাঁকা পেয়ে এই সব কথা বলেছিল তখন রমলা বলেছিল, "ও সব তোমার কেতাবি কথা। তোমরা তো আর পেটে ধর না তাই ছেলে মেয়েদের বিষয় বইপত্রে জান। আমাদের জানা-বোঝাটা ঘটে রক্তের প্রবাহে, নাড়ির টানে। তাই তোমাদের বুঝতে সময় লাগে, আমাদের জানতে হয় অনুভবে। আমরা হট-লাইনে টের পাই, তোমরা থট প্রোসেসে জ্ঞানী হয়ে ওঠো। এখন রাত হয়েছে ঘুমোও।"—রমলা টানটান করে ভাঁজ করা কাপড় আলনায় সাজিয়ে রাখার মতো করে নিজেকে পাশ ফিরিয়ে বালিশে রেখেছিল। প্রিয়তোষ নিজের খোলা চোখদুটোকে অন্ধকার মাপার কাজে সিলিং-এর দিকে স্থির ধরে রেখেছিল।

সেই রাত্রে অনেক ভেবে প্রিয়তোষ নিজের ইতিকর্তব্য স্থির করেছিল। সেই মতো প্রথম সুযোগেই ছেলের সংগে কথা বলেছে। বলেছে, "দেখ বরুণ তুমি এখন বড় হয়েছো, নিজের ভালমন্দ নিজের বোঝার বয়স হয়েছে। তোমার মা তোমার বিয়ের কথা ভাবছেন, মেয়েও দেখেছেন। এ-বিষয়ে তোমার মতামত কি ?" বরুণ মেঝের দিকে দৃষ্টিকে ধরে রেখেছিল। বলে নি কিছুই। তাই বাধ্য

হয়েই প্রিয়তোষ বলেছিল, "যদি তুমি নিজে কোনও মেয়েকে পছন্দ করে নিতে চাও তাহলে তা তোমার জানানো উচিত। আমাকে না জানালেও চলবে। কিন্তু তোমার মাকে জানাতেই হবে। কারণ এই পরিবারের তিনিই গৃহিনী। গৃহবধূ ঠিক করার সব অধিকার আমি তাঁকেই ছেড়ে দিয়েছি। তাঁর অমতে কিছুই হবে না কারণ তা হওয়া উচিত নয়। তিনি গৃহের কর্ত্রী, সংসারের গিন্নী এবং তোমার জননী। তাঁর অধিকার তাই অসীম।"

প্রিয়তোষ অনেকক্ষণই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। আশা করে-ছিল কিছু একটা অন্তত বলবে। কিন্তু বরুণ সেদিন নির্বাক শ্রোতা হয়েই বাবার কথা শুনেছিল। তাই উপদেশ দেবার মতো করে প্রিয়তোষ বলেছিল, "এই ব্যাপারে—এই বিয়ের ব্যাপারে তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে খোলামেলা কথা বলে নেবে এটাই আমি আশা করব। কোন অনুযোগ অভিযোগ যেন ভবিষ্যতে না আসে সেই জন্যেই একথা বলা। তোমার মায়ের সিদ্ধান্তকেই আমি মেনে নেবো জানবে।" বরুণ কিছু না বলে চলে গেছিল।

এতো কথা যে প্রিয়তোষ সেদিন বলেছিল তার একটা কারণ ছিল। মেয়ের বিয়ে হয়ে যাবার পরে যখন ছেলের বিয়ে দেবার ব্যাপারটা রমলার মনের মধ্যে নড়াচড়া করছিল আর ফাঁকা ঘরের একা সময়ে শূন্যঘরে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল, তখনই একদিন বন্দনা বলেছিল,"দাদার বিয়ের ব্যাপারে দাদাকে একটু জিজ্ঞাসা করে নেবে কিন্তু বাপি! "প্রিয়তোষ অবাক হয়ে বলেছিল, "সে তো নেবোই, এটাতে তুই বলার মতো কি পেলি ? সবিশেষ তোর ঐ 'কিন্তু' ব্যবহারটাতে তো বেশ ধাঁধায় পড়ে গেলাম !" বন্দনা বলেছিল, "না, এমনিই বললাম। দাদা তো এখন আর সেই ছোট্টটি নেই !" প্রিয়তোষ বেশ গভীর করে মেয়েকে বুঝে নিতে চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, "দাদা যে আর ছোট্ট নেই তা বোনের কাছ থেকে জানতে হলে বুঝতে হবে বোন দাদা বিষয়ে অন্য কিছু বলতে চাইছে। সেই অন্য কিছুটা কি বল দেখি ?" বন্দনা বলেছিল, "সে তুমি দাদাকেই জিজ্ঞেস করে নিও। দাদার নিজের পছন্দের কোন মেয়ে থাকতে পারে তো! বন্দনা আর কিছু বলে নি। শুধু প্রিয়তোষ যখন বন্দনার বলা কথাটা নিয়ে ভাবছিল, তখন যেতে যেতে বন্দনা বলে গেল, "আছেই সে কথা বলছি না, থাকার সম্ভাবনার কথাটাই বলেছি মাত্র।"

প্রিয়তোষ বিষয়টাকে আর হালকা ভাবে নিতে পারে নি। বন্দনার কথায় হিমশৈলের স্বল্প-চূড়া ছিল না তিলের মধ্যে তালের প্রকাশ ছিল বুঝে

নিতেই একদিন প্রসঙ্গটি রমলার কাছে পেড়ে দেখেছিল। রমলা যে পরিমাণ জোরের সঙ্গে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল তাতে প্রিয়তোষ একটু গোলমালেই পড়েছিল! রমলার উত্তেজনার পিছনের সম্ভাব্য কারণ খুঁজতে গিয়েও প্রিয়তোষ থেমে গেছিল। অনেক পরে প্রিয়তোষ জানতে পেরেছিল যে বন্দনা যা জানত রমলাও তা জানত। যে মেয়েটিকে বরুণের পছন্দ সেই মেয়েটি রমলার পছন্দ নয়। রমলার অপছন্দের কারণ রমলা যা যা বলেছিল তাই তাই ছিল কিনা সে বিষয়ে কোনও তথ্য নেই। যা আছে তা প্রিয়তোষের অনেক পরের অনুমান। আমার মতামত চেয়ে প্রিয়তোষ প্রশ্ন করেছিল, "তোমার কি মনে হয় তপেন, রমলা কি মেয়েটির দোষের জন্যে বা গুণের অভাবের কারণেই তাকে পছন্দ করে নি? পুত্র-অন্ত-প্রাণ রমলা কি তার অজ্ঞাতে একটি মেয়েকে পছন্দ করে ঘরে আনলে তার বিশ্বাসে আর আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে বলে—তার এতোদিনের বিশ্বাস আর মাতৃগর্বের আত্মসম্মানে আঘাত লাগবে বলেই—অপছন্দ ঘোষণা করেছিল? আর তাই কি সে ছেলেকে আটকে দেবার জন্যেই হঠাৎ সহকর্মীর মেয়েকে পছন্দ করে আমার মতামত চেয়েছিল?"

প্রিয়তোষের প্রশ্নের কোন উত্তর আমি দিতে পারিনি। যথাযোগ্য আনুপূর্বিক তথ্য আমার জানা ছিল না। তাছাড়া দীর্ঘ জীবনের শেষ কালে এসে এই যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার একটুখানি লুকোচুরি—যদি একে লুকোচুরিই বলা যায়—তাহলে সেই আলো আঁধারিতে বাইরের আমার পক্ষে যে-কোনও বক্তব্যই, সমর্থন বা অসমর্থন—ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই চুপ করেই ছিলাম সেদিন। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে প্রিয়তোষ নিজেই বলেছিল, "যদি রমলা জেনে বুঝে আমাকে কনফিডেন্সে না নিয়ে থাকে, যদি নিজে নিজে একক চিন্তা ভাবনার সাহায্যেই ছেলেকে ফোরস্টল করতে অন্য মেয়ে স্থির করে থাকে তাহলে স্বামী হিসেবে আমি ব্যর্থ, পরিবারের কর্তা হিসেবেও আমি অসফল।" প্রিয়তোষের আপন মনের সোচ্চার কথায় ওর জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছিল। সেটা ভেবেই বোধহয় বলেছিল, "জানি এ-সব কথা বলে আমি আমার মনের ব্যথাকে তোমার মনে ছড়িয়ে দিচ্ছি। কিন্তু মনের কষ্টকে প্রকাশ করতে না পারলে যে সেই কষ্টটা বেড়েই যায়। বোধহয় তাই এতো কথা তোমাকে বলছি।"

আমার ঘুম আসছিল না। প্রিয়তোষের কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম

রমলার কথা। ওদের ঘনিষ্ঠ জীবন থেকে বিবাহোত্তর জীবন পর্যন্ত দিনগুলো আমার বিস্তারিত জানা। ঝড়-ঝঞ্ঝা-তুফান, বহু ইচ্ছা-অনিচ্ছার টানাহেঁচড়া-এবং সব শেষে ওদের বিজয়, অনেক যন্ত্রণার অবসানে স্বপ্নের জীবন। সে সব রমলা ভুলল কেমন করে? তখন রমলা মা ছিল না, তখন প্রিয়তোষ ছিল না নিজের সন্তান। আজ যখন তার নিজের সন্তান তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পছন্দ না করা একটি অপছন্দ-মেয়েকে নিজের বলে গ্রহণ করার বাসনা পোষণ করছে তখনই রমলা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। কেন? অতীত কোনও ছায়া ফেলল না, বর্তমান গর্জে উঠলো। আর ভবিষ্যৎ?

সেই ভবিষ্যৎ যখন সোজা সামনে এসে দাঁড়াল তখন প্রিয়তোষ একটুখানি সামলে নিয়েই ছুটে এসেছিল আমার কাছে। বলেছিল, "বরুণ বোধহয় আলোকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। রাত্রে বাড়ি ফেরেনি কাল। খবর নিয়ে জেনেছি আলো বলে মেয়েটিও নিরুদ্দেশ। দুয়ে দুয়ে চার। তাই থানা পুলিশ করিনি। অপেক্ষা করে আছি যদি কোনও সূত্রে কোনও খবর পাই।" আমি জানতে চেয়েছিলাম, "রমলা? রমলা কি করছে?" "সারারাত ঘরবার করেছে, সকাল থেকে কান্নাকাটি করেছে, এখন পাথর হয়ে বসে আছে!"

তখনই মনে হল এই ঘটনা কি অনিবার্য ছিল? এই পালিয়ে যাওয়া? ছেলের যা অধিকারের মধ্যে পড়ে তা ছেলে বলতে পারল না মাকে। এবং বাবাকেও। মায়ের যা অধিকারের মধ্যে পড়ে না মা তাই করতে উঠেপড়ে লেগে গেলেন। ছেলে নিজের ম্যাচিওর জীবনে প্রবেশ করেও নিজের সীমানা চিনে নিতে পাবল না, মা সারাজীবন সংসার করতে করতে কখন যে সীমার ওপারে চলে গিয়েও বুঝলেন না যে সীমানার ওপারে গিয়েও কেন্দ্রে থাকার বাসনা অপরের যন্ত্রণার কারণ হতে পারে। ছেলে মাকে ভয় পেল, আর ভয়ে ভয়েই প্রার্থীত জীবনকে নিয়ে পালিয়ে গেল। মা ছেলেকে ভয় পেলেন, ছেলের পছন্দকে ভয় পেলেন এবং শেষ কালে ভয়ের আঘাতেই পাথর হয়ে গেলেন। আমি চুপ করে আছি দেখে প্রিয়তোষ বলল, "কি ভাবছ? কিছু বল?" আমি বলেছিলাম, "বরুণ আত্মবিশ্বাসী নয় কিন্তু যা ওর করা উচিত তাই করেছে—কিন্তু গ্রেসফুলি না করে ডিসগ্রেসফুলি করে বসেছে। ও নিজের অধিকারের মধ্যেই আছে। চলে আসবে। কারণ যা ওরা করেছে তা মায়ের ভয়ে করেছে। আর ফিরে আসবে তোমার ভরসায়। তাই ওদের

নিয়ে না ভেবে তুমি বাড়ি গিয়ে রমলাকে সামলাও। তোমাকে তার এখন অত্যন্ত দরকার।"

"রমলাকে সামলানো যে আমার আশু কর্তব্য তা আমি নিজেই বুঝে ছিলাম।" প্রিয়তোষ বলেছিল, "কিন্তু ওরা যে ফিরে আসবে, এবং তাও আবার আমার ভরসায়—এই কথাটা আমার পরিষ্কার বোধগম্য হল না।" আমি বলেছি, "অত্যন্ত সহজ। বরুণ তার মাকে ভয় করে। তোমাকে নয়, তোমার বিচার শক্তির উপর তার আস্থা আছে। কিন্তু তুমিও যে *রমলাকে ছেলের ব্যাপারে ব্ল্যাঙ্ক চেক দিয়ে রেখেছ, মেয়ে পছন্দের ব্যাপারে রমলার* কথাই তোমার কথা বলে ঘোষণা করে দিয়েছ সেখানেই বরুণ তোমাকে নির্ভর করতে পারে নি, তোমার কাছে সমস্যাটাকে হাজির পর্যন্ত করে নি। সমূহকে বাঁচানোর জন্যেই ওরা দূরে সরে গেছে।" "কিন্তু", প্রিয়তোষ বলল, "কিন্তু ফিরে আসবে বলছো কি করে?" বলেছিলাম, "বলছি এই জন্যে যে তোমার উপর ওদের বিশেষ করে বরুণের যথেষ্ট আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে যে সমস্যা যেখানেই থাক তুমি তার সমাধান বের করতে পারবে এবং সব থেকে বড় কথা, ওদের আশু ভয়টা কেটে গেলে, উত্তেজক অবস্থাটা শান্ত হয়ে এলে ওরা তুমি ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাবে না।" প্রিয়তোষ বোধহয় একটু আশ্বস্ত হতে পারল। বলল, "টাকা পয়সার ব্যাপারটা কি ওদের ফিরে আসতে বাধ্য করতে পারে না, তপেন? বরুণের তো তেমন আর্থিক জোর নেই এখনও। সংগতি নেই স্বতন্ত্র সংসার বসানোর!" বলেছিলাম, "একশোবার বাধ্য করতে পারে। আর পারেই বা বলছি কেন, বাধ্য করবেই। অর্থের অভাবের জন্যেও বটে, মানসিক কারণেও বটে। স্নেহ ভালবাসায় লালিত পালিত সন্তানরা অবস্থার চাপে দূরে সরে যেতে পারে কিন্তু দূরে থেকে যেতে পারে না। স্নেহ-ভালবাসা-অভিভাবকত্বের টানটা কম জোবালো নয়।"

আপন মনে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে প্রিয়তোষ সেদিন চলে গেছিল। যাবার সময়ে বলে গেল "তোমার কথায় অনেক স্বস্তি পেলাম। বাড়ি গিয়ে তাহলে রমলার পাশে থাকি আর ওদের ফেরার প্রত্যাশায় অপেক্ষা করি—কি বল?" "অবশ্যই"—বলে দরজা পর্যন্ত প্রিয়তোষকে এগিয়ে দিয়েছিলাম।

ওরা ফিরে এসেছিল পরদিনই। তিরিশ ঘণ্টার নাটক শেষ করে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করে আর প্রভূত দুশ্চিন্তা তৈরি করে বরুণ পরদিনই রাত্রে বাড়ি

ফিরে এসেছিল। অত্যন্ত ভয়ে দরজার বেল টিপেছিল। প্রিয়তোষ দরজা খুলে ওদের দেখেই বলেছিল, "এসো, ঘরে এসো, ভিতরে চল।" বড় বড় আয়ত চোখের গভীরে বেদনাকে সিক্ত করে বন্দনা সভয়ে প্রিয়তোষের পায়ে একটি নম্রনত প্রণামকে ধীরে ধীরে ন্যস্ত করে দিয়েছিল। প্রিয়তোষ তার মাথায় স্নেহকরস্পর্শের ছোঁয়ায় পুত্রবধূকে আশ্বস্ত করেছিল। ঘরে ঢুকেই প্রিয়তোষ তার আরামকেদারায় দেহভার রেখে বলেছিল, "হাতমুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর, শান্ত হও, নির্ভয় হও।" বরুণ বাবার পাশে দাঁড়িয়ে কিছু একটা বলার জন্যে ক্ষণকাল অপেক্ষা করেছিল। তারপরে কি ভেবে ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেছিল।

পরদিন প্রিয়তোষ যখন আমার কাছে এলো তখন সে বিধ্বস্ত। দুটি সূর্যের উদয়-অস্তের মধ্যে তার সামাজিক ব্যক্তিত্ব ধরাশায়ী, তার পারিবারিক আদর্শ ক্ষতবিক্ষত, তার এতোদিনের তিলে তিলে গড়ে তোলা বিশ্বাস আর মূল্যবোধ প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকে গেছে। রমলাকে সে যেন আর চিনতে পারছে না। সুদূর অতীতের ছাত্রজীবন থেকে ধীরে ধীরে দিনে দিনে যে রমলাকে প্রিয়তোষ দেখে এসেছে চিনে নিয়েছে আঘাতে-সংঘাতে দুঃখে-বেদনায় আনন্দে-উল্ভাসে, সেই রমলা এখন যেন একেবারেই এক অপরিচিতা রমণী বলে প্রিয়তোষের মনে হচ্ছে। পদে পদে, পলে পলে, প্রতিটি অবস্থার চাপে যেন সেই হার্দ রমলার ভিতর থেকে এক অচেনা নির্দয় যুক্তিহীন ধৈর্য্যহীন নারীর প্রকাশ ঘটে চলেছে। প্রিয়তোষ বলেছিল, "এতো দিন যে জেনে এসেছি শিক্ষা-দীক্ষা রুচীবোধ, চিন্তাভাবনা, কৃষ্টি-সংস্কৃতি—এ-সব মানুষকে মানুষ করে তোলে, তার মধ্যে সহনশীলতা, ধীরতা আর অপরের অনুভবকে মূল্য দেবার গুণ তৈরি করে দেয়—সে কি তবে যথার্থ নয়? সে সব কি নারীর ক্ষেত্রে সত্য নয়?" যন্ত্রণাকাতর মনের গভীরে ক্ষতবিক্ষত প্রিয়তোষকে সঙ্গে সঙ্গে কোনও উত্তর দেই নি। উত্তেজিত বিধ্বস্ত মনে না থাকলে প্রিয়তোষ অবশ্যই এমন কথা বলত না। নারী যে প্রেমের উৎস ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা, কন্যা-জায়া-জননীরূপে যে নারী জীবনের ধারক ও বাহক সেই নারী যে মানব সমাজের ভগীরথ, তা প্রিয়তোষের মুখে কতোবারই তো শুনেছি। অথচ আজ অনির্বাচিত, পুত্র-নির্ধারিত পুত্রবধূর সমাগমে সেই নারীই কেমন অভাবনীয় হিংস্র আচরণে সংঘাত মুখর। বলেছি, "দেখ প্রিয়তোষ, যে নারী জননী হিসেবে অশেষ দুঃখকষ্ট অবলীলায়

সহ্য করে সন্তান প্রসব করে, বিনিদ্র রজনী যাপন ক'রে যে নারী সেই সন্তানের শুভকামনায় সময় কাটায় আর তিলে তিলে নিজের মনের ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দিতে সদাসর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সেই নারীই একদিন অপর একটি নারীকে তার এতো দিনের এতো সাধের ধনকে 'হস্তান্তর' করতে বোধহয় জীবনের সবথেকে বড়ো আঘাতটির মুখোমুখী হয়ে পড়ে। তাই সে হিংস্র হয়ে স্বার্থ রক্ষায় সচেষ্ট হয়, নখ-দন্তে প্রকৃতি হয়ে ওঠে।"

প্রিয়তোষ ঘনঘন মাথা নাড়ছিল, বলেছিল, "তোমার এ-কথা মানতে পারছি না তপেন। প্রকৃতিতে ব্যবস্থা অন্যরকম। সেখানে মানসিকতা সামাজিক নিয়ম-নীতির প্রভাবে ঘটে না— প্রকৃতির রীতি-পদ্ধতিতেই অনুসৃত হয়। তাই সেখানে 'হস্তান্তর' ব্যাপারটাই নেই। প্রাণিজীবনের প্রত্যেক প্রাণীর স্ব-ভাবটা স্বাভাবিক, সহজ। সময়ের সীমারেখা—অধিকার আর আবেগের সময়সীমাগুলো—সেখানে প্রকৃতি নির্ধারিত। মানুষের বেলায় অন্যরকম। তাই যে নারী নিজের জীবনসন্ধিক্ষণে গর্ভধারিণী জননীকে অবহেলায় পিছনে ফেলে পুরুষের হাত ধরে নীড়-রচনায় একলব্য হয়ে ওঠে, সেই নারীই অনায়াসে নিজের গর্ভজাত সন্তানের বেলায় অন্য মূর্তি গ্রহণ করতে চায়। স্ববিরোধ প্রকৃতিতে অচল, কিন্তু মানুষের বেলায়, মানুষের স্বার্থ-স্বভাবের টানেই বোধহয়, অত্যন্ত সচল।" "তার মানে", আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "কখন ধরতে হবে সেটা জানলেও নারী জানে না কখন ছাড়তে হবে? এটাই কি তুমি বলতে চাও?" প্রিয়তোষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, "আমার তো তাই মনে হয়। রমলা সংসারকে ধরেছিল, একেবারে আপন করে নিয়েছিল। আর আজ যখন সেই সংসারকে ছেলে বৌ-এর হাতে ছেড়ে দেবার সময় এলো তখন সে যেন অনেক বেশি করে তাকে আঁকড়ে ধরতে চাইল।"

আমি একটু কিন্তু কিন্তু করে বলেছি, "যে মেয়ে তার নিজের পছন্দ করা নয় সেই মেয়ের হাতে সংসার কেমন চলবে এ বিষয়ে রমলার মনে তো প্রশ্ন বা সন্দেহ থাকতেই পারে?" প্রিয়তোষ সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিল, "ওটা বাহানা। আমরা—আমি আর রমলা দীর্ঘ তিন দশকের উপর তো সংসার করলাম। এখন সেই সংসার তো বরুণের আর বরুণের যে স্ত্রী হবে তাদের। ঠিক কিনা বল? ওদের তিন দশকের সংসার-ও কি রমলাকে করতে হবে? তাহলে ওরাই বা সংসার করবে কখন? রমলাই বা সংসারকে ছাড়বে কখন? তাছাড়া", প্রিয়তোষ একটু ভেবে নিতে সময় নিল। আমি চোখের প্রশ্ন ওর

মুখে ধরে রেখে অপেক্ষা করলাম। "তাছাড়া, রমলার পছন্দের মেয়ে যে রমলার ইচ্ছে মতো 'রমলার' সংসার করবে আর বরুণের পছন্দের আলো তা করবে না তা কেমন করে মেনে নেবো? রমলাই বা তা কেমন করে ধরে নিতে পারে?"

প্রিয়তোষের কথাগুলো যেন এই এতোদিন পরেও আমার কানে সজীব বাজছিল। মনে মনে ভাবছিলাম বিয়ের পরে নারীর সংসার প্রবেশের প্রকৃত সময় নির্ঘণ্টটি কেমন হওয়া উচিত। পাশাপাশিই মনে আসছিল জীবনভোর সংসার যাপনের পরে সেই নারীই যখন অন্য এক নারীর হাতে সংসার ভার ন্যস্ত করতে বাধ্য তখন সেই তার ফেলে আসা সংসার থেকে কখন এবং কোন পর্যায়ে সে বেরিয়ে যাবে? তাহলে কি যত গোলমাল এই প্রবেশ আর নির্গমনের সময় সূচীতে? এই ক্ষেত্রে পুরুষ কি কেবলমাত্র দর্শক, নিমিত্ত? মনে প্রশ্ন এলো ঃ সংসার আসলে কি? কোন কোন বিষয়? স্বামী আর স্ত্রীর সংসারে—বলতে কি তাহলে শুধুমাত্র স্ত্রীর সংসার বোঝায়? সংসারের যৌথ জীবনে বহু গার্হস্থ্য খুঁটিনাটি বিষয় থাকে যা নিয়ে স্ত্রীর চিন্তার শেষ থাকে না, কিন্তু পুরুষ থাকে ভাবনাহীন। সেই সব খুঁটিনাটি কি? হাতাখুন্তি ভাতের হাঁড়ি? জামাকাপড়ের আলমারি আর বিছানাপত্রের ট্রাঙ্ক তোরঙ্গ? চা-জল-খাবার-আহার-বিহার? সেই সব জিনিস কি নারীকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে কিন্তু পুরুষকে স্পর্শ করে না? না-কি এটা জীবন-আর দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার? পুরুষের বাইরের জগৎ আছে বলেই কি সে নিস্পৃহ থাকতে পারে ভিতরের সংসার থেকে? সেও তো সর্বথা সত্য নয় কারণ রমলার বাইরের জীবন আছে, তার চাকরি আছে। রমলার মতো শত শত নারীরই তো বাইরের জীবন আছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তো রমলারা 'সংসার' ছাড়ার সময়টি ঠিক করে নিতে পারে না!"

প্রিয়তোষের কথাগুলো মনে পড়ল। প্রিয়তোষ বলেছিল, "জান তপেন, আলোকে রমলা নিজে পছন্দ করে আনে নি বলেই আলোর সব কাজে রমলা খুঁত ধরে। আলো রান্না জানে না, আলো পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন নয়, আলো জিনিসের যত্ন জানে না, আলোর সময়জ্ঞান নেই, আলোর ঘুম বেশি"—এমন শত শত দোষের খতিয়ান রমলার মুখে প্রিয়তোষ শুনেছে। শুধু প্রিয়তোষই বা কেন, রমলা তার ছেলেকে বলেছে এমন কি আলোকেও প্রতিনিয়ত তার দোষের কথা বলে বলে 'শুধরে' দিতে চেয়েছে। এবং প্রিয়তোষ আমাকে

প্রশ্ন করেছিল, "তুমিই বল তপেন, এসব কি শিখিয়ে বুঝিয়ে দেবার মানসিকতা? না-কি 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা'-র উদাহরণ?" আমি বলতে পারিনি কিছুই। শুধুমাত্র প্রিয়তোষের মনের কষ্টটাকেই অনুভব করেছি। আর কৃষ্ণার কথাগুলো মনে পড়েছে। প্রিয়তোষ বলেছে "মাঝখান থেকে ছেলের সঙ্গে মায়ের ব্যবধানটা বেড়েই চলেছে। ছেলে মাঝে মাঝে কথার উত্তর দিলে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড লেগে যায় বাড়িতে। রমলা শ্রাবণের ধারায় নেমে আসে ওদের আর আমার উপর। তাকে থামান যায় না। আলো মেয়েটি বোবা চোখে আমার দিকে তাকায়, শঙ্কিত দৃষ্টিতে মায়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে আর একটা অসহায় বেদনা বোধকে চলনের প্রায়স্তব্ধ গতিতে জড়িয়ে রাখে। মনে হয় এই সব সাংসারিক যন্ত্রণা-সংঘাতের জন্যে সে নিজেকেই দায়ী করে পীড়িত বোধ করতে থাকে।" প্রিয়তোষ বোধহয় আলোর জন্যে সহানুভূতিতেই থেমে গেল।

আলোকে আমি চিনি না কিন্তু আলোদের আমি জানি। তাই বোধহয় ওদের কথাই মন জুড়ে ছিল। ভাবছিলাম এই সব মা-বাবা স্বজন-পরিজন ছেড়ে চলে আসা আলোরা ঠিক কি কারণে বরুণদের হাতধরে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে আনন্দের বদলে এমন যন্ত্রণাবিদ্ধ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়? একেবারে বাইরের হয়েও এরা কেন স্বামীর সংসার-ঝড়ের কেন্দ্র-বিন্দুটি হয়ে উথালপাথাল বিদ্ধ হতে থাকে? সব দোষ, সকল দায় আর সমস্ত অন্যায় কেন পুত্রের ঘাড়ে না চাপিয়ে আলোদের শিরে ন্যস্ত করা হয়ে থাকে? ভাবছিলাম, যে সত্য আজ না হয় কাল মেনে নিতে হবে, অথবা যে সত্য ছেলে এবং ছেলের বৌয়ের জীবনে নিতান্তই সত্য বলে তারা মেনে নিয়েছে তাকে কেন একটু গ্রেসফুলি মেনে নেওয়া যায় না? রমলাবা প্রথম থেকেই ঘটনাকে নিজ নিজ মানসিকতা দিয়ে তাড়া করে ফেরে, ঘটমানকে চোখ বন্ধ করে অস্বীকার করতে গিয়ে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং শেষকালে ফলাফলের সামনে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্ববাহু তাণ্ডবের সৃষ্টি করে নিজ নিজ কপালে করাঘাত করে চিৎকার করে ওঠে—'এই ছিল আমার কপালে!' আমার ভাবনা যেন প্রত্যয়ের দিকে ঝুঁকে গেল: তাহলে কি কল্পিত সুখের খোঁজে আমরা অ-নিবার্য দুঃখকেই টেনে আনি? টেনে আনি আর বলে উঠি দুঃখই অনিবার্য ছিল!

প্রিয়তোষের কথায় আমার ভাবনা বাধা পেল। বলল, "অথচ আলোকে

তো আমি দেখেছি, দেখছি। ভালমন্দ মিলিয়ে অত্যন্ত সাধারণ মেয়ে। কিন্তু যত ওকে জানছি—দুর্দিনে, দুর্যোগে, অভিযোগের পাহাড়ের নিচে আর সমালোচনার দিনান্ত জীবনে—যতই জানছি ততই মনে হচ্ছে যে মেয়েটি সাধারণ নয়। শান্ত, ধৈর্যশীল. আটপৌরে কাজে অষ্টপ্রহর নিজেকে অনুত্তেজিত ব্যাপৃত রেখে চলেছে, মুখে একটি কথা নেই। সব থেকে বড় গুণ দেখেছি ওর দুঃখ যন্ত্রণাকে অকাতরে পান করার ক্ষমতায়। অথচ এসব রমলার চোখে পড়ে না, পড়ছে না। সে বোধহয় তার সামাজিক সম্মান আর ব্যক্তিগত অহংকারকেই ছেলের মনের চাহিদা আর প্রাণের শান্তির চাইতে বেশি মূল্যবান বলে মনে করছে। ধিক্কারে আর গঞ্জনায় একদিন যে সে নিজেই নিজের কাছে অপরাধী হয়ে দাঁড়াবে এই সহজ কথাটাই তাকে বোঝাতে পারছি না।"

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠে বেশ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। বাইরে যাবার তাড়ায় গোছাতে গাছাতে লেগে গেলাম। অতীত আর ভবিষ্যৎ একমাত্র একটি বিন্দুতে দেখতে পেলাম—হাওড়া স্টেশনের ড্যাব ডেবে তাকিয়ে থাকা ঘড়ি যেন ধমকাতে লাগল।

তরুণীর সংসার স্বপ্ন ঃ

দুদিন নিরবচ্ছিন্ন ট্রেনের গর্ভ-অবস্থান, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের চলমান জনারণ্য, বম্বের সুপ্রশস্ত রাস্তার কর্মচঞ্চল জীবন, সমুদ্রসৈকতের সদূর-প্রসারী শান্ত জলরাশির মধ্যে প্রতিনিয়ত ঢেউয়ের ভাষায় অসীমের বার্তা আর মসৃণ সিক্ত বালুবেলায় অলস পদচারণা—বেশ লাগল দুটো দিন। তারপরে পাহাড়ের সুদৃশ্য পটভূমিতে পুনা শহরের বিস্তীর্ণ প্রসার। ট্রেন পথে স্থির পর্বতগাত্রে চলমান সবুজের দৃশ্যপট, টানেলের ঘুমপাড়ানী গান. উপরে নিচে বিশ্বচরাচরের কখনো ঘনিষ্ঠ নৈকট্য আবার কখনো দূরে গিয়ে হাতছানি দেওয়া, দৃষ্টি-বিদ্ধ শ্যামল শোভার দৃশ্য-আলিঙ্গন আবার মুক্ত-দৃষ্টির আদিগন্ত প্রসারে দিক-বালিকাদের নয়ন-নন্দন খিলখিল খেলা—কেটে গেল আরও দুটো দিন। পাহাড়ের বুক চিরে বাস যাত্রায় সাসোয়াদ হয়ে পুরন্দর দুর্গ, আহমেদনগর হয়ে অজন্তা এবং ফেরার পথে ইলোরা। পাহাড়, প্রান্তর, দুর্গ এবং মাঝে মাঝে সবুজ শস্যক্ষেত্র, সর্পিল পাথুরে পথ,

দরিদ্র গ্রাম্যজীবনের হতশ্রী আস্তানার পাশে পাশে আধুনিক জীবনের সুদৃশ্য অট্টালিকা, জল-জলাশয়, খামার-ট্রাকটর—দেখে দেখে ঘুরে ঘুরে বেশ ক'একটা দিন কেটে গেল। দেখার দৃষ্টি নিয়ে পথে বার হলে নিজের দিক থেকে দৃষ্টিটা সরে সরে যায়। ক্লান্তি আসে না, অবসাদ মনকে ভারি করে তোলার অবকাশ পায় না, চেতনা নতুনের স্পর্শে সবসময়ই তাজা থাকার সুযোগ পায়। বেশ লাগে। বেশ লাগছিল। তার পরে একদিন যে চক্রযানে বাইরের টানে সাড়া দিয়েছিলাম সেই চক্রই আরবার জীবন চক্রের পূর্ববিন্দুতে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো।

বিন্দুতে ফিরে এসেই সিন্ধুর ডাক শুনতে পেলাম। আপাদ মস্তক এনভেলপে মুড়ে যে পড়ে ছিল আমার টেবিলে আমার মনোযোগের জন্যে সে যে নয়নতারা তা টের পেলাম ঠিকানা দেখেই। সব কাজ ফেলে রেখে মোড়ক খুলেই নয়নতারার ডাক শুনতে পেলাম। সে লিখেছে—বাইরে থেকে ঘুরে এসে সেই বাইরের অভিজ্ঞতার হাওয়াটুকু যেন প্রথমেই তাদের গৃহাঙ্গন পার হয়ে ঘরে ঢোকার সুযোগ পায়। তার মেয়েদের নাকি সেই দাবি—সবিশেষ সুপ্রিয়ার। আরও জানিয়েছে—জ্যোতিষবাবু নাকি তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্যে আমার সদ্য-অতীত অভিজ্ঞতার জন্য মুখিয়ে আছেন। খুবই আনন্দ পেলাম নয়নতারার চিঠিতে। মনে মনে বললাম—তাই হবে, তাই হবে।

পরদিনই বিকেলে যখন নয়নতারার বাড়িতে পৌঁছোলাম তখন সেই শনিবারের শান্ত অপরাহ্নটি আমাকে ঘিরে অনেকটাই অশান্ত হয়ে উঠলো। অমি আর সুপ্রিয়া বাড়িতেই ছিল। বেশ খানিকটা হৈ-চৈ করে আমার আগমন বার্তাটি আকাশে বাতাসে, বাগানে-প্রাঙ্গণে ছড়িয়ে দিল। নয়নতারা বাইরে এসেই ঘোষণা করল, "ভাগ্নীরা যে হারে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে তাতে তো ভি. আই. পি আগমনের স্বাদ পাচ্ছি। আসুন, আসুন, আসতে আজ্ঞা হোক।" এমনভাবে বলল যে অমি আর সুপ্রিয়া হো হো করে হেসে উঠলো, আর বাগানের ফুলগুলোও যেন সেই হাসির দমকে আন্দোলিত হয়ে গেল।

উষ্ণ চা আর উষ্ণতর আন্তরিকতায় ঘণ্টাখানেক সময় তর তর করে পলে-পলে বিন্দু বিন্দু ছিটকে গেল। ট্রেন, বম্বেভিটি, পুনা, পুরন্দর হয়ে বর্ণনার ঢেউ যখন অজন্তায় ইলোরায় পৌঁছে গেল তখন শ্রোতা-বক্তা সকলেই যেন নিজ নিজ মনের গভীরে খণ্ড খণ্ড ছবিগুলোকে সাজিয়ে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কল্পনায় ভেসে ভেসে আমরা তখন সুন্দরের দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে

অবগাহন করে চলেছি যখন ট্রে-হাতে নয়নতারা অন্যতর উষ্ণ পাণীয়ের স্বাদ সামনে সাজিয়ে রাখল, সেই ফাঁকে অমিয়া প্রায় কানেকানে বলার মতো করে জানাল—আজ আমার এক ঘন্টা সময় চাই, অনেক কথা আছে। আমি অবাক হবার ভান করে বলেছি, "অনেক কথা? আমার কাছে? অনুজিৎ, অভিজিৎ সুরজিৎ-দের কি এতোই অভাব পড়ে গেছে আজকাল?"

তৎক্ষণাৎ চোখে ঝরনার কলতান তুলে অমি বলেছিল, "অভাব পড়েনি, বলা যায় বেশ প্রাদুর্ভাবই আছে। কিন্তু সে কথা নয় অন্য কথা আছে।" সুপ্রিয়া চোখের ঈশারায় আমাকে পথ দেখিয়ে ছিল—বলতে চেয়েছিল 'অন্যথা নয় সত্বর চলে যাও!'

ছিমছাম ছোট্ট একটুকরো ঘর। পরিচ্ছন্নতার ছাপ সর্বত্র। একটি ছোট্ট চৌকিতে অমির বিছানা। এক কোণে অমির লেখাপড়ার টেবিল চেয়ার। ঘরে ঢুকতেই অমি বলল, "এই বিছানায় বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে পড়। তার পরে আমার সঙ্গে কথা বল।" আমি বললাম, "কথা তো আমার বলার কথা নয়, তোমার বলার কথা। আমি শুনব—এরকমই তো প্রস্তাব ছিল।" অমি বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। একটুক্ষণ মনে মনে ভেবে নিল। বলল, "দেখ তপুমামা, নিজের আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু দেখে আর শুনে আমার মনে হয় মেয়েদের জন্যেই বিয়ের পরে সংসার জীবনে যাবতীয় অশান্তি তৈরি হয়। আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবীদের অনেকেই এবং আত্মীয়াদের বহুজনেরই বিয়ের পরের দুঃখ কষ্টের কথা শুনেছি। আমার মনে তাই একটা ভয় যেন দানা বেঁধে উঠেছে। অথচ আমার মন বলে—এমন হবার কথা নয়, উচিত নয়, অনিবার্য নয়। বুঝতে পারি না গোলমালটা কোথায়?"

'তোমার বিয়ে হয়ে যাওয়া বান্ধবীরা কি বিয়ের পরেই অশান্তির কথা বলেছে কেউ?" আমি জানতে চাই। "না, তা নয়। তারা সকলেই প্রথম প্রথম আনন্দে আর উচ্ছ্বাসে দিন কাটিয়েছে বলেছে, বুঝিয়েছে যে বিবাহিত জীবনের মতো সুন্দর, সম্পূর্ণ এবং মধুর আর কিছু নয়।" অমির কথায় আমি বলেছি, "তাহলে দুঃখের ব্যাপারটা কখন ওদের কাছে ধরা পড়ে?" অমি একটু ভেবে নিয়ে বলল, "বোধহয় ভাসমান পালক পালক জীবন পার হয়ে সংসারের চাপ—দায়-দায়িত্ব, অনুশাসন-কর্তব্য যখন থেকে চেপে ধরে তখন থেকেই।" আমি বলেছিলাম, "তাহলে তো বলতে হয় যে মেয়েরা কাজকে ভয় পায়, দায়িত্বকে এড়িয়ে যেতে চায়, অনুশাসন মানতে চায় না বলেই গোলমাল

তৈরি হয়ে ওঠে।" অমিয়া যেন অস্বস্তি বোধ করল। বারে বারে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "না, না। আমি ঠিক বোঝাতে পারব কিনা জানি না। তবে, আমার যা মনে হয়েছে তা অন্য রকম।" বলেছি, "তোমার কি মনে হয়েছে?" অমিয়া বেশ ভেবে ভেবে বলেছে, "বিয়ের পরে কিছুদিন বাদেই মেয়েরা বাপের বাড়িতে এসে শ্বশুর বাড়ির বিরুদ্ধে নানারকম অভিযোগ অনুযোগ করে। আচার-ব্যবহার কথা-বার্তা, সংস্কার-বিশ্বাস এবং আশা-প্রত্যাশা নিয়ে নানা ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ করে। তার বেশির ভাগই অমূলক বলে আমার মনে হয়েছে।" "কেন তোমার অমূলক বলে মনে হয়েছে?" অমি বলেছে, "আমার মনে হয়েছে নতুন জীবন, নতুন পরিবেশ আর নতুন নতুন স্বজনপরিজনদের মধ্যে পড়ে মেয়েরা খোলামনে সব কিছুকে গ্রহণ করতে পারে না। পারে না কারণ মা-বাবার সংসারে যে মনটি গড়ে ওঠে সেই মন প্রতিমুহূর্তেই প্রতিতুলনায় ব্যস্ত হয়ে থাকে। যা সে ছেড়ে এসেছে তার সঙ্গে মিলিয়ে সেই সব নতুনকে সে দেখতে চায়। আর এই দেখতে গিয়েই সে কষ্ট পায়।" আমি বলেছি, "তা, এই কষ্ট পাবে কেন? নতুন সংসারে পরিবেশে একটু সময় নিয়ে, একটু ধৈর্য নিয়ে মানিয়ে চলতে চেষ্টা করবে না কেন?"

টেবিল থেকে একটা পেনসিল হাতে নিয়ে অনেকক্ষণই নাড়াচাড়া করছিল অমি। আসলে অমি বোধহয় নিজের মাথার মধ্যে ভাবনাগুলোকে নিয়ে অমনি নাড়াচাড়া করছিল। একটা কাগজে উদ্দেশ্যহীন আঁকিবুকি কাটছিল। আমি নিজেও বেশ অলস অপেক্ষায় আনমনা হয়ে গেছিলাম। ও বলল, "আমার মনে হয় মেয়েরা যা ছেড়ে যায়, যে আন্তরিকতার নৈকট্য থেকে হঠাৎ ছিটকে সরে যায়, আপনজনেদের স্নেহ-ভালবাসার সিকিউরিটিটুকু হারিয়ে নতুন পরিবেশে যে একা-একা বোধের দ্বারা তাড়িত হয় তা আর পূরণ হতে চায় না। সামাজিক সানাই, মানসিক উত্তেজনা আর জৈবিক উথালপাথালের জোয়ার শেষ হলেই সেই ফেলে আসা ছেড়ে আসা অতীত মেয়েদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলে। বর্তমান আবছা হয়ে যায়, ভবিষ্যৎ ধূসর দেখায়। ফ্ল্যাশ-ব্যাকে অতীত ক্ষণপ্রভার মতো অতি-উজ্জ্বল ঝলকানিতে বর্তমানকে অন্ধকারময় এবং ভবিষ্যতকে ধাঁধিয়ে দেয়। বারে বারেই সে তাই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। সদ্য-পরিচিতরা ভুল বোঝে, যথেষ্ট সহানুভূতির অভাবে দুর্বল মনে রক্তপাত ঘটায়।"

অমি থেমে গেল। আমি বললাম, "তাহলে তো একদিকে ব্যাপারটা মেয়েদের নিজ নিজ মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবার বিষয় অন্যদিকে অভিভাবকদের সংবেদনশীল, সহানুভূতিশীল হয়ে এদের, এই মেয়েদের মনে বিশ্বাস, সিকিউরিটি আর অভয় সৃষ্টি করে দেবার কথা। তাহলে বোধহয় ব্যাপারটা সহজ হতে পারে।" অমি বলল, "আমারও তাই মনে হয়েছে। তবে শুনে-টুনে মনে হয়েছে দুদিকের অভিভাকরাই ভুল করেন।" আমি বললাম, "কি রকম ভুল? একটু খুলে বল।"

"অভিভাবকরা, বিশেষ করে মা-বাবারা," অমি বলল, "মেয়ের চোখে মেয়ের শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের দেখে নেন, চিনে নেন মূল্যায়ন করেন। তাঁরা ভুল করেন অন্ধস্নেহে। কিউপিড একাই শুধু ব্লাইণ্ড নয়, সদ্য বিবাহিত মেয়েদের মা-বাবাও ব্লাইণ্ড। তাই তাঁরা ভেবে দেখার সময় পান না যে তাঁদের মেয়ের দেখাগুলো কতোটা চোখের জলে ঝাপসা, কতোটা প্রত্যাশায় অস্বচ্ছ। যা দেখা উচিত তা হয়তো দেখেনি, আবার দেখেছে যা হয়তো ঘটনায় ছিল না, ছিল তার মনে। প্রক্ষিপ্ত, স্বকপোলকল্পিত। এবং আদালতে যাকে বলে বেনিফিট অব ডাউট—সেই সন্দেহের অবকাশ মা-বাবার মনে খুবই কম স্থান পায়।"

আমি অমিকে বাধা দিয়ে বললাম, "তা মা-বাবা তাহলে জানবেন কি করে? তাঁরা তো আর মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে বিচার বিবেচনার সুযোগ পাবেন না।" অমি বলে উঠল, "সত্যের জন্যে তথ্য প্রয়োজন। সংসার জীবন কি সত্যের অনুসন্ধানের লেবরেটরি যে মা-বাবাকে বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া নিতে হবে? সংসারের সত্য তো সুখ শান্তি। সহানুভূতি-ভালবাসা। মিলে মিশে থাকাটাই সেখানে কাম্য।" "তাহলে" আমি বলেছি, "তাহলে মা বাবার কি করণীয়?" অমি বলেছে, "যা যা করলে মেয়ের ভবিষ্যৎ জীবনে সুখ শান্তি আসে তাই তাই করা এবং বলা। শ্বশুর বাড়িতে মিলে মিশে থাকাটা যা যা করলে সম্ভব তাই তাই করার কথা বলা।" "তাই তো তাঁরা করতে চান, করে থাকেন। তাহলে এর মধ্যে ভুলটা কোথায় পেলে?" "ভুলটা মা-বাবাই করেন, মেয়ে করে না। অতীতকে অনেক দূরে ফেলে আসেন বলে মা বাবারা তাঁদের সেই প্রথম-কদম-ফুল জীবনের সব কিছুকেই বেমালুম ভুলে যান! অভিভাবকত্বের পুরু চশমার আড়াল দিয়ে তাঁরা মেয়ের বর্তমানকে দেখেন। স্নেহ ভালবাসার লেনসে আবেগের প্রবাহ আপন-বোধের

পাড়কে ধ্বসিয়ে দেয়। তাই তাঁরা উত্তেজিত বোধ করেন তাঁদের আঁচলের ধন মেয়ের কষ্টে যন্ত্রণায়। মেয়েকে অভয় দিতে গিয়ে তাঁরা মেয়ের শ্বশুর বাড়িতে মানিয়ে চলার ক্ষমতাকে কমিয়ে দেন, সান্ত্বনা দিতে গিয়ে অন্যপ্রান্তের অভিভাবকদের বিষয়ে অসচেতন কটু তিক্ত কষায় উক্তি করে ফেলেন এবং সিকিউরিটির ব্যবস্থা ঘোষণা করে লতেব স্বভাব মেয়েদের বৃক্ষ সুলভ দৃঢ়তা দিয়ে ফেলেন।"

আমি অবাক হয়ে ভাবলাম—আজকালকার মেয়েরা বিয়ের আগেই সেই জীবন নিয়ে এতো ভাবনাচিন্তা করে! আবার ভালও লাগল এই ভেবে যে জীবনকে এরা চিন্তা ভাবনা করে যাপন করার মতো বিষয় বলে মেনে নিয়েছে, প্রকৃতির প্রবাহে ভাসমান যথেচ্ছ-গতি বলে আর মনে করছে না। বললাম, "মুষড়ে পড়া, চোখের জলে ভেজা, ভয়ে বিহ্বল মেয়েকে তাহলে মা বাবা অভয় দেবে না? সান্ত্বনার কথা বলবে না? শ্বশুর বাড়িতে ইনসিকিওর অনুভব করলে সিকিউরিটির পরিকল্পনা শোনাবে না?" "অবশ্যই দেবে বলবে এবং শোনাবে। তবে মেয়ে যে বিয়ের পরে শুধুমাত্র ব্যক্তি নয় শুধুমাত্র মেয়ে নয় সে যে তখন গোত্রান্তরিত জীবন সাথী, পুত্র বধূ—একথাটা মা-বাবার স্মরণ রাখার কথা। দ্বৈত অভিভাবকত্ব ডায়ার্কির মতোই বিপজ্জনক হতে পারে, প্রায়শই হয়ে থাকে।" "তাই বলে নিজের মেয়েকে মা-বাবা উপদেশ-নির্দেশ দেবেন না? বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি মেয়ে অপরের হয়ে যাবে?"

আমার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অমি বলে উঠল, "এই যে আবেগীয় অবস্থান, এই অবস্থান থেকেই গোলমালের উৎপত্তি। যে সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা মেনে নিয়ে বিয়ে-সাদি হয়, সেই অবস্থা-ব্যবস্থা আমাদের কারো হাতেই নেই। সে চলছে চলবে। নিজের নিয়মে আর শক্তিতে তার অস্তিত্ব এবং যা কিছু পরিবর্তন। সে কথা স্বীকার করে নিয়ে তবেই আমাদের ভাবতে হবে।" অমিকে বাধা না দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ও বলল, "আজ যে মেয়ে, দশ বছর পরে সে অপরের গৃহে গিন্নী হয়ে উঠবে। মা-বাবার কথা তখন পুজো ষষ্ঠীতেও বেশি স্মরণ হবে না বরং বেশি বেশি মনে পড়বে নিজের সন্তান-সন্ততিদের ষষ্ঠী-পুজোর আড়ম্বড়ের কথা। এখন যে মেয়ের জন্যে মা-বাবার মন পড়ে থাকে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের কষ্ট-বেদনা ভয়-ভাবনার দিকে সেই মেয়েই, কদিন পরে, কতটুকু সময় পাবে মা-বাবার সংসারের কথা ভাবতে? বৌ হয়ে নতুন সংসারে প্রবেশের মুখে তাই সেই

সংসারের উপদেশ নির্দেশ মেনে চললে অযথা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। চট্টোপাধ্যায় থেকে চক্রবর্তী হয়ে অথবা ঘোষ থেকে বোস হয়ে ঘোষেরও আমি বোসেরও আমি, চট্টোপাধ্যায় গাছের এবং চক্রবর্তী তলার পাওনাগণ্ডা বুঝে নেবার চেষ্টা আইনগততার বাইরেও একটা মানসিকতার প্রকাশ ঘটায়। মেয়েদের কচি মনে অস্থিরতা তৈরি করলেও মা-বাবার পাকা মাথায় কিছু স্থির পথনির্দেশ আশা করা যায় না কি ?"

আমি বললাম, "এসব অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠছে। তুমি বলেছিলে দু'দিকের অভিভাবকরাই ভুল করেন। তা, একদিকের কথা তো শুনলাম এবারে অন্যদিকের ভুলের কথাটাও একটু বল।" "ওদের, মানে শ্বশুর শাশুড়ির ভুলটা একটা সিলি স্ববিরোধ বলে আমার মনে হয়। নিজের অংশ বলে যাকে ওঁরা ঘরে তুলে আনেন, সংসারের সেই ভাবী গিন্নীকে প্রথম থেকেই স্ব-গোত্র নামে চিহ্নিত করে সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেও তাঁরা নবাগতাকে গৃহের অভ্যন্তরে ছাড়পত্রটি দিতে চান না। এটা আশ্চর্যের ব্যাপার নয় ? স্ববিরোধ নয় ? তাকে নাকি দেখে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে সে যোগ্য কিনা ! আর যিনি এই যোগ্যতার নিরিখটি নিজের চোখে সদাসর্বদা এঁটে তীক্ষ্ন-দৃষ্টি সেই তিনিই যখন তিন দশক আগে গোত্রান্তরিত হয়ে এসেছিলেন তখন ? পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে সমাজের সব শাশুড়িরাই অযোগ্য পুত্রবধূ বলে বাতিল হয়ে যাবার যোগ্য ছিলেন—যদি বাতিল ব্যাপারটা চালু থাকত ! এই জন্যেই 'সিলি' বলেছি। যোগ্য বলে যাকে বরণ করে নেওয়া হল, অথবা পুত্র যাকে যোগ্য বলে মনে করে ঘরে আনল অথবা যদি তেমন হয়, অস্বীকার করার উপায় নেই বলে যাকে ঘরে স্থান দেওয়া হল—সেই তাকে যোগ্য হতে সাহায্য না করে মাইক্রো-ম্যাক্রো অনুসন্ধান-ব্যবচ্ছেদ করা কেন ? তাকে ঘরে স্থান দিয়ে তার অন্ধকার স্পটগুলোকে মরা ইঁদুরের ল্যাজ ধরে তুলে দেখানোর চাইতে তার উজ্জ্বল দিকগুলোকে গৃহের অংগনে-দেয়ালে টানটান করে ঝুলিয়ে দিলে ব্যাপারটা সহজ হয় না ? স্বাভাবিক হয় না ?"

"তুমি মেয়ের কথা বললে, দুই তরফের অভিভাবকদের কথা বললে কিন্তু ছেলেদের কথা তো কিছু বললে না ?" "বলব কি ? ওরাই তো কালপ্রিট !' "কালপ্রিট ? সেটা কিভাবে ?" "কেন নয় ? পুরুষপ্রধান সমাজব্যবস্থার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা অকাতরে ভোগ করে চলেছে কিন্তু একইসংগে একই ছাতনাতলার বন্ধনকে অনায়াসে মেয়েদের পায়ে—নাকি আঁচলে বলব ? বেড়ি

করে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে নিজের আস্তানায় জমা করে রাখছে। বৌ যাচ্ছে স্বামীর ঘরে, স্বামী নিজের ঘরে বসে গোঁফে তা দিচ্ছে। দায়িত্ব পালনে চেষ্টা নেই কারণ মা-বাবা আছেন, কর্তব্য বলতে যাকিছু তা বৌয়ের। নিজের অফিস-আড্ডা আর রাজনীতি সমাজনীতির আদ্যশ্রাদ্ধ বৃষোৎসর্গ নিয়ে সময় কাটানো ছাড়া আর যা করণীয় তা তো উপভোগের সমুদ্র-স্নান, আর আগে পরে উপদেশের গুরু-লঘু ধারাপাত! বলতে গেলে ছেলেরা তো গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়! ছেলেরা সব ক্ষেত্রেই আত্যন্তিক ঃ হয় তারা ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারক ও বাহক হয়ে বৌ নিয়ে গৃহত্যাগ ক'রে কপোত-কপোতী যথা উচ্চফ্ল্যাট নীড়ে নয়তো একেবারে সাবসারভিয়েন্ট গৃহবলিভুক নতনেত্র শাবকটি হয়ে মাতৃ-মুখী জীবন যাপনে তৎপর হয়ে ওঠে।" আমি না বলে পারলাম না, বললাম, "ছেলেদের প্রতি তোমার এই মনোভাব অনেকটাই যেন নিষ্ঠুরতার মতো শোনাচ্ছে।" অমি বলল, "সত্য কঠিন, তাই সে নিষ্ঠুরও হতে পারে।"

"তাহলে যে তুমি বলেছিলে সংসার জীবনের সত্য আর বিজ্ঞান বা যুক্তি-তর্কের সত্য এক নয়? বলেছিলে—সংসারের সত্য সুখ-শান্তি সহানুভূতি সমবেদনা?" আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই অমিয়া বলে উঠেছিল, "অবশ্যই বলেছিলাম। সেই সুখ শান্তিটুকু যদি ছেলেরা নিজেদের জন্যেই বুঝে নেয়, যদি মনে করে যাবতীয় সহানুভূতি সমবেদনার ধারাটি তাদের মানস জমিতেই একমাত্র সেচন পাবে তাহলে তো বড় নির্দয় স্বার্থপরতার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় আর সেটাই ঘটে থাকে। নিজের আশৈশব পরিবেশে, আজন্ম স্নেহবারি-ধারার জননী উৎসে নিশ্চয় থেকে স্বজন পরিজনের উষ্ণ নৈকট্যে কাল কাটাতে কাটাতে নবাগতাকে উপদেশ দেওয়া যতো সহজ তাতোই কঠিন সেই পরিবেশ-ছিন্ন উৎস উৎপাটিত অপরিচিত জনেদের শীতল নৈকট্যে ট্রানসপ্লানটেড এবং গ্রাফটেড নববধূকে একটা সুস্থ স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন দেওয়া। সে-ক্ষেত্রে প্রস্তুতির ব্যাপার থাকে, মা-বাবাকে একজোড়া করে নতুন চশমা দেবার যোগ্যতার দাবি থাকে এবং থাকে আরও অনেক অনেক কিছুই। পুরুষ হলেই যে উপযুক্ত স্বামী হওয়া যায় না একথাটা পুরুষদের কেউ কখনো বলে দেয় নি যদিও প্রসব করলেই যে মাতা হওয়া যায় না—একথাটা মেয়েদের মায়েদের জানানো হয়েছে। বল ঠিক কিনা?"

আমি বলব কি? অমির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হেসে ফেললাম।

বললাম, "ভাগ্নীর কপাল খানা যেন মামার ঘষা কপালের দিকেই গড়াচ্ছে! অবশ্য কারণ আলাদা হবে। "কেমন?" বললাম, "নয়নতারার পরে আর কাউকে আমি নয়নের তারা বলে খুঁজে পেলাম না বলে। আর তোমার বেলায় কাব্যের আলোআঁধারি নয় একেবারে গদ্যময় জীবনের চাপে ছেলেদের মধ্যে পুরুষকে আর পুরুষদের মধ্যে যোগ্য স্বামীকে দেখতে না পেয়ে।" অমি বলল, "নেই যে তা বলছি না 'ইট দি কেক এন্ড অলসো হ্যাভ ইট'—এর সংখ্যাই ছেলেদের মধ্যে বেশি।" আমি বলেছি, "সে কথাতো মেয়েদের বেলাতেও সমান খাটি। মেয়েরা 'কান্দে আর বান্ধে', তারা বাড়ির অংশ, স্নেহ ভালোবাসার অংশের কথা বলছি, সম্পদ-সম্পত্তির অংশের নয়—এবং শ্বশুর বাড়ির ভাগ সমান যত্নে আহরণ করতে চায়।"

অমির চোখমুখ দেখে মনে হল ওর কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। বলল, "তোমার কথায় আমার অন্য একটা বিষয় মনে পড়ে গেল। আসলে ছেলেমেয়ে মাত্রই এই গাছের-তলার আকর্ষণ বোধ করে 'ইটিং এন্ড হ্যাভিং'-এর সদস্য হতে চায়। পুরোনো দিনের মতো গায়ে হলুদ ছাতনাতলা সানাই খোঁজে আবার আধুনিক জীবনের টানে স্বাধীন হয়ে স্বতন্ত্র সম্ভোগের দেউড়ি পথে যথেচ্ছ হতে চায়। অথচ এই একই মানসিক অবস্থানের জন্যে ছেলে পায় প্রশ্রয়, বৌটির কপালে জোটে সার্বিক কপালকুঞ্চন। শাশুড়ি ননদের কথায় বৌয়ের মন পুড়ে পুড়ে যায়, ছেলে এসব ছোট খাট ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চায়। এই সব জেনে শুনেই আমি…" অমি থেমে গেল কিন্তু আমি থামতে পারলাম না। বললাম, "এই সব জেনেশুনে?" এবারে চটপট উত্তর এলো, "আমি ঠিক করেছি দেখে শুনে বন্ধু বানাব আর বুঝে শুনে পা বাড়াব।" "সে তো অতি উত্তম পরিকল্পনা। তবে প্রোগ্রামের মধ্যে অবশ্যই বুঝিয়ে শিখিয়ে নেবার জন্যে কয়েকটা ক্লাস যেন থাকে! যেন পরীক্ষার ব্যবস্থাও বাদ না যায়।" অমি হেসে উঠে বলেছিল, "তোমার কথায় আমি রাজি যদি তুমি হেড একজামিনার হতে রাজি থাক!" "আপত্তি নেই; কিন্তু তোমার জানা দরকার যে নম্বর দেবার ব্যাপারে আমি অত্যন্ত দরাজ-দিল।" "সে ক্ষেত্রে সেন্ট-আপ করার সময়ে আমাকে নিদারুণ কঠোর হতে হবে—একটির বেশি পাঠাবই না!" আমি "তাই হবে"—বলে উঠে দাঁড়ালাম।

নয়নের ধ্রুবতারা :

বাইরের বারান্দায় বেরিয়েই দেখলাম সকলে বাগানে বা বাগানের আশে পাশেই আছে। বাগান পরিচর্যার কাজ প্রায় শেষ। দীর্ঘ সর্পিল রবারের সরু পাইপে করে প্রশান্ত জল দিচ্ছে গাছে, ঝারি হাতে সুপ্রিয়া। জ্যোতিষবাবু কাজ শেষ করে হাতে পায়ে জল দিচ্ছেন! নয়নতারা আর রত্না বোধহয় এতক্ষণ দর্শকের ভূমিকায় ছিল। আমাকে অমির ঘর থেকে ছুটি পেয়ে গেছি দেখে নয়নতারা দুপা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে বলল, "মামা ভাগ্নীর সুখ দুঃখের কথা শেষ হল তাহলে?" আমি উত্তর দেবার আগেই অমি বলে উঠল, "তপুমামা তো শুনেছি সুখে বিগতস্পৃহ এবং দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমনা—তোমার কাছেই শুনেছি। তাহলে কি আমার কথা বলছ?" নয়নতারা আমার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "দেখলে তো তপু? যাদের ছোট্টটি বলে মনে করি তারা কখন যে বড়টি হয়ে যায় তাকি বোঝার উপায় থাকে?" বলেই মেয়েকে লক্ষ্য করে বলল, "তোমার বাপু সুখশান্তির জীবন এখন তাই তুমিও নিস্পৃহ হতে পার আর দুঃখের তো তোমার কারণই দেখিনা তাই উদ্বেগেরও তো হেতু নেই! আপাতত তুমি যদি আমাদের একটু আলো দেখাও তাহলে আমরা তোমার আলোয় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারি!" সন্ধ্যা হয়ে এসেছে! তাই নয়নতারার এই ইংগিত! রত্না ততক্ষণে উপরে এসে গেছে। আমি চোখে আলো জ্বেলে বলল, "ওই তো রয়েছে তোমার এপ্রেনটিস উত্তরসূরি, ওকেই হাতেখড়ি দিতে বলনা!" রত্না দুপা অমির দিকে বাড়িয়ে বলল, "চল এখন সঙ্গ দেই তোমাকে, সময় হলে অবশ্যই আলো দেবো।" ওরা চলে গেল। নয়নতারার চোখে তৃপ্তির আভা যেন চিক চিক করে জেগে রইল।

"চল বসবে চল ওখানে", বলে নয়নতারা আমাকে সঙ্গে করে এগিয়ে গেল। বসল আমার পাশের চেয়ারটিতে। বলল, "তুমি সংসার করলে ভাল সংসার করতে পারতে তপু। কেন যে করলে না!" আমি সেই প্রায়ান্ধকার পরিবেশে নয়নতারার একেবারে পাশটিতে বসে কেমন করে বলি যে তাহলে এই সন্ধ্যাটা আমার জীবনে সত্য হবার সুযোগ পেতো না। এই নৈকট্য এই আন্তরিকতা আর এই এতোজনের প্রীতি আর ভালবাসা? বললাম, "নিজের সংসার করি নি বলেই তো কোন সংসারই তেমন করে আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে জড় ভরত করে তুলল না। সকলের সংসারের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা আমাকে এই এতো বয়সেও ছুঁয়ে যেতে পারছে। কৃষ্ণার কণ্ঠ আমাকে ভাবায়, প্রদীপ-

সীমার সমস্যা আমার অলস মস্তিষ্ককে সক্রিয় করে তোলে, অজিতের শান্ত সিদ্ধান্ত আর তিতির অশান্ত জীবন আমার কাছে সময় দাবি করে, সরলা-ভূপতি অঞ্জন-দীপা অনেকখানি সহানুভূতি আদায় করে নেয়। তাছাড়া শচীনের ব্যথা বিমল-বিমলার চিন্তাভাবনার ভাবাবেগ প্রবণতা, রমলা-প্রিয়তোষের সংসারের বাইরে থেকেও কেমন আলো-বরুণের যন্ত্রণাকে স্পর্শ করতে পারি। নিজে সংসার করলে তো সেই নিজের সংসারের মধ্যেই হাবুডুবু খেতে খেতে সূর্যাস্ত অপেক্ষায় দিন কাটাতে হত। তাহলে কখন কথা বলতাম নয়নতারার সঙ্গে সুপ্রিয়া-সর্বেশের সঙ্গে অমির আর জ্যোতিষবাবুর সঙ্গে ?"

অমি আর রত্না এক ফাঁকে বারান্দায় আলো জেবলে দিয়ে গেছে। সর্বত্র ধূপধুনোর গন্ধ ম' ম' করছে। জ্যোতিষবাবু পাশে এসে বসেছেন। একটা সান্ধ্য নৈঃশব্দ যেন তার সচল উপস্থিতিতে এঘর ওঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাইরের বাগান পর্যন্ত সেই বাতাবরণ ছড়িয়ে পড়েছে তুলসীমঞ্চের তুলসীগাছটিকে বেশ আবছা দেখাচ্ছে। শান্ত, নীরব, লক্ষ্মীমন্ত। অমি তার ঘরে বইয়ের টেবিলে কি সব খুট খাট করছে। রত্না আর সুপ্রিয়ার ছোট ছোট কথা, টুকরো টুকরো কণ্ঠ ঘরের মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। প্রশান্ত কি একটা কাজে বাইরে গেছে। ঘরে আলোটা জবলছে। একটা ভাল লাগা যেন সেই ফুলহরার নয়নতারার চোখের কাজল ছুঁয়ে হাজার মাইল পথ পার হয়ে দিন মাস বছরের হিসেব হারিয়ে এই এতো দিন পরেও আমার মনের উদাসী শূন্যে পাক খেয়ে খেয়ে তখনও জেগে থাকা ধূপের গন্ধের মতো ভেসে বেড়াতে লাগল। দিন-রাতের সন্ধিক্ষণে আমরা তিনজনে তাই বোধহয় নিজ নিজ অন্তরের গভীরে আপন আপন চেতনার অতলে অবগাহন কবে চলেছিলাম। কথা বলা মানেই যে ছন্দ পতন তা যেন ঠোঁটে আঙুল রেখে সেই সন্ধ্যাপ্রকৃতি নিজেই অদূরে দাঁড়িয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন।

ঘোর কেটে যেতেই নয়নতারা বলল, "তোমার কবি হওয়া উচিত ছিল। নয়তো সন্ন্যাসী।" জ্যোতিষবাবু বাধা দিয়ে বললেন, "আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। প্রথমটিতে তপু বাবু ভাতে মারা যেতেন দ্বিতীয়ে দেহে। দুটোর কোনটিতেই স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারতেন না। তার চাইতে এই ভাল হয়েছে।" "কেন ? ভালটা দেখলে কিসে ?" নয়নতারার প্রশ্নে জ্যোতিষবাবু ধীর স্থির উত্তর দিলেন, "একটি তারার কক্ষপথে আমি আছি ছোট বৃত্তে,

স্যাটেলাইট বলতে পার। আর তপুবাবু আছেন দীর্ঘপ্রলম্ব লাইটইয়ার্স দূরত্বে। তৃতীয়বার যখন তপুবাবু তোমার বৃত্তে এসে কাছে বসবেন তখন আমি নেই হয়ে যাব," নয়নতারা বলল, "তোমার হিসেব লেখা কলম দিয়ে আর কবিতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা কর না। তাতে হিসেবের খাতায় গোলমাল দেখা দেবে, কবিতার দেহটিও সৌষ্ঠব হারাবে!" জ্যোতিষ বাবু তৎক্ষণাৎ আমাকে সাক্ষী মেনে বলে উঠলেন, "দেখলেন তো? নারীর প্রেরণা না পেলে কখনও কেউ কবি হতে পেরেছেন? প্রেরণা দেওয়া তো দূরের কথা একদিনও কি আমার নৈকট্যে প্রীযমান বোধ করেছেন যে আমার কাব্য চেতনা স্ফুলিঙ্গ ছেড়ে লেলিহান হবে?" "সে যে সত্যি সত্যি হতে পারে নি, লেলিহান হয়ে ওঠেনি, তা কবিতার পক্ষে যতটা স্বস্তির কথা তার বহুগুণ তোমার গৃহের শান্তির পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত হয়েছে জানবে।" নয়নতারার কথায় আমি হেসে উঠলাম, জ্যোতিষ বাবু বোধহয় রণে ভঙ্গ দিলেন।

সান্ধ্য চায়ের উষ্ণ বাষ্পরেখা আঁকাবাঁকা উপরে উঠে যাচ্ছে। আমার মনের ভাবনাগুলোও যেন অমনি করে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছিল। একবার দুবার নয়নতারার দিকে তাকাতেই সে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল, "কি ভাবছ অমন একাগ্র হয়ে?" বললাম, "একটা প্রশ্ন বার বার মনে এসেছে। তোমাকে করতে পারিনি কোনদিনই। ভাবছি, আজ করেই ফেলব কিনা?" জ্যোতিষ বাবু বললেন, "আমি একটু ঘুরে আসি; মনে হচ্ছে প্রশ্নটা বেশ একান্ত হতে পারে" আমার কথাকে, কথা বলার চেষ্টাকে প্রায় থামিয়ে দিয়ে নয়নতারা বলে উঠল, "তপুকে তাহলে তুমি চেন নি। ওর নিজের বলে, একান্ত বলে কিছুই নেই। যদি থাকতো তাহলে কি ওর এই দুর্দশা হয়?" বলেই প্রায় নির্দেশ দেবার মতো করে আমাকে বলল, "বলেই ফেল তোমার প্রশ্নটা। শুনি।"

একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম, "বৌ হয়ে তুমি যখন প্রথম শ্বশুর বাড়ি এলে তখন তোমার কোনও কষ্ট যন্ত্রণা হয় নি? তোমাকে মানিয়ে চলতে বেগ পেতে হয় নি? তোমার বেলায় শ্বাশুড়ি সমস্যা কেমন করে সমাধান করে ছিলে?……" আমাকে হাত তুলে বাধা দিয়ে নয়নতারা বলে উঠল, "এই তোমার বরাবরের দোষ তপু। একবার সুযোগ পেলে একটার জায়গায় একশোটা প্রশ্ন করবে। এটা 'একটা' প্রশ্ন হল?" আমি বললাম, "দেখ নয়নতারা, আমার মনে শত শত প্রশ্ন উত্তরের জন্যে হুটোপুটি করে। তাই

সুযোগ পেলেই তারা শাসন মানতে চায় না। নিজে আমি উত্তর খুঁজে পাই না। উত্তরের সম্ভাবনা দেখলেই প্রশ্নগুলো লক লক করে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই।"

নয়নতারা বেশ গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, "তোমার প্রশ্নটা কোনও নয়নতারাকে নিয়ে নয়। সব নয়নতারাদের নিয়ে। আরও পরিষ্কার করে বললে বলতে হয় সদ্যবিবাহিত ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করে মেয়েদের—নিয়ে, তাদের দুঃখকষ্টকে ঘিরে। ঠিক কিনা বল?" আমি বললাম, "ঠিক। তবে কারণ অনুসন্ধানের আগ্রহ আমার সমাধানের পথ অন্বেষণের জন্যে। ওদের জন্যে আমার বেশ কষ্ট হয়।"

"তুমি তো প্রথম দিনই এই প্রশ্ন তুলেছিলে। বলেছিলে কৃষ্ণার অনেক অনেক দুঃখ, সংসারে অশান্তি। জানতে চেয়েছিলে 'কেন'—এই দুঃখ এই অশান্তি কি অনিবার্য?" আমি বললাম, "হ্যাঁ, তাই। আর তুমি বলে ছিলে বিশ্বাস আর নির্ভরশীলতা নেই বলেই এই দুঃখ কষ্ট এই সাংসারিক অশান্তি।" নয়নতারা জ্যোতিষবাবুর দিকে হঠাৎ একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল। অপ্রস্তুত জ্যোতিষবাবু প্রায় হকচকিয়ে গেলেন—বলে উঠলেন, "আমি হিসেবের মানুষ, অন্বেষণের নয়। আমাকে আবার এসব জটিল বিষয়ে টানাটানি করা কেন?" নয়নতারা জানতে চেয়েছিল এই বিষয়ে, এই দুঃখ-অশান্তি বিষয়ে, জ্যোতিষবাবু কি বলেন? জ্যোতিষবাবুর পালানোর চেষ্টাকে বাতিল করে নয়নতারা বলল, "সারাজীবন সংসার করলে আর এখন একটা প্রশ্নের উত্তর পর্যন্ত দিতে চাও না কেন? তোমার মতামতটা আমাদের চাই।"

"তুমি আমাকে বিষম বিপদে ফেললে নয়ন। উত্তর যদি দিতেই হয় তাহলে তো আমাকে ভাবতে সময় দিতে হবে। ভাবলেই যে একটা উত্তর পাব তা বলতে পারি না, তবে ভাবার সময় না পেলে সেই সম্ভাবনাটাও যে থাকে না।" আমি বললাম, "আপনি ভেবেই বলুন।"

খুবই ধীরে ধীরে, যেন শব্দ খুঁজে খুঁজে জ্যোতিষবাবু বললেন, "আমার মনে হয় শুধু সংসারেই নয় সমস্ত জীবন ধরেই আমরা যে দুঃখে কষ্ট পাই তার মূলে আছে কথা। কথা বলা এবং বলা কথা।" নয়নতারার চোখে এবং ভুরুর বাঁকে বিস্ময় যেন ধনুকের মতো স্থির হয়ে থেমে আছে। আমি আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে বসলাম, "কথা? কেমন করে?" জ্যোতিষবাবু বললেন, "আমরা সমস্যার সামনে পড়লে প্রায়ই কথা হারিয়ে ফেলি। অথবা, এমন সব

কথা বলি যা বলতে চাই না, আর যা সব বলতে-বোঝাতে চাই তা বলতে-বোঝাতে পারি না! এটা সর্বত্রই ঘটে, বিশেষ করে সংসারে যেখানে যুক্তি-বিচারের অবকাশ কম কিন্তু আবেগ অনুভবের তাড়না বেশি। এই খানেই যাবতীয় গোলমালের উৎস।" আমি বললাম, "আমাকে মাপ করবেন জ্যোতিষবাবু; এখনও ভাল বুঝলাম না, একটু খোলসা করে বলুন।"

পরিষ্কার বোঝা গেল জ্যোতিষবাবু অস্বস্তি বোধ করলেন। সেই অস্বস্তির কতোটা আমার না-বোঝার দরুণ আর কতোটা নয়নতারা সামনে আছে বলে তা বুঝিনি। জ্যোতিষবাবু বললেন, "এই দেখুন না, আমি যা বলতে চাইছি তা ঠিক ঠিক কথায় বলতে পারছি না। অথচ এটা অত্যন্ত আবেগহীন একটা বক্তব্য। তা সত্ত্বেও সম্ভবত ভয়, একটা আবেগ, অথবা অন্য কিছু, আমার কথাকে সঠিক কথার যোগান দিতে পারছে না।" নয়নতারা পিন ফুটিয়ে দেবার মতো করে বলল, "আপনি বিনয় না করে বলুন, বেশ ভালই বলছেন, বলতে পারছেন। বিষয়ে আসুন!"
জ্যোতিষবাবু চোখ বড় বড় করে নয়নতারার দিকে একবার দেখে নিয়ে আমাকে বললেন, "সেই কবে জীবনের আদ্যিকালে নয়ন আমাকে একটু আধটু আপনি আজ্ঞে করে সম্মান দিতে শুরু করেছিল। আর এই এতদিন পরে আজ আর একবার আপনির মান দিল। আজকের দিনটি ক্যালেণ্ডারে রক্তের অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকার কথা।" বিষয় থেকে বিষয়ীতে বক্তব্যকে সরে যেতে দিতে চাই না। তাই বাধা দিয়ে বলেছি, "আপনার কথার কথায় অনেক কথা হল কিন্তু কাজের কথা গেল অথৈ জলে হারিয়ে। এবারে কথার ভরাডুবির হাত থেকে কথাকে বাঁচানো দরকার।" সঙ্গে সঙ্গে এক চিলতে হাসি ঠোঁটের ডগায় আটকে রেখে জ্যোতিষবাবু বললেন, "তিন পুরোনো বন্ধু মিলে কথাকে নিয়ে হালকা চালে লোফালুফি করা বেশ সহজ। কিন্তু একবার ভাবুন তো সদ্য পরিচিত ছেলে এবং মেয়ে। স্বামী এবং স্ত্রী। অথবা বৌ এবং শাশুড়ি। বা, ননদ। যে কথা ভেবে স্ত্রী কোন কথা বলল সেই মনটি ধরা পড়ল না, সেই ভাবটি ঝংকার তুলল না স্বামীর মনে, শাশুড়ির মনে অথবা ননদের কানে। সুর কেটে গেল, অ-সুর জন্ম নিল। হিতে বিপরীত। আবার বিপরীতক্রমেও ব্যাপারটা সত্যি। শাশুড়ি ভাল ভেবে বৌকে বুঝিয়ে দিতে কিছু বললেন, শিক্ষিতা বৌয়ের মনে মনে সম্মানে লেগে গেল, ব্যক্তিত্বে ঠেস্ পৌঁছোলো; অথবা ননদ বন্ধু ভেবে রসিকতা করল আর অমনি বৌয়ের মনে হল 'ছি ছি!

এই শিক্ষা ? এই রুচিবোধ ?' আমি বলে উঠেছিলাম, "আপনি কি সেই এক দেশের বুলি অন্যদেশের গালি-র কথা বলছেন ?" "সে তো বলছিই, আরও আরও কিছু বলতে চাইছি। মনটাই আসল, তাই বলতে চাইছি। মানসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গি, ওয়েভ-লেঙথ্-এর কথা বলতে চাইছি। মনে মনে মিতালি থাকলে, মিলাপ ঘটলে সব কথার বীজেই কিশলয় দোল খায় ; যদি তা না থাকে তাহলে সেই বীজেই বিষের 'বিষালয়' সৃষ্টি হতে পারে।"

নয়নতারা অনেকক্ষণ জ্যোতিষবাবুর কথা মন দিয়ে শুনছিল। এবারে বলল. "তুমি যে এতো তত্ত্বকথাও জান তা তো আমাকে আগে জানাও নি ?" জ্যোতিষবাবু লাগসই করে বললেন, "তত্ত্বকথা নয় সত্য কথা, জীবন থেকে দেখেশুনে যা জেনেছি সেই কথা। একথা সকলেই জানে, অনেকেই বলে। তাই আমার বলার দরকার পড়েনি। আজ তপুবাবু বলতে বাধ্য করেছেন, এই মাত্র।" নয়নতারা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললাম, "দৈবত দাম্পত্য বিতণ্ডায় আমার আগ্রহ নেই। আমার আগ্রহ তোমার কথা শুনতে। তুমি আজ ফাঁকি দিচ্ছ। কেন দিচ্ছ তা জানি না, তবে আর তোমাকে ফাঁকি দেবার সুযোগ দেওয়া হবে না।"

নয়নতারা বলল, "সে কথা নয়। জ্যোতিষ যা বলল তা অবশ্যই ঠিক। প্রেম করে বিয়ের বেলায় ঠিক আবার যোগাযোগে একেবারে অপরিচিত স্বামীস্ত্রীর ক্ষেত্রেও ঠিক। দুটোর মধ্যে গুণগত কোনও তফাত নেই। যা আছে তা পরিমাণগত। আর যে কথাটা জ্যোতিষ বলে নি কিন্তু বলা উচিত ছিল তা কম জরুরী নয়।" বললাম, "সে কথাটা কি ?" বলল, "কথা দুরকমের। একটা কণ্ঠে উচ্চারিত কথা অন্যটি দেহ এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে বলা কথা। আমরা চুপ করে থেকেও কথা বলি, দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিয়ে একা হয়ে গিয়েও কথা বলি। এককথায় আচরণ বা ব্যবহার। নতুন বৌ-এর এই আচরণ বা ব্যবহার সংসারের মাইক্রোস্কোপের নিচে চেলে বেছে দেখা হয়। গোলমালের সূত্রপাত ঘটে এখানেই। বৌকে সহজ থাকতে দিলেই সে স্বাভাবিক থাকতে পারে। কিন্তু তাকে চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকতে হয়। এই চেষ্টার ফাঁক গলে গলে হিতের বদলে বিপরীত দেখা দিতে থাকে। ছেলেটি যখন শ্বশুর বাড়ি যায় তখনও ব্যাপারটা এরকমই ঘটে। কিন্তু ছেলেদের বাঁচোয়া আছে, কারণ সে জামাই-মাত্র, সেই সংসারের অঙ্গ নয়। মেয়েদের বাঁচার পথ নেই কারণ শ্বশুর বাড়িতেই তাদের নিজের বাড়িটি খুঁজে নিতে হয়।"

আমার মনে কৃষ্ণার কথা উঁকি দিয়ে গেল। বললাম, "নতুন বিয়ের পরে শ্বশুর বাড়িতে বৌদের তৈরি ক'রে, শিখিয়ে পড়িয়ে নেবার একটা ব্যাপার থাকে। এই বিবয়ে কৃষ্ণা একটা কথা বলেছিল। কথাটা আলো-ও বলেছিল অনেক চোখের জল মিশিয়ে। বলেছিল—দোষগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে সকলেই শুধরে নিতে বলেন, গুণগুলোর কথা কেউ বলেন না কেন? শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি কি শিক্ষার্থীকে সাহায্য করে? নাকি, একটা ইতিবাচক প্রশংসাসূচক মনোভাব নিলে বৌদের আগ্রহ বাড়ে? আমাব মনে হয় ওরা ঠিকই বলেছে। তোমার কি মনে হয় নয়নতারা? তোমার মত কি?"

"মন-মানসিকতার দিক থেকে কথাটা তো ঠিকই। জীবনের যে কোনও কাজেই যদি প্রথমে সাবাসী দেওয়া যায়, যেটুকু ভাল তার উল্লেখ করে দু-একটা প্রশংসার কথা বলা যায় তাহলে মনে জোর আসে, আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। সে ছাত্র-ছাত্রীই হোক, কর্মী-শ্রমিক হোক অথবা বৌ-মেয়েই হোক। তার পরে আরও কি হলে ভাল হয় সে বিষয়ে বললে মনে আর বেদনা জন্মাতে পারে না, প্রত্যয়ে ঘাটতি দেখা দেয় না। এটা তো মনোবিজ্ঞানের কথা। তাই তোমরাই ভাল জানবে।"

"কৃষ্ণা আর একটা কথাও এই প্রসঙ্গে বলেছিল," বললাম, "বলেছিল—ত্রুটি বিচ্যুতি আমার থাকতে পারে। সে সব দেখিয়ে দেওয়া ওঁদের কর্তব্য ব'লে স্বীকার করে নিচ্ছি। কিন্তু একই বিচ্যুতি যখন সকলে মিলে সমস্বরে বলতে থাকেন অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিভাবকরা সেই বিচ্যুতি বারে বারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে থাকেন তখন দোষ শুধরে নেবার চাইতে রক্তক্ষরণের যন্ত্রণাবোধ বেশি হয়ে দেখা দেয় না? শিখে নেবার আগ্রহ-টাই মার খেয়ে যায়'না?—কৃষ্ণার কথা শুনে মনে হয়েছিল এটা অবিচার। অবিচার এই জন্যে যে একই অপরাধের জন্যে একাধিকবার শাস্তির বিধান কাম্য নয় উচিত তো নয়ই। তুমি কি বল?"

নয়নতারা একটুখানি হাসি বক্তব্যে মিশিয়ে বলল, "বলার কি আছে। এখানে বৌ বলে কথা নেই। শিশু বল আর কিশোর বল, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধদেব কথাই ধর না কেন, একজন যখন সমালোচনা করে বা শাস্তি দেয় তখন যদি অন্যরাও সেই প্রক্রিয়ার সামিল হয়ে দাঁড়ায় তাহলে বেচারিরা যায় কোথায়? সর্বহারা হয়ে যায় না? একসঙ্গে একাধিক বিচারক যদি একই

অপরাধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন তাহলে বিচার যেমন মার খায় তেমনি উদ্দেশ্যও পণ্ড হয়ে যায়।" জ্যোতিষবাবু প্রায় ছাত্রের মতো হাত তুলে জানালেন তাঁর কিছু বক্তব্য আছে। নয়নতারা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বল জ্যোতিষ, তুমি কি বলতে চাও।"

"একজন শাস্তি দেবার সময়ে অন্য কোনও অভিভাবক যদি চুপ করে থাকেন বা অপরাধীর পক্ষ নেন অথবা প্রশ্রয় দেন—তখন তখনই অথবা পরে —তা হলে তো গৃহ বিচ্ছেদ ঘটবে। 'লাই'—দেবার অভিযোগ উঠবে না?" জ্যোতিষবাবু এটুকু বলে একবার নয়নতারার মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "আর এই কথাটা শাশুড়িরা কতোবার যে স্বামীর প্রতি, ছেলের প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে থাকেন তার ইয়ত্তা নেই।"

"কথাটার পরিসংখ্যানের সত্যাসত্য বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই।" আমি বললাম, "কিন্তু শাশুড়িরাই কেন এই 'লাই'-এর অভিযোগ তুলবেন এবং স্বামী-শ্বশুররাই কেন বউদের বাঁচাতে চেষ্টা করবেন সে বিষয়ে প্রশ্ন আছে। একটু বুঝিয়ে বলুন।" জ্যোতিষবাবু বললেন, "বুঝিয়ে বলার মতো বোধবুদ্ধি আমার নেই। তবে যা মনে হয় তা বলতে পারি।" বললাম, "তাই বলুন।"

একটু ভেবে নিয়ে জ্যোতিষবাবু বললেন, "মনে হয় শাশুড়িরা নিজেদের সংসারের একচ্ছত্র অধিকারিনী, প্রাণকেন্দ্র, বর্তমান ও ভবিষ্যতের দায়ভাগী বলে মনে করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যে 'ইনস্পাইট অব' স্বামী-এবং-পুত্র সেই সংসারের তরীখানি ঠিক পথে চালনা করে চলেন সে বিষয়ে নিশ্চয় বোধ করেন। এই আত্মপ্রত্যয় থেকেই শাশুড়ি মনে সহনশীলতার অভাব দেখা দেয়—বৌয়ের প্রতি,এবং সেই বৌকে সমর্থন করলে স্বামী ও পুত্রের প্রতি।" নয়নতারা চোখের কোণে জ্যোতিষবাবুকে দেখে নিয়ে বলে উঠলো "জানো তপু গল্পে নাটকে এতোদিন যে শুনে এসেছি— আমাকে তুই কাশি পাঠিয়ে দে অথবা 'যে দিকে দুচোখ যায় চলে যাব' বা 'থাকো তোমরা তোমাদের গুণধরী বৌ নিয়ে, আমাকে আমার মতো থাকতে দাও'—সেই সব শোনা কথা জ্যোতিষের কথায় বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল!" বেচারা জ্যোতিষবাবু ভীষণ মুষড়ে পড়লেন। বললেন, "তপুবাবু বলতে বললেন বলেই বলে ফেললাম। এখন বুঝতে পারছি না বললেই ভাল হত।"

জ্যোতিষবাবুর জন্যে আমার কষ্ট হল। বললাম, "এ তোমার ভারি

অন্যায়, নয়নতারা। আমাকে তুমি বোকা বল তার একটা মানে বুঝি— ছোটবেলা থেকে দেখে দেখে আমার বোকামি বিষয়ে তুমি নিঃসংশয় হতে পার কিন্তু জ্যোতিষবাবু?" নয়নতারা ঝটপট বলে উঠল, "জ্যোতিষকে বড় বেলায় দেখে নিঃসংশয় হয়েছি যে!" জ্যোতিষবাবুকে লক্ষ্য করে বলল, "আচ্ছা জ্যোতিষ, তোমার সরলা মিত্র কি তার সংসারের একচ্ছত্র অধিকারিনী, প্রাণকেন্দ্র, বর্তমান ভবিষ্যতের দায়ভাগী বলে নিজেকে মনে করত? তাহলে অঞ্জন আর দীপা চলে গেল কেন? তার মনে কি সহনশীলতার কোনও অভাব ছিল? 'লাই' দেবার ব্যাপারটাই তো সরলা-ভূপতির সংসারে ছিল না। তাছাড়া" নয়নতারা থেমে গেল হঠাৎই। জ্যোতিষবাবু বোধহয় বন্ধুবর ভূপতিবাবুর কথাই ভাবছিলেন। তাই নয়নতারার হঠাৎই থেমে যাওয়াটায় সচকিত হন নি। আমি বললাম, "তাছাড়া বলে থামলে কেন? দু'জন বোকা শ্রোতার সামনে তুমি তো নিঃশঙ্ক!"

"কথাটা শঙ্কার নয়", বলল নয়নতারা। "শচীনের বৃত্তান্ত, বিমল-বিমলার কাহিনী জ্যোতিষ জানে কিনা তাই ভেবে থেমে গেছিলাম।" জ্যোতিষবাবু বললেন, "জানি, মনেও আছে, তুমি বল।" নয়নতারা বলল, "শচীনের সংসারে তো স্ত্রী নেই তাই বিমলার শাশুড়িও নেই। সেই সংসারের ছন্দপতন ঘটল কেন? শচীন তো বৌকে সমর্থনই শুধু নয় গৃহের যাবতীয় অধিকার আর গৃহিনীর সব সম্মান দিয়েছিল। সেখানে বিমলা বিমলের হাত ধরে চলে গেল কেন? 'ইনস্পাইট অব'—তো ছিলই না, বরং সেই সংসারের ভাসমান তরীখানির হালেই তো ছিল বিমলা। এবং বিমল। তাহলে?"

"এই তাহলের উত্তরটা তুমিই দাও।" একটু কায়দা করে বলতে পেরে বেশ আরাম বোধ করলাম। জ্যোতিষবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তুমিই বল আমরা শুনি।"

"যদি বলি সংসারের জন্যে আধুনিক মেয়েদের মনটি তৈরি হয় না, স্বামীর জন্যে তৈরি হয়ে ওঠে—তাহলে তোমরা কি বলবে?" আমি বললাম, "কি আর বলব, বলব বুঝি নি বুঝিয়ে বল!" "তুমি জ্যোতিষ?" নয়নতারা জ্যোতিষকে একটু খুঁচিয়ে দিল। "আমি মৌন থেকে দ্বিতীয় আক্রমণ বাঁচাব।" বলল জ্যোতিষ। নয়নতারা বলল, "ভাল কি মন্দ সে কথা না বলেও বলা যায় সহস্র বছর ধরে ভারতীয় নারী কন্যা হয়ে লালিতা ভার্যারূপে সেবিকা আর মাতা পর্যায়ে পূজিতা—এই ত্রিপর্ব জীবনে অভ্যস্ত।

প্রত্যেক পর্বে সে পরবর্তী পর্যায়ের জন্যে তৈরি হয়ে উঠতো, প্রস্তুত হতে থাকত। মাতাপিতার সংসারে থেকে সে অন্যতর মাতাপিতার সংসারের যোগ্যতাকেই প্রধান যোগ্যতা বলে মনে করত। স্বামীর হাত ধরে সে শ্বশুর-শাশুড়ির সংসারে প্রবেশ করত। সেই সংসারে স্বামীও যেমন স্বাধীন ছিল না স্ত্রীও তেমনি স্বাধীন ছিল না। একটা সংস্থাগত পরাধীনতার মধ্যে সকলেই নিজ নিজ দায়দায়িত্ব পালন করতে অভ্যস্ত ছিল। সংসার বা পরিবার নিয়েই যেন ছিল একটা ব্যক্তিত্ব। সকল সদস্যরাই ছিল 'সাবসারভিয়েন্ট'। সেই সাবসারভিয়েন্ট পরাধীনতা সকলেই সমানভাবে ভাগ করে ভোগ করতো। তার মধ্যে কর্তা-গিন্নী শ্বশুর-শাশুড়ি, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন—সব কেমন নিজ নিজ স্বাধীনতা-পরাধীনতাকে সহজ বলেই মেনে নিত, মেনে চলত। মত বিভেদ মনোমালিন্য যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সে সব পরিবারের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এবং আড়ালে ছোট বড় ঢেউ তুলে আবার মূল প্রবাহে হারিয়ে যেতো, মিলিয়ে যেতো।" আমি বাধা দিয়ে বললাম "এই এতো সব কথা তুমি জানলে কেমন করে আর বলছই বা কেন ?"

"জানলাম সুপ্রিয়া-সর্বেশের আলোচনা থেকে। আর বলছি কেন সেই কথা বলি।" বলে নয়নতারা কি একটু ভেবে নিয়ে বলল, "সর্বেশকে তো তুমি চেন তপু, সেই যে কফিহাউসে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, নিশ্চয়ই মনে আছে।" বললাম, "ব্যাপারটা মায়ের কাছে মামাবাড়ির গল্পের মতো হল না নয়নতারা ? সেই পরিচয়পর্বে আমরা যে তিনজন ছিলাম—আমি, সুপ্রিয়া আর সর্বেশ—তার কোনজন তুমি ? তবে জ্যোতিষবাবু হয়তো জানেন না যে মামাবাড়ি গিয়ে গিয়েই তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আর সেই পরিচয়ের দুর্ভোগ আজও ভুগে চলেছি।" "আমার সঙ্গে পরিচয়টা তোমার দুর্ভোগের বলে মনে হয়েছে ?" নয়নতারার কণ্ঠে ঝিলিক খেলে গেল। "না ভোগের, এবং সৌভাগ্যেরও বটে, তবে তা জ্যোতিষবাবুর জন্যে তোলা ছিল।" আমার কথা শুনে জ্যোতিষবাবু একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দূর থেকে যা সবুজ দেখায় তার কতোটা যে সত্যিই সবুজ তা যদি জানতেন তপুবাবু তাহলে আর ও-কথা বলতেন না !"

নয়নতারা মিটিমিটি হাসছিল। এবারে বলল, "কেন বলছি সেই কথা বলি, আধুনিক কালটা শিক্ষার কাল, আধুনিক শিক্ষার কাল। বিজ্ঞান। অনুসন্ধান বিশ্লেষণ আর বিচারের অনুশীলনের কাল। তার ফলে একদিন যা

ছিল সমাজ আর সভ্যতায় মূল্যবোধের শিক্ষা, রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষা, পঞ্চতন্ত্র আর ঈশপের কাহিনীসূত্রে নীতিবোধের শিক্ষা তাই আধুনিক কালে মোটা মোটা বই থেকে তথ্য সংগ্রহে, পরিসংখ্যানের প্রয়োগে আর বিজ্ঞানসম্মত কাটাছেঁড়ার মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা পেয়ে যেতে থাকল। পূর্বে যা পূর্বদেশীয় ছিল আজ তাই পশ্চিমঘেঁষা হয়ে কেন্দ্রচ্যুত হল।" "কেন্দ্রচ্যুত হল মানে?" প্রায় রিফেলকস্ এ্যাকশানে জ্যোতিষ বাবুর মুখ থেকে প্রশ্নটি ছিটকে এলো। "মানেটা খুবই পরিষ্কার" বলল নয়নতারা "যেখানে মূল্যবোধের কেন্দ্র ছিল সমাজ পরিবার সভ্যতা সেখানে কেন্দ্র হল ব্যক্তি-স্বাধীনতাবোধ সম্পন্নতা। স্বাতন্ত্র্য! তখন ছিল অহং থেকে মুক্তি পেলেই সব পাওয়ার শেষ পাওয়া, আর এখন সেই অহং—এই মুক্তি বলে ঘোষণা শোনা গেল। অহং থেকে স্বং এ যাওয়াটাই ছিল উত্তরণ, এখন হল স্বং থেকে নিজেকে গুটিয়ে এনে অহং এ স্থির রাখাটাই একমাত্র লক্ষ্য।"

আমি সোজাসুজি বলে উঠলাম, "দর্শন আর সমাজবিজ্ঞানের ঝোপঝাড় না পিটিয়ে মেয়েদের যে কথা হচ্ছিল, বিবাহিত মেয়েদের সদ্য-সমস্যার যে প্রশ্নটা গোড়াতেই ছিল, তার কথা বল তো?" নয়নতারা বলল, "তোমরা স্কুল কলেজে সারাজীবন যা করছ তাই একটু চেষ্টা করছিলাম মাত্র! তা এবারে সেই মূল কথাতেই আসছি।"

নয়নতারা একটু নড়ে চড়ে বসল। বলল, "আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা তাই অধিকতর স্বাধীনতা চায়, ওদের বিয়ে যখন হয় তখন ওদের মধ্যেকার এই চাওয়াটা বেশ পাকাপাকি রকমের একটা চেহারা নিয়ে নেয়! মেয়ের মনে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সুযোগের অপেক্ষায় কাল গোনে। ছেলেদের মনেও। এরা কোনও সরলরেখায় পরিকল্পনা আঁটে না, একটি মাত্র পরিকল্পনাও এদের সব মন জুড়ে বসে থাকে না। কারণ কে কোন মাঠে খেলবে, কাকে সঙ্গী করে খেলতে হবে, আশেপাশে দর্শক রেফারি ইত্যাদির নানা অনিশ্চয়তা—ভ্যারিয়েবলস—নিয়েও তো এদের আগে ভাগে ভেবে রাখতে হয়। সব ভ্যারিয়েবলস এর মধ্যেও কিন্তু কনসট্যান্টটি—স্বতন্ত্রবোধ, স্বাধীন ব্যক্তি জীবন—ঠিক থেকে যায়। যত গণ্ডগোলের উৎস এই এখানেই।"

"মানতে পারলাম না", আমি বলে উঠি। "মানতে পারলাম না কারণ তাহলে তাপস তো কৃষ্ণাকে নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়ে স্বতন্ত্র হয়ে যেতো। অথবা বরুণ আর আলো। ওরা তো তা গেল না। অবশ্য অজিত তিতিক্ষাকে নিয়ে

সুনীতির হাত থেকে ছাড়া পেল। তেমনি হয়তো অঞ্জন দীপার বেলাতেও হয়ে থাকবে—মুক্তির ব্যাপারটা ছিল না সেখানে হয়তো, কিন্তু স্বতন্ত্র জীবন যাপনের বাসনা বা লক্ষ্য অবশ্যই ছিল। তাহলে ?"

"এমন ভাবে 'তাহলে'-টা বললে যেন আমার দেওয়া সূত্রটাই—ফরমুলাটাই ধ্বসে গেল।" নয়নতারা বেশ গোটা গোটা করে বলল, "অঙ্কের বেলায় সূত্রের সঠিক প্রয়োগ হলেই উত্তর মিলে যায়। জীবনের বেলায় সূত্রের ঘটে বাস্তব প্রয়োগ—বস্তু সাপেক্ষ বা অবস্থা নির্ভর প্রয়োগ। তাই সেখানে ব্যাপারটা বেশ জটিল।" বললাম "যেমন ?" বলল, "যেমন স্বতন্ত্র হবার বাসনা আছে কিন্তু হয়তো আর্থিক সংস্থান নেই অথবা মনের জোর খুঁজে পাচ্ছে না অথবা অন্যতর কোনও ভয় আশঙ্কা অসুবিধা। তাই ঘটে উঠছে না। আর জটিলতা তৈরি হচ্ছে।" "এটা কি তাহলে একটা যুদ্ধ ?" "অবশ্যই যুদ্ধ।" নয়নতারা বেশ জোর দিয়েই বলল, "যুদ্ধটা প্রথাসিদ্ধ বিশ্বাসের সঙ্গে ব্যক্তি কেন্দ্রিক স্বাধীনতা বোধের। একপক্ষ, শাশুড়ি সেখানে জেনারেল সূচ্যগ্র জমি সে ছাড়তে নারাজ পুত্রবধূকে, অন্যপক্ষ শিক্ষিতা আত্মসম্মানের মূর্ত-প্রতীক নবাগতা কয়েকদিনের বধূমাতা কিন্তু স্বল্পসময় বাদেই মা-অন্তঃপ্রাণ আবোধ বালকটির মাথা চিবানো 'মেয়েটি' জেনারেল। অসম যুদ্ধের শুরু। দুই পক্ষই চাল ভাজে তাল ঠোকে পরিকল্পনা আঁটে। ব্রিগেডিয়ারস কর্নেলস লেফটেন্যানটস হিসেবে মামা শকুনি এবং শালাসম্বন্ধিনস্তথা-দের অভাব পড়ে না। যুদ্ধ জমে ওঠে, তাপসরা দুপক্ষের তাড়নায় ক্ষতবিক্ষত হয়, অজিতরা দূরে সরে যায়, অঞ্জনদীপারা যুদ্ধহীন নির্বাধ প্রান্তরে অফিসের কোয়ার্টারে চলে যায়, একাধিক অবস্থার চাপে আলো বরুণরা সময়ের অপেক্ষা করতে থাকে, সুসময়ের না অসময়ের তা কে জানে ?" "আর বিমলা ?" আমি প্রশ্ন করি। ওরা যুদ্ধকে মানসিক স্তরে সরিয়ে নিয়ে শচীনকে দুর্বল করে নত করতে গিয়ে নিজেরাই নাস্তানাবুদ হয়ে ঘর ছেড়ে চলে যায়।"

নয়নতারার বিশ্লেষণ আমার কেন যেন ভাল লাগছিল না। তাই জানতে চাইলাম, "এই যুদ্ধটা কি না হলেই নয় ? এটা কি অনিবার্য ?" নয়নতারা কি একটু ভাবল। বলল "অনিবার্য কিনা তা জানি না। সে কথার উত্তর ভবিষ্যৎ দিতে পারে। তবে অনুচিত একথা বলতে পারি। একই জমি একজনের অতীত অধিকার, শাশুড়ির। অন্যজনের ভবিষ্যতের অর্জন, পুত্র-বধূর। যুদ্ধটা তাই অতীতের সঙ্গে ভবিষ্যতের, তখনের সঙ্গে এখনের।

ধৈর্যের অভাব অপেক্ষার অভাব প্রস্তুতির অভাব। তাই বলেছিলাম বিশ্বাসের অভাব আর অভাব নির্ভরশীলতার।"

অমিয়ার একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। অমিয়া বলেছিল—"তুমি দেখে নিও তপুমামা আমি শাশুড়ি হলে বৌকে এতটুকু কষ্ট দেবো না"—সেই কথাটা নয়নতারাকে বললাম। শুনে নয়নতারা অনেকক্ষণ ধরে হাসল। আমি বললাম, "হাসছ যে বড় ?" ও বলল, "হাসির কথায় হাসব না ?" আমি বললাম, "এর মধ্যে হাসির কথাটা কোথায় পেলে ? এটাতো একটা সিদ্ধান্ত—রিজলভ। ভবিষ্যতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বর্তমানের বৌরা যখন শাশুড়ি হবে তখন তো অনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত পুত্রবধূরাই স্বামীর হাত ধরে ঘরে আসবে। তখন একই মানসিকতার—ওয়েভ লেঙথের—দরুণ তাদের মধ্যে মিল মিশ স্বাভাবিক হবে না ?"

একটু হেসে নয়নতারা বলল, "একই সঙ্গে একই সময়ের বিন্দুতে দাঁড়িয়ে যখন অমিদের পক্ষে পুত্রবধূ এবং শাশুড়ি হওয়া সম্ভব নয়, একটা দীর্ঘ সময় ধরে অভিব্যক্ত হতে হতে ছেলেমেয়ের জন্ম দিয়ে সংসারের শত দুঃখ-আনন্দ আর সহস্র ঝামেলার ঘাত প্রতিঘাত পার হতে হতে যখন অমিরা শাশুড়ি হবে তখন গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে যাবে, জীবন অনেক দূর সরে যাবে। শৈশবের বাল সুলভ কয়টা রিজলভ আমরা মনে রাখি আমাদের তরুণ যুবক জীবনে ? তরুণ যুবক কালের কয়টি প্রতিজ্ঞা আমরা প্রৌঢ় বেলায় স্মরণ রাখি ? রাখিনা কারণ প্রতিজ্ঞার সময় ও মনটি সেই প্রতিজ্ঞাপূরণের সময় ও মনে একই জায়গায় থেমে থাকে না। এটাই জীবন, এটাই চলমান, বহমান জীবনের ধর্ম। এই জীবন যখন অপরের হাতে, পরিবেশ পরিস্থিতির হাতে মার খায় তখন তাকে বোঝা যায়। জীবন যখন নিজেই নিজেকে মারে তখন সে মার ভোগ করতে হয়, বোঝা যায় না যে !"

"তাহলে", আমি বলতে বাধ্য হয়ে পড়ি, "তাহলে তো সংসারের দুঃখ আর জীবনের কষ্টের মতো ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে মেয়েদের—বিয়ের পরের জ্বালা যন্ত্রণাও অনিবার্য বলে মানতে হয়।" নয়নতারা কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল কারণ জ্যোতিষবাবু ও থেমে গেলেন নয়নতারা কিছু বলবে ভেবে। তাই বোধহয় বলে উঠলেন, "তুমিই বল।" নয়নতারা একটু মিষ্টি হেসে বলল, "তুমি অনেক্ষণ একমনে আমাদের কথা শুনেছ। তাই তুমিই বল কি বলছিলে ?"

জ্যোতিষবাবু বললেন, "আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে নয় একটা বই থেকে পাওয়া দুটি তিনটি চরিত্রের কথা ভাবছিলাম।" নয়নতারা জানতে চাইল, "কোন বইয়ের কথা বলছ ? আমি পড়েছি ?" জ্যোতিষবাবু বললেন "তুমি পড়েছ শুধুই নয় সে বইটি তুমি কিনিয়ে এনে আলমারিতে রেখেছ। অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের লেখা 'এবং তুমি'।" নয়নতারা উচ্ছ্বসিত বলে উঠলো, "ওঁর লেখা আমার খুব ভাল লাগে ; ওঁর সব বই আমি কিনিয়ে এনেছি। তা কোন্ গল্পটার কথা তুমি সবিশেষ ভাবছিলে ?" জ্যোতিষবাবু বললেন, "বোমা বলে একটা গল্প আছে। মনে হয় বাস্তব জীবন থেকে চিত্রলেখার চরিত্রটি তুলে আনা। শান্ত, ধীর এবং প্রত্যয়ে দৃঢ়। নিজের সীমানা নিশ্চয় করে চলে অভ্যস্ত।" নয়নতারার মনে পড়ে গেল। বলল, "হ্যাঁ চিত্রলেখা ; চিত্রলেখা তার পুত্রবধূ সুমিতাকে স্বাধীনতা দিয়েছেন চাইবার আগেই। তিনি ঠকেন নি। চিত্রলেখা শাশুড়ি, সুমিতা ঘরের বৌ। এক দিনের জন্যেও তাদের মধ্যে খিটিমিটি লাগে নি, মতবিরোধ ঘটে নি অশান্তির দেখা মেলে নি। চিত্রলেখা সংবেদনশীল মা, সহানুভূতিশীল শাশুড়ি এবং সমুজ্জ্বল গৃহিনী। অথচ সব দেখে শুনেও সুমিতা যখন শাশুড়ি হল তার পুত্র প্রদীপকে বিয়ে দিয়ে তখন কিন্তু কোন কিছুই তাকে বাঁচাতে পারল না, শান্তি দিল না। সুমিতা যা সহজে পেল তাই তার ছেলের বৌ তপতীর বেলায় আর সহজে দেওয়া গেল না।' "এইখানেই আমার প্রশ্ন", বললেন জ্যোতিষবাবু। "এই দেওয়া গেল না কেন ?—এখানেই আমার খটকা।"

মনে হয় আমরা তিনজনেই জ্যোতিষবাবুর প্রশ্নটি নিয়ে ভাবছিলাম। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলি নি। আমিই প্রথম কথা বললাম। বললাম, "আচ্ছা নয়নতারা ব্যাপারটার মধ্যে ব্যক্তিগততা, ব্যক্তির নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য কি একটা বিরাট ভূমিকা নিয়ে থাকে ? তোমার কি মনে হয় ?"

নয়নতারা কিছুক্ষণ বাইরের অন্ধকার প্রকৃতিতে যেন কিছু একটা খুঁজল ; খুঁজল নাকি নিজের মনের গভীরে অন্বেষণ চালাল তা বুঝলাম না। বলল, ব্যক্তিত্ব যে একটা প্রধান বিষয় তা সত্যি। কিন্তু সেই ব্যক্তিত্ব ব্যা ? বৈশিষ্ট্য অথবা চরিত্রের গুণ—যাই বল সে অতিশয় জটিল বিষয়। সর্বেশ একদিন আলোচনা করছিল। কি সব শারীরীক ব্যক্তিত্ব, মানসিক ব্যক্তিত্ব সামাজিক এবং পারিবারিক ব্যক্তিত্বের শ্রেণীবিভাগ করে করে বিষয়টিকে তত্ত্বগত জটিলতার গোলকধাঁধায় নিয়ে গেছিল—অতশত বুঝি না তবে দেখে দেখে এটা বুঝেছি যে

ব্যক্তিত্ব একটা পরিবর্তন-অপরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া। কিছু একটা যেন আছে প্রথম থেকেই সূত্র হিসেবে। প্রত্যেক ব্যক্তির চলা ফেরায় কথায় বার্তায় আচরণে আচারে চিন্তায় ভাবনায় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত থেকে যাচ্ছে। আবার দেখছি অনেক অনেক কিছুই যা ছিল না কিন্তু জীবনের পর্বে পর্যায়ে চলার পথে যোগ হয়ে হয়ে চলেছে। মূল ব্যক্তিত্বের স্রোতকে যদি নদীর সঙ্গে তুলনা করি তাহলে সেই প্রথম থেকে সচল গতিপথে অসংখ্য উপনদী আর অজস্র শাখা প্রশাখার যোগ-বিয়োগে নদী পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে চরিত্রের রূপ পালটায় ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন দেখা দেয় আচার-আচরণে নতুন গুণের মিশ্রণ ঘটে। নিজেকে দেখে দেখে যেমন এটা জেনেছি অপরকে জেনে জেনেও এটা তেমনি বুঝেছি।"

নয়নতারা থেমে গেল। আমরা আগ্রহ নিয়ে ওর কথা শুনছিলাম। বললাম, "থামলে কেন? বল।" জ্যোতিষবাবু একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন বোধহয়। বললেন, "তুমি যে এতো গভীর কথাকে এমন ভাল করে বলতে পারো তা তপু বাবু না এলে তো জানতেই পারতাম না! "নয়নতারা জ্যোতিষবাবুকে চোখে বিদ্ধ করে বললেন, "এটা প্রকাশিত প্রশংসা না উহ্য গুপ্ত দংশন?" বেচারা জ্যোতিষবাবু বিপদে পড়ে গেলেন। আমাকে সাক্ষী মানার মতো করে বললেন, "দেখলেন তো মশাই, দেখলেন?" বিষয়কে বিষয়ান্তরে পিছলে যাওয়া বন্ধ করতে বললাম, "সেতো আমি অনেকক্ষণ ধরেই দেখে চলেছি। এখন নয়নতারার দৃষ্টিতে আপনাকে নয় ব্যক্তিত্বকে দেখে নিতে চাই। সেই ব্যক্তিত্ব যা বিয়ের পরে পরেই শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের—বৌদের—আগমনে মন্থন ঘটায় এবং অশেষ হলাহলের উৎসমুখটি খুলে দেয়। দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার হলাহলের কথা বলছি। আর যদি সেই মন্থনে অমৃতও ওঠে তাহলে সেই অমৃতের স্বাদ কেন প্রধান হয়ে স্থায়ী হয় না। নয়নতারা বলবে, আমরা শুনব।"

নয়নতারা বলল, 'দেখ তপু প্রত্যেকটি ব্যক্তির মধ্যে বিচিত্র বিভিন্ন গুণাবলী আছে, থাকে। তাদের আবেগ-অনুভবে, তাদের চাওয়া পাওয়ার জগতে, তাদের চিন্তাভাবনার সিদ্ধান্তে এই বৈচিত্র্য অনেক সময়ই তো বিপরীত বিরুদ্ধ হতে পারে। হতে পারেই বা কেন হয়েই থাকে। তা সত্ত্বেও তো প্রত্যেক ব্যক্তি একটা সামঞ্জস্যকে খুঁজে নেয়, খুঁজে পায়। না হলে তো অস্থিরমতি বা পাগল হয়ে যেতে হয়, হয়ে যায়ও কেউ কেউ। এই সংহতি বা সামঞ্জস্য ব্যক্তির জীবনে যেমন অনিবার্য তেমনি অনিবার্য নয় কি পারিবারিক ব্যক্তিত্বের

ক্ষেত্রে ?” একটা প্রশ্ন যেন ছিটকে বেরিয়ে গেল। বললাম “এই পারিবারিক ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটা কি ?” নয়নতারা বলল “বহু গুণের মিলে অমিলে যেমন ব্যক্তির বিশিষ্টতা তেমনি বহু ব্যক্তির মিলে অমিলে পরিবারের ব্যক্তিত্ব—অন্তত আমি এ-ভাবেই পরিবার ব্যক্তিত্বকে বুঝি, বুঝেছি। মিল মিশ না থাকলে সামঞ্জস্য সংহতি না থাকলে যেমন মানুষ অস্থিরমতি পাগল বা উন্মাদ বলে চিহ্নিত হয় তেমনি পরিবারের মধ্যে মিলমিশ ইত্যাদি না থাকলেও সেই পরিবার অস্থির, উচ্ছন্নে যাওয়া বা নষ্ট বলে ধিককৃত হয়।”

নয়নতারা থেমে গেল। জ্যোতিষবাবু উসখুস করছিলেন। বললাম, “কি হল, জ্যোতিষবাবু ? কিছু যেন বলবেন মনে হচ্ছে ?” জ্যোতিষবাবু নয়নতারার দিকে দেখে নিয়ে বললেন, “নয়নের দীর্ঘ ভূমিকায় আপনার হ্রস্ব প্রশ্নটি হারিয়ে যাবার দাখিল হয়ে উঠেছে। তাই উত্তরটা পেতে মনটা উৎসুক হয়ে উঠেছে। আপনার প্রশ্ন ছিল—সংসারে দুঃখ যন্ত্রণার মূলে ব্যক্তিত্ব কতখানি দায়ী।” আমিও নয়নতারার দিকে তাকালাম। নয়নতারা বলল, “সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যক্তিত্বের মধ্যেকার অহং-অংশ, ত্বং-অংশ আর স-অংশকে আলাদা আলাদা করে নিতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই তো অহং প্রাণ ভ্রমর হয়ে বসে আছে। তার বাইরে আছে তুমি ও সে। আমরা নিজেকে নিয়ে ব্যাপৃত রহিতে আসিয়াছি কি আসি নাই এই অবনীপরে তা না জানলেও এটা আমরা জানি যে সংসার 'পরে আমরা সকলেই কমবেশি অপরের মধ্যেই নিজেদের ব্যাপৃত রাখতে ভালবাসি। তাই সংসার সুখের হয়ে ওঠে। কিন্তু যেই অহং প্রধান হয়ে দেখা দিল, যখনই আমি-আমি-টা মনের উপর চাপ সৃষ্টি করল অমনি সুর কেটে গেল। সুর কাটল আর অসুরের জন্ম ঘটে গেল। ছেলের আমির সঙ্গে বৌয়ের আমি, অথবা শাশুড়ির আমির সঙ্গে পুত্রবধূর আমিটি যেই বেতালে বাজল অমনি শুরু হল ঠোকাঠুকি। প্রত্যেকেই গুণবান গুণবতী। বহুগুণে সংসারের সম্মুখে মধ্যে যে জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে মিলমিশ হারালেই পারিবারিক ব্যক্তিত্ব চোট খেয়ে গেল।”

নয়নতারা একবার জ্যোতিষবাবুর দিকে একবার আমার দিকে দেখতে লাগল। আমরা নির্বাক শ্রোতা থাকাই পছন্দ করলাম। আমাদের মধ্যে নিষ্কম্প মনোযোগ দেখেই বোধহয় নয়নতারা বলতে লাগল, “যত মত তত পথ ; যত ব্যক্তি তত ব্যক্তিত্ব। তোমাদের কাছেই শুনেছি গড়ানে পাথরে শ্যাওলা ধরে না। শাশুড়িরা সংসারের মধ্যে স্থির নিশ্চল পাথর। তাই

জ্যামিতি প্রয়োগ করলে কি দাঁড়ায়? শ্যাওলা ধরে। আবার অন্যদিকে তপ্ততাজা মেয়েরা বৌ হয়ে ঘরে এলে তাদের রক্তে বৃদ্ধের মতো গাঢ়-শীতল রক্ত-প্রবাহ আশা করাও অন্যায়। সংঘাত তাহলে সমূহ হবে না?" "কিন্তু" আমি বাধা দিয়ে ফেললাম, "কিন্তু তাহলে চিত্রলেখা বা স্বর্ণলতার বেলায় তা ঘটল না কেন?" নয়নতারা বলল, "প্রথম তো তারা গল্পের চরিত্র তাই তারা লেখক অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যের তৈরি। দ্বিতীয়, ঘটল না তার কারণ তারা নিজেকে ছাড়িয়ে অপরকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকার মতো, হবার মতো ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল। ছিল তাদের সীমাবোধ, সময়জ্ঞান এবং বিশ্বাস। তারা তাদের পুত্রবধূদের বিশ্বাস করে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের সুযোগ দিয়েছে, নির্ভর করে নির্ভরশীলতার সংগ্রহকে বাস্তব করে তুলেছে। একটা সদর্থক মনোভাবের ফলে তারা সার্থকতার কর্ষণ করেছে।"

জ্যোতিষবাবু প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন: "ব্যক্তিত্ব কি সদর্থক এবং নঞর্থক হতে পারে?" নয়নতারা অনেকটাই হেডদিদিমণির মতো করে বলল, "তুমি ভাল প্রশ্ন করেছো জ্যোতিষ। তপু বলতো ব্যক্তিত্ব দুরকমই হতে পারে কিনা? এবং পারলে তার প্রকাশ কেমন হয়?"

প্রশ্নের ছুঁচালো তীর মুখটি হঠাৎ আমার দিকে ঘুরে যেতেই আমি বিষম বিপদে পড়ে গেলাম। বিদ্যুৎ চমকের মতো তৎক্ষণাৎ কৃষ্ণার কথা মনে ভেসে উঠল, ভেসে উঠলো সর্বেশের মুখখানি। বললাম, "যাদের কেবলই দোষগুলোই প্রথম নজরে পড়ে তারাই নঞর্থক ব্যক্তিত্ব—যেমন, ট্রেন ইনসপেকটর এবং আয়কর বিক্রয়কর এবং আবগারি বিভাগের লোকেরা এবং অবশ্যই পুলিশরা। বলা যায় আমাদের সমাজে শাশুড়িরাও সাধারণত এই দলের। আর যারা ভালটাই দেখে, গ্লাসের অর্ধেক পূর্ণ দেখে অভ্যস্ত, তারা সদর্থক ব্যক্তিত্ব। এরা হৃষ্টচিত্ত সদাশয় এবং ক্ষমাশীল।"

নয়নতারা বলল, "কারেকট্! তোমাকে তো দেখছি আর বোকা বলা ঠিক নয়।" একটু মজা করার লোভ সামলাতে পারলাম না, বললাম, "ঠিক-বেঠিক ভেবে তুমি আবার কবে আমাকে কিছু বললে? যাকে বোকা বললে না তাকে সারাজীবন বোকা বানিয়ে রাখলে, আর যাকে বোকা বলে বাতিল করে দিলে সেই তাকেই ভুলতে দিলে না। ভুলতে পারলে কিনা তা তুমিই জান!" জ্যোতিষবাবু বেশ উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, "বা: বেশ ভাল বলেছেন তো তপুবাবু। একেবারে টায় টায় ঠিক কথাটি বলেছেন।"

নয়নতারা কিন্তু এবারে আর আমাদের আমল দিল না। বলল, "ভাল মন্দ কোথায় নাই? কার মধ্যে নাই? সকলেই কিছু ভাল কিছু মন্দ আর কিছু নিতান্তই সাদামাঠা নিয়ে মানুষ। বিশেষদের কথা বলছি না। সাধারণ মানুষের কথা বলছি। ইচ্ছে করলেই যেমন মানুষকে দেবতা বানাতে পারিনা, ভাল করে তুলতে পারি না, তেমনিই কোন শাশুড়িকে মনের মতো শাশুড়ি করে গড়ে নিতে পারিনা, কোন পুত্রবধূকেও পারিনা যেমনটি চাই তেমনটি করে তৈরি করে নিতে। নিজ নিজ সন্তানদের পারি না, পারিনা মা-বাবাকে আরও একটু ভাল মা-বাবা করে বানিয়ে নিতে। আমরা সকলেই যা তাই আমরা হতে হতে হয়ে যাই, হয়ে উঠি। ভিতরের আমির সঙ্গে বাইরের পরিবেশের প্রতিনিয়তর ঘাত-প্রতিঘাতে, গড়াপেটায় এমনটি হতে থাকে।"

"এতো একেবারে অদৃষ্টবাদের কথা হল", আমি বলে উঠি। "মানুষ কি অবস্থার দাস? তার কি চেষ্টা করে সিদ্ধিলাভ করার কথা নয়?" নয়নতারা একটুখানি হাসি মাখিয়ে বলল, "কতটা আমাদের অদৃষ্টের হাতে আর কতটা অ-দৃষ্টের জন্যে তা বলতে পারব না। তবে এটা অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারব যে একে অপরের ভাল দিকটা দেখতে-দেখাতে থাকলে ভাল ছাড়া মন্দ হয় না। মন্দ দিকটা ক্রমশ তাহলে কমে আসার সুযোগ পায়। তার চাইতে যেটা বড় কথা তা এই যে একই সঙ্গে ভালবাসা শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস সেই সদর্থক ব্যক্তিত্বের জমিতে উর্বরা ভূমি পায় এবং নির্ভরশীলতার পত্র পল্লব সবুজ শ্যামলের ছোঁয়ায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তখন কি আর আনন্দের কুঁড়ি, সুখের পাপড়ি আর সুন্দরের ফুল দূরে থাকতে পারে? সংসার বৃক্ষটি তাহলে কি অচিরেই পুষ্পভারাবনত এবং অদূরেই ফল ভারে আনত হতে সুযোগ পাবে না?"

আমি অবাক বিস্ময়ে নয়নতারার অনুভবের গভীরে হারিয়ে যেতে থাকলাম। জ্যোতিষবাবু বললেন। "আচ্ছা নয়ন, সেই যে বলে—সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে—সেই কথাটা কি তাহলে শুধু নববধূর জন্যেই নয়, শাশুড়ি রমণীটির বেলাতেও সমান সত্য?" নয়নতারা বেশ জোর দিয়েই বলল, "অবশ্যই তাই। তবে এখানেও দৃষ্টিভঙ্গিটি আসল। বধূ রমণীটি যদি সংসারের দুঃখ কষ্টের জন্যে শাশুড়ি রমণীটির প্রতি আঙুল তোলে আর শাশুড়ি রমণীটি যদি সব জ্বালা যন্ত্রণার মূলে বধূ রমণীকেই খুঁজতে

থাকে তাহলে সেই নঞর্থক দেখার ঘটনা ঘটে—গ্লাসের অর্ধেক শূন্য দেখার দৃষ্টি প্রকট হয়ে ওঠে। আবার দেখনা, রমণী শব্দটার একদিকে রমণ অন্যদিক রমণীয়—বর্ণাংশ বাদ দিয়ে যৌনদৃষ্টিতে দেখা যায় সংসারের প্রাণকেন্দ্রটিকে আবার বর্ণাংশ যোগ করে দেখা যায় পরিবারের পূর্ণতার রূপটিকে। কি দেখতে চাও তার উপর নির্ভর করছে তুমি কি পেতে চাও।"

"অর্থাৎ" জ্যোতিষবাবু বললেন, "অর্থাৎ যদি সংসারে সুন্দরকে চাই, পূর্ণতাকে চাই তাহলে দৃষ্টিভঙ্গিকে সুন্দর করতে হবে? দেখার চোখটাকেই সদর্থক করে নিতে হবে? না হলেই, ড্রেন-ইনসপেকটার হলেই কষ্ট যন্ত্রণা থিক থিক করে উঠবে?"

"হ্যাঁ", বলল নয়নতারা, "সুখকে শুধু চাইলেই হবে না। সেই চাওয়াটাকে সুখকর করে তুলতে হবে। আমার জন্যে, তোমার জন্যে, সকলের জন্যে সুখকর করে তুলতে হবে। সুখটাও বিভাজ্য হওয়া চাই। সুখটাও যে আমার একার নয়, আমার তোমার সকলের সে ব্যাপারটাও সুখের অনুভবের মধ্যে ওতপ্রোত থাকা চাই। এখানেই অহং থেকে ত্বং এবং স-তে বিভাজন ঘটবে।" আমি বললাম, "আর একটু খোলসা করে বল। তোমার কথাগুলো এতই সহজ সরল শোনাচ্ছে যে তাকে অতবড় একটা জটিল সমস্যার সমাধান বলে মেনে নিতে ভয় হচ্ছে।"

নয়নতারা হেসে ফেলল। বলল, "বই-পড়া লোকদের নিয়ে আমাদের মতো জীবন-পড়া লোকেদের এই তো বিপদ। তোমরা সমস্যাটাকে যথেষ্ট শক্ত করে দাঁড় করাতে না পারলে স্বস্তি পাও না কারণ একমাত্র তখনই বেশ একটা শক্ত দুর্বোধ্য সমাধান দিতে পার। আমরা সমস্যাকে সমস্যা হিসেবে ভোগে দুর্ভোগে জেনে যাই আর সোজাসুজি সমাধানেই শান্তি পাই। তা, সে কথা থাক। কথাটা সংসারের সুখের। তাই কিনা বল?" বললাম, "এতে আর বলার কি আছে। এতো সেই প্রথম থেকেই বলা।" নয়নতারা বলল, "তাহলে প্রত্যেকেই যদি যাতে সুখ আসে তাই করে তাহলেই তো সংসারে সুখের প্লাবন এসে যাবার কথা; ঠিক কিনা বল?"

ঠিক-বেঠিক তো দূরের কথা আমার যেন সব কেমন গুলিয়ে গেল। এতো সোজা সুখের সমাধান? সংসারের সুখের? হতেই পারে না। কিন্তু কেন যে হতে পারে না তা ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎই ছোটবেলায় শোনা কবির লড়াই-এ কবিয়ালের সোচ্চার প্রশ্ন মনে পড়ে গেল: সুখ কার? কার

কিসে সুখ ? সুখ কি দুঃখের অভাব এবং সুতরাং নেতিবাচক একটা মানসিক অবস্থা ? দুঃখ ছাড়া সুখ কি পাওয়া যায় ?

নয়নতারা তাড়া দিল। বলল, 'কি ভাবছ অত ? ঠিক কিনা বল ?" আমি অক্ষমতা ঘোষণা করে ছোটবেলায় শোনা কবির লড়াই শোনালাম নয়নতারাকে। বললাম, "সেই সব প্রশ্নের উত্তর তো আমার খুঁজে দেখা হয় নি। নীতিশাস্ত্রে অবশ্য বিস্তারিত দেখেছি। কিন্তু জীবনের ঘাটে বাটে মাঠে এবং সংসারে তাকে তো মিলিয়ে নিতে পারি নি।"

"সুখ সব সময়েই নিজের সুখ। কিন্তু সেই সুখ একমাত্র তখনই পাওয়া যাবে যখন তা অন্যের জন্যে খোঁজা যাবে, খোঁজা হবে", নয়নতারা বলল। আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল জ্যোতিষবাবুর গোল গোল হয়ে নয়নতারার দিকে স্থির হয়ে রইল। দুজোড়া চোখেই বিস্ময় দেখে নয়নতারা বলল, "কি হল ? অমন ড্যাব-ড্যাব করে দেখার কি দেখলে ? অহং-এর সুখ জৈব সুখ, মানুষের সুখ মানুষী হওয়া চাই। তার মানে এ নয় যে জৈব সুখে সুখ নেই। আছে। কিন্তু তাকেও আমরা, মানুষরা, পরিশীলিত করে ভোগ করি, করতে জানি। মনের সুখ মনের অর্জন—অর্জন মানেই তো চেষ্টা করে পাওয়া। চেষ্টা করেই তাই সুখকে পাওয়া যায়। সেই চেষ্টায় অপরের সুখ, আপন-জনের সুখ প্রিয়জনের সুখকেই লক্ষ্য করে নিতে হয়। অন্যথা ঠোকাঠুকি অনিবার্য, বেদনার বোঝা শিরোধার্য হবে—এই সত্য।"

"এটাই কি সংসারের নিয়ম ?" জ্যোতিষবাবু জানতে চাইলেন। "অহংকে লাগাম পরাতে পারলেই কি নিজের সুখ সম্ভব ?"আমি প্রশ্ন করি। নয়নতারার মুখে যেন উত্তর তৈরিই ছিল। বলল, "ইন্দ্রিয়সুখকেই আমি জৈব সুখ বলেছি। আর মনের বা উপলব্ধির সুখকে বলেছি মানুষী সুখ। প্রথমটাকেই ভোগ আর দ্বিতীয়টাকে উপভোগ বলেও আলাদা বোঝান যায়। সব বিষয়েই যেমন চর্চা বা অনুশীলন লাগে এই সুখকে উপভোগ করতেও তেমনি প্রস্তুতি লাগে। অপ্রস্তুত সব বিষয়ই বর্বরতা বা প্রবৃত্তিচালিত"। জ্যোতিষবাবু বলে উঠলেন, "তা হলে কি সব ব্যাপারটাই মনের হয়ে দাঁড়াল না ?" "অবশ্যই তা দাঁড়াল" নয়নতারা বলল, "যা সত্যি, যা সংসারের সব দুঃখ-কষ্ট অথবা আনন্দ উল্লাসের মূলে তা তো এই মন, মানসিকতা।" "তাহলে", আমি বলি, "তাহলে কুষ্ঠরা কষ্ট পায় কি তাদের মন তৈরি নয় বলে ? তার শাশুড়ি উত্তেজিত হয়ে যন্ত্রণাকে সংসারের কোষে কোষে ছড়িয়ে

দেয় কি তার মনটি পুত্রবধূ আবাহনের জন্যে প্রস্তুত নয় বলে ? এবং একই কথা বলা যাবে শ্বশুর-ভাসুর স্বামী-ননদ বিষয়ে ?"

আমাদের প্রশ্ন আমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগল আর নয়নতারার বলা না বলা উত্তরগুলো যেন সেই উত্তর-সন্ধ্যা তরুণ রাত্রিকে নিঃশব্দ অনু-রণনে আচ্ছন্ন করে রাখল। এক সময়ে নয়নতারা বলল, "একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে আমরা কি ভাবে ভাবি। আমরা বলি—বয়স হয়েছে, ছেলের বিয়ে দাও, মেয়ের ব্যবস্থা কর। বলি—চাকরি করছে ছেলে, এবারে ঘরে বৌ আন, মেয়ের লেখা-পড়া তো শেষ হল, এবারে পাত্রস্থ কর। অথবা—সারা জীবনই তো হাড় কালি করলে এবারে যার সংসার তাকে এনে সংসার বুঝিয়ে একটু হাঁফ ছাড়। বলি—ছেলের বিয়ে দিয়ে একটি টুকটুকে বউ আন, অথবা শিক্ষিত বউ আন, চাকরি করা বৌ আন, অল্পবয়স্ক বৌ আন। বর খুঁজতেও বলি, ভাল চাকরি, ভাল মাইনে, ভাল ঘর, বনেদি পরিবার। এসবের মধ্যে কোথায়ও কি একবারও প্রস্তুতির কথা, মনের কথা, দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলি ? ভাবি ?"

বলি না ভাবিও না। কিন্তু এখন নয়নতারার কথায় সেই ভাবনা নিয়েই ভাবতে লাগলাম। সত্যিই তো ভাবি না। কিন্তু কেন ভাবি না ? দেখলাম জ্যোতিষবাবুও একই সমস্যায় পড়েছেন। বললেন "তুমি বলতে পার নয়ন কেন ভাবি না ?" নয়নতারা বলল, "তার উত্তর কি আমারই জানা আছে ? তবে দেখে দেখে মনে হয়েছে যে আমরা বিয়ের যে তিনটি প্রধান দিক আছে তার দুটিকে প্রাধান্য দিয়ে ফেলি এতোই বেশি যে তৃতীয় যে প্রস্তুতির দিকটি থাকে তার কথা বেমালুম ভুলে যাই।" "তিনটি দিক কি কি ?" জ্যোতিষবাবু প্রশ্ন করেন। নয়নতারা বলে "প্রথম তো প্রকৃতির দিক, প্রবৃত্তির দিক। আমরা যা যা ভাবি তার সবদিকেই দেখ 'সময়' প্রভাব ফেলে। বয়স অথবা বাইরের দৃশ্যমান রূপবর্ণনা—টুকটুকে, রাজপুত্রের মতো ছেলে ইত্যাদি। প্রাণিজগতে এই ভাবনাটা প্রকৃতি নিজে করে থাকে তাই ওদের অভিভাবকদের ভাবতে হয় না। মানুষের বেলায় ভাবনাটা শুরু হয় বটে তবে ইন্দ্রিয় পর্যায় বা জৈব প্রভাব থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষের পর্যায়ে এবং ঔচিত্যের প্রভাবে উন্নীত হয় না প্রায়ই। দ্বিতীয় দিক হল সামাজিক দিক। পুত্রবধূ ঘরে এনে অথবা মেয়ের জন্যে জামাই নির্বাচন করে আমরা নিজ নিজ সংসারের সংহতি বা সুখ কতোটা বাড়াতে পারব অথবা রক্ষা করতে পারব সে প্রশ্নের চাইতে পাঁচজনে কি বলবে কি ভাববে তা নিয়ে বেশি চিন্তা করে

থাকি। সামাজিক উত্থান, স্বীকৃতি এবং উত্তরণ সচেতন মন জুড়ে থাকে। কাকে পেলাম—এই প্রশ্নের চাইতে কি পেলাম অথবা আরও কি কি পেলাম সেই ঘোষণা যেন সোচ্চার হয়ে ওঠে। সোচ্চার যে হয়ে ওঠে তা তো চিৎকৃত বিজ্ঞপ্তির মতো 'বৌ' দেখাতে এবং 'দানসামগ্রী' ডিসপ্লে করতেই ঘটিয়ে থাকি। ঠিক কিনা বল ?"

নয়নতারা থেমে গেল। ঠিক না বেঠিক তা নিয়ে ধাঁধায় পড়ে গেলাম। জ্যোতিষবাবু খেই ধরিয়ে দেবার মতো করে বলে উঠলেন, "আর তৃতীয় দিকটা কি ?" নয়নতারা বলল, "আগেই বলেছি, মন, মানসিকতা, প্রস্তুতি। শুধু ছেলে মেয়ের নয়, সকলের, সংসারের সকলেরই। দুদিন যেতে না যেতেই যখন কপাল থেকে চন্দনের ফোঁটাগুলো উঠে যায়, শাড়ি থেকে হারিয়ে যায় ন্যোরা গন্ধ আর খাট-আলমারি-ড্রেসিং টেবিল ঘরের আসবাব পত্রের ভিড়ে মিশে যায় তখন সেই টুকটুকে বৌয়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে, একটি অচেনা-অজানা ব্যক্তি, সেই শিক্ষিত নারীটির ভিতর দেখা দেয় স্বতন্ত্র এক বোধবুদ্ধির দীপশিখা অথবা চাকুরে মেয়ের অভ্যন্তরে আর্থিক স্বাধীনতার ঋজু প্রত্যয়।"

আমরা দুই শ্রোতা কথা বলার মতো কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না বোধহয়। চুপ করেই ছিলাম। নয়নতারা বলল, "আর তখনই শুরু হয় মূল্যায়ন, পুনর্বিবেচনা, ফিরে দেখা। এবং অনুশোচনা—যা চেয়েছিলাম তা পাইনি, ঠকে গেছি, এমন জানলে এখানে ছেলের বা মেয়ের বিয়ে দিতাম না, ওমা ছি ছি! এ কি মেয়ে বা ছেলে ঘরে আনলাম—এবং ইত্যাদি। আসলে শ্বশুর শাশুড়ি যা তখন দেখে ছিলেন-চেয়েছিলেন তা আর এখন দেখছেন না চাইছেন না। যা দেখা উচিত ছিল যা চাওয়া উপযুক্ত ছিল তা দৃষ্টির মধ্যেই ছিল না। একটা চাওয়া এঁদের মনে মনে অচেতনে অবচেতনে সদাসর্বদাই গড়িয়ে গড়িয়ে বহমান ছিল এবং সেই চাওয়াটা নিজ নিজ অহং-এর চাপে-তাপে-প্রভাবে অজান্তেই সদ্য আগতাকে ঘিরে একটা কাল্পনিক চেহারাও নিয়েছিল। চাওয়াটা যেহেতু বস্তুনির্ভর প্রস্তুতি-উত্তর ছিল না তাই পাওয়াটার সংগে সংঘাত অনিবার্য হয়েই দেখা দেয়। দুদিনেই দুপক্ষই ডিসইলিউশনড হয়ে কপাল খোঁজে করাঘাতের জন্যে, স্কন্ধ খোঁজে দোষ আরোপের বাসনায় আর ভুরুকে কণ্ঠকে বাঙময় করে করে অন্তরের জ্বালা যন্ত্রণাকে মুক্তি দিতে চায়। এটাই নেতিবাচক মানসিকতা, নঞর্থক দৃষ্টিভঙ্গি।"

নয়নতারা যেন সময়েই এসে থেমে গেল। আমরা দেখাশোনার জগতে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। সুপ্রিয়া চা নিয়ে এলো। সঙ্গে রত্না। মুখে হাসিটি লেগে আছে। প্রশান্ত পিছন থেকে এগিয়ে এলো। বলল, "রত্নাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসছি, মা।" ওদের চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়েছিলাম। নয়নতারা বলল,"তপু সংসার করেনি বলে সংসারের সুখ দুঃখ নিয়ে ভাবছে। আমরা সংসার করি বলে আর তা নিয়ে ভাবি না।"

চা শেষ হয়ে গেছে। উঠে পড়লাম। অনেক দূর যেতে হবে। নয়নতারা আমার ভাবনাকে বাড়িয়েই দিল। আমার একার ভাবনাকেই কি?